কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোক

সহীহ্

নে'য়ামুল কোরআন
ও
নাজাত প্রাপ্ত দলের পরিচয়

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী
আহসান ফারূক

দারুস সালাম বাংলাদেশ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

সহীহ নি'আমুল কুরআন ও নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয়

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
প্রফেসর, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি
রিয়াদ, সৌদি আরব

আহসান ফারূক
এম এম, এম এ,ফার্স্টক্লাশ
সাবেক ইমাম ও খতিব, বাইতুর রহমত জামে মসজিদ
ঢাকা

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রতি।

প্রতিটি মুসলিমের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য সহীহ দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। খাঁটি দ্বীনের অনুসরণ ব্যতিত কখনই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পাওয়া যাবে না। মানবতার দুশমন শয়তান তার জাহান্নামী সাথী বানানোর পরিকল্পনায় খাঁটি দ্বীন থেকে দূরে সরানোর জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। শয়তানের এ কৌশলগুলোর মধ্যে জঘণ্য কৌশল হলো বিকৃত ও অর্পূণাঙ্গ দ্বীনের অনুসারী বানানো। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল ﷺ প্রদর্শিত এবং খায়রুল কুরূন তথা সাহাবা, তাবে'য়ী ও তাবে' তাবে'য়ীগণের অনুসরণীয় সহীহ ও খাঁটি দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা হয়। মনগড়া ফযীলাতের ফিরিস্তির দ্বারা বহু সরলমনা মুসলিম ভাই বোনেরা হচ্ছেন বিভ্রান্ত। পরকালীন মুক্তির জন্য প্রত্যেক মু'মিনেরই ফযীলাতপূর্ণ আমলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কেননা, ফযীলাতপূর্ণ আমল হচ্ছে এমন উত্তম ও উপকারী কাজ, যার সফলতা ও পুরস্কারের কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন। আর ফযীলাতপূর্ণ আমলে যেমনি বিদ'আত সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি এ বিদ'আত প্রতিষ্ঠার জন্য পেশ করা হয়েছে অনেক মনগড়া কথা, গল্প ও কিচ্ছা- কাহিনী। মনগড়া কথা বা ধারণা কল্পনা বা কিচ্ছা- কাহিনী কখনই কোনো আমল বা ইসলামের দলীল হতে পারে না। ইসলাম হলো, দলীল প্রমাণ ভিত্তিক নিখুঁত দ্বীন, যার কোন বিষয়েই সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারেনা। তাই নিখুঁত দ্বীন ও ফযীলাতপূর্ণ আমল ওহী ভিত্তিক দলীল তথা কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া কারোর কোন মনগড়া উক্তি বা কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে না।

প্রিয় পাঠক! কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল প্রমাণ উদ্ধৃতি ছাড়া বাজারে ইসলামের নামে অনেক বই প্রচলিত আছে যার ওপর আমল করলে উপকার তো দূরের কথা দ্বীন বিকৃতির কারণে পরকালীন শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। নেয়ামুল কোরাআন, ফাযায়েল, অজীফা ও অন্যান্য শিরোনামে ফযীলাতের আমল সম্পর্কে বাংলাভাষায় বেশ কিছু বই প্রচলিত আছে। যেমন- ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে ছাদাকাত, ফাযায়েলে হজ্জ, ফাযায়েলে দরূদ, ফাযায়েলে তিজারাত, বার চান্দের ফজিলত ও আমল, নেয়ামুল কুরআন, আমলে কুরআন, মকসুদুল মু'মিনীন, অজীফা ইত্যাদি। এ বইগুলোর কোনোটিতে সামান্য এবং কোনোটিতে বৃহৎ অংশ

জুড়ে রয়েছে ফযীলাতের আমল ও নানা ধরণের তদবীরের বর্ণনা। বাংলাভাষী বহু মুসলিম ফযীলাতের 'আমল সম্পর্কিত কিতাব পাঠে অভ্যস্ত বিধায় কিতাবগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের রেফারেন্স সহকারে সংস্কার করা হলে খুবই ভাল হতো। বরং তা একান্তই জরুরী। কারণ, এগুলোর দোষণীয় দিক এ সম্পর্কিত অধিকাংশ কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যেমন :

১। কিতাবের বহু স্থানে উল্লেখকৃত ফযীলাতের আমলের পক্ষে আল কুরআন অথবা হাদীস গ্রন্থসমূহের রেফারেন্স উল্লেখ না থাকা।

২। কোথাও বা কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ না করে উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তির মনগড়া উক্তি উপস্থাপন অথবা নিজের পক্ষ থেকেই বানানো কথাকে ফযীলাত বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩। কোথাও বা রেফারেন্সসহ হাদীস পেশ করে তার তাহক্বীক্ব উল্লেখ না করা। হাদীসটি সহীহ, যঈফ নাকি বানোয়াট, হাদীসটি 'আমলযোগ্য নাকি প্রত্যাখ্যাত তা উল্লেখ না করা। কোথাও এ বিষয়ে আরবীতে কিছু লিখা থাকলে তা বাংলায় অনুবাদ না করা! ফলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কিনা অধিকাংশ পাঠক তা জানতে পারছে না।

৪। ফাযায়েল শিরোনামে প্রচলিত কিছু কিতাব বিভিন্ন আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। কিচ্ছাগুলো আবার ভিত্তিহীন ও মনগড়া, এমনকি শির্ক ও গোমরাহীপূর্ণ। যারা তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখেন না তারা সেসব কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে ভ্রান্ত আক্বিদাহ বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। ফলে ঈমানের মূল প্রাণ বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদাহ ও সহীহ সুন্নাতী আমল বিনষ্ট হচ্ছে।

৫। কোন গ্রন্থে আবার বিশেষ কিছু পাওয়ার জন্য বিভিন্ন তদ্‌বীরের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীল প্রমাণ পেশ না করে কেবল 'বহু পরিক্ষিত' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। যা দলীল হিসেবে গণ্য নয়।

৬। নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিত্তিহীন ও মনগড়া আমলের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, বিশ, চল্লিশ, সত্তর ইত্যাদি বার অমুক সময়ে অমুক দিন বা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন অমুক আমল করলে নবী ﷺ-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করা যাবে, ইত্যাদি।

৭। কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈরিকৃত আরবীতে কিছু ছন্দমালাকে বিভিন্ন দরূদ নামে আখ্যায়িত করে নতুন নতুন দরূদের প্রচলন ও তার বহু মিথ্যা ফযীলাত

বর্ণনা করা। যা কোন সহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীস তো দূরের কথা বরং কোন যঈফ হাদীসেও পাওয়া যায় না।

প্রিয় পাঠক! খুব ভাল করে জেনে রাখুন, ফযীলাতের আমলের নামে প্রচলিত যেসব আমল ও তদবীরের পক্ষে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে নির্দিষ্টভাবে কোন প্রমাণ উল্লেখ নেই তা দ্বীন ইসলামের অংশ নয়। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত।

আশা করি, যেসব দ্বীনী ভাই ও প্রতিষ্ঠান এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ ও সংকলন করেছেন তারা অতিশিঘ্র তাদের প্রকাশিত কিতাবগুলো থেকে মনগড়া ও ভিত্তিহীন ফযীলাতের কথাগুলো বিলুপ্ত করবেন এবং রেফারেন্স সহকারে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে নির্ভেজাল দ্বীন ইসলাম প্রচারে সাহসী ভূমিকা রাখবেন।

প্রিয় পাঠক! বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফযীলাত সম্পর্কিত অধিকাংশ কিতাবের এরূপ করুণ অবস্থা দেখে বহু মুসলিম ভাই- বোনের মনে বিষয়টির প্রতি চরম অনিহা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা, ফাযায়েলে আমল মানেই হচ্ছে ভেজালের ছড়াছড়ি, ফকীর- দরবেশের কিচ্ছার ঝুড়ি আর যঈফ- জাল হাদীসের সমাহার, তাই এসব থেকে দূরে থাকাই উত্তম!!

কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসে তো ফযীলাতের আমল সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, আমরা কেন দলীল ভিত্তিক সেসব আমল থেকে বিমুখ হবো? সে জন্য কোনরূপ শির্‌ক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও আজগুবি কিচ্ছা- কাহিনী প্রশ্রয় না দিয়ে বিশুদ্ধভাবে দলীল ভিত্তিক আমল সম্পর্কিত কিতাব রচনা করা অতিব প্রয়োজন। এরূপ ভেবে আমি "কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নি'আমুল কুরআন" নামে একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব সংকলনে মনোনিবেশ করি। অতঃপর এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের তাহক্বীক্বসহ গ্রহণযোগ্য হাদীসের সমন্বয়ে "কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নি'আমুল কুরআন" শীর্ষক এ গ্রন্থটি সংকলন করার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাচ্ছি। যারা আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ওহীর দ্বারা উপকৃত হতে চান এবং অসংখ্য নেকী অর্জনে আগ্রহী, ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থ তাদের যথেষ্ট উপকৃত করবে।

গ্রন্থে ফযীলাতপূর্ণ কিছু বিষয়ের পর উক্ত বিষয় সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সেগুলো প্রচার ও আমলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, সর্বোপরি ভেজাল থেকে দূরে থাকা যায়।

যেহেতু গ্রন্থটি সংকলনে আমাদের উদ্দেশ্য কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করা, তাই এ গ্রন্থে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে নির্দেশিত প্রতিটি নেক আমলই সম্পাদন করতে হবে-চাই তাতে ফযীলাতের কথা বর্ণিত হোক বা না হোক। সুতরাং কেউ যেন কেবল ফযীলাত অর্জনকেই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদান ও মূখ্য মনে না করেন। মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শর্তহীন একনিষ্ঠ আনুগত্য।

আহসান ফারুক

প্রাথমিক কথা

দুর্বল এবং জাল হাদীস :

হাদীসের ভাণ্ডারে জাল এবং দুর্বল হাদীসের অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য বিরাট বাধা, জাল হাদীসসমূহ উম্মতের মধ্যে এমন এমন পথভ্রষ্ট দলের সৃষ্টি করেছে যারা মুসলিম উম্মাতকে বড় বড় ফিতনায় ফেলে তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায়ই এ ধরনের ফিতনা থেকে এবং মিথ্যুকদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন: শেষ যামানায় এমন দাজ্জাল এবং মিথ্যুক লোকেরা তোমাদের নিকট এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরাও শুননি এমনকি তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি, সুতরাং এ ধরনের হাদীস থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করতে পারে এবং তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলতে পারে।[১] তাই যেখানেই জাল হাদীস পাওয়া যাবে তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে আর কোনো অবস্থাতেই তা মানা যাবে না। আর দুর্বল হাদীস সম্পর্কে কিছু সংখ্যক আলিম এ মত পোষণ করেছেন, যে উৎসাহ প্রদান এবং সতর্ককরণের ক্ষেত্রে এবং ফযীলাতের ক্ষেত্রে ঐ হাদীস মানা যাবে। তবে নিম্নলিখিত কারণে অধিকাংশ মুহাক্কেক আলেম এ মতের সাথে একমত পোষণ করেননি:

১. দুর্বল হাদীস থেকে উপকৃত হওয়ার রাস্তা যদি একবার খুলে দেয়া হয় চাই তার কারণ বিশেষ কোনো প্রয়োজনেই হোক না কেন, পরে তা বন্ধ করা কষ্টকর হয়ে যায়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উৎসাহ প্রদান এবং সতর্ককরণের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের ওপর আমল জায়িয বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ হয়তো আক্বীদা (বিশ্বাসের) ক্ষেত্রেও দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা জায়িয বলে মত দিয়ে থাকেন, এমতাবস্থায় আক্বীদা (বিশ্বাসের), ঈমান, মাসআলা এবং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের ওপর আমলকারীদেরকে বাধা দেয়ার বৈধতা কীভাবে হবে? তাই উম্মাতের মধ্যে দুর্বল হাদীসের কারণে সৃষ্ট সমস্যা দূর করার একটিই রাস্তা আর তা হলো যে, ঐ রাস্তা কোনোভাবেই খোলা যাবে না এবং তা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

২. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাদীসের ভাণ্ডারসমূহে আক্বীদা, ঈমান, মাসআলা এবং বিধি-বিধানসহ উৎসাহ প্রদান এবং সতর্কীকরণ ও ফাযায়িল

---

[১] মুকাদ্দমা সহীহ মুসলিম।

সম্পর্কে সহীহ এবং হাসান পর্যায়ের হাদীস এতো অধিক পরিমাণে আছে যে, ঐ সমস্ত হাদীস অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আমল করলে পরকালে মুক্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীস বিদ্যমান থাকতে দুর্বল হাদীসের পিছনে ছুটার প্রয়োজন কী?

৩. এ বিষয়টি তো সর্বাবস্থায়ই গৃহিত যে, নিশ্চিত এবং পরিপূর্ণ সওয়াব ঐ সমস্ত আমলেই আশা করা যায় যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর যে সমস্ত আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তার সওয়াব পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত নয় বরং অনিশ্চিত। নিশ্চিত সাওয়াব এবং অনিশ্চিত সাওয়াবের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? চিন্তা করুন! কোথাও যাওয়ার জন্য দু'টি রাস্তা থাকে যার মধ্যে একটি নিশ্চিত আর অপরটি অনিশ্চিত তখন এ উভয় রাস্তার মধ্যে আপনি কোন্‌টি গ্রহণ করবেন? নিঃসন্দেহে ঐ রাস্তা যেটি নিশ্চিত।

উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান হলো, আমলসমূহ একমাত্র সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীসের আলোকে হতে হবে। এ অবস্থানের ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা এ গ্রন্থে শুধু সহীহ এবং হাসান স্তরের হাদীসসমূহই উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় শেষে কুরআনের আয়াত এবং সূরাসমূহ সম্পর্কে প্রচলিত দুর্বল এবং জাল হাদীস পেশ করা হয়েছে, এ লক্ষ্যে যেন মানুষ তার মূল্যবান সময় এবং শ্রম ঐ সমস্ত আমলে নষ্ট না করেন।

কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, দ্বীনি বিষয়ে মানুষ দ্রুত বিদ্রোহী হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে রাতের অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা বিস্তার লাভ করবে, কোনো ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকবে কিন্তু সন্ধ্যায় ঈমানহারা হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় ঈমানদার থাকবে কিন্তু সকালে ঈমানহারা হয়ে যাবে, মানুষ নিজের ঈমান এবং দ্বীনকে দুনিয়ার লোভে প্রত্যাখ্যান করবে। (তিরমিযী-১১৮)

'কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নি'আমুল কুরআন' লিখার উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম তাদের পবিত্র গ্রন্থের সঠিক নি'আমত, ফাযায়িল, বরকত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হবে, কুরআন মাজীদের সাথে ঐ সম্পর্ক স্থাপন করবে যা প্রথম যুগের মুসলিমগণ করেছিল, কুরআন তিলাওয়াত এবং তা শ্রবণ করা নিজের নিত্য নৈমিত্যিক কাজে পরিণত করবে, তা শিক্ষা এবং শিখানোকে নিজের জীবনের মিশনে পরিণত করবে, আর কর্মজীবনে তা থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

এ গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত ভালো কথা আল্লাহর দয়া এবং করুণা ও তাঁর তাওফীকের প্রতিফল, আর সমস্ত ত্রুটি, দুর্বলতা আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণ, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দু'আ করছি যে, তিনি যেন এ গ্রন্থের ভালো দিকগুলো দয়া

করে কবুল করে সর্বসাধারণকে উপকৃত করেন, আর তার মন্দ দিকগুলো স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে আমাদেরকে সংশোধিত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন!

হাদীসসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহর) বিশ্লেষণকে গ্রহণ করা হয়েছে। রেফারেন্সের সাথে যে নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে তাও অনেকাংশে তাঁর গ্রন্থসমূহ অনুযায়ী।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এ গ্রন্থ প্রস্তুতের ব্যাপারে আমাদেরকে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিয়েছেন এবং ঐ সকল শুভাকাঙ্খীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর নিকট দু'আ করছি যে তিনি যেন লেখক, প্রকাশক, বণ্টনকারীগণ, সহযোগিতাকারীগণ এবং সাহায্যকারীগণের জন্য সাদকা জারিয়া করে শেষ দিবসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম করেন, আমীন!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার আবেদন, বইখানা পাঠ করার সময় কোন ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কোন প্রকার অসংগতি ধরা পড়লে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাকে অবহিত করবেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন । আমিন।

সহীহ ওহীর মাধ্যমে প্রমাণিত তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া

অতঃপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় স্বরণ করে দিতে চাই যা প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তা হলো :

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের একত্ববাদ তথা তাওহীদ সম্পর্কে আক্বীদাহ-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ না হলে কোন নেক আমল ফলদায়ক হয় না।

কাজেই শিরক-বিদ'আত পরিহার করুন, হালাল রুজি ভক্ষণ করুন এবং কারো প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকুন-ইনশাআল্লাহ ফযীলাতের আমল আপনার সৌভাগ্যের পথ খুলে দেবে, আপনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

সর্বযুগের সকল মানুষই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আসছে। গুটি কতেক নাস্তিক ছাড়া, এরা মানব সভ্যতায় দূর্ঘটনা। যেমন লক্ষ লক্ষ গাড়ী রাস্তায় চলে, এর মধ্যে দু'একটা দূর্ঘটনায় কবলিত হয়। তাই বলতে হয়: স্রষ্টার অস্তিত্বে মূলত মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হয়েছে স্রষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক,

স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব, তাঁকে ডাকার বা তাঁর উপাসনা করার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে। প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্মগত অনুভূতি দিয়ে এবং সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তবে কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তার প্রতি মনের আকুতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাহায্য, করুণা বা সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে যখনই মানুষ নিজের ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ করে, তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

এ জন্য মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না সে সকল বিষয় তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।

কিভাবে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী রসুলদের ওপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদত আরাধনা করতে হবে, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কিরূপ হবে, মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে, কোন আমলের কি পরিমাণ সাওয়াব বা শাস্তি দেয়া হবে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন। এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী। এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ওপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারনা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ

"তোমদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না।"[২]

ওহীর বিপরীতেও ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষদের যুক্তি ও প্রমাণ ছিল সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ। এসব প্রবণতাকে বিভিন্ন মানব সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে কুরআন কারীমে চিত্রিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সঠিক বিশ্বাস বা ইসলাম প্রচার করেন, তখন সেই জাতির অবিশ্বাসীরা নবী-রাসূলদের আহবান এ যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের প্রচারিত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী, তারা যুগ যুগ ধরে যা জেনে আসছেন মেনে আসছেন তার বিরোধী। নূহ (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন তার উম্মতকে ইসলামের পথে আহবান করলেন তখন তারা তার আহ্বান এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে :

مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ

"আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি।"[৩]

মুসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহবান করেন তখন তারাও একই যুক্তিতে তার ওপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে বলে;

وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ

"আমাদের পূর্ব পুরুষদের কালে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনি নি।"[৪] সকল যুগে অবিশ্বাসীরা এ যুক্তিতেই ওহী প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ বলেন;

وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ

---

[২] সূরা (৭) আ'রাফ; ৩ আয়াত।
[৩] সূরা (২৩) মুমিনুন; ২৪ আয়াত।
[৪] সূরা (২৮) কাসাস; ৩৬ আয়াত।

"এবং এভাবে আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের সমৃদ্ধশালী (নেতৃপর্যায়ের) লোকেরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের ওপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি'।[৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা এ একই যুক্তিতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার তাদের এ যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

বস্তুত, তারা যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচারিত বিশ্বাস ও কর্ম ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তারা দাবি করতেন যে, ইবরহীম (আ), ইসমাইল (আ) ও অন্যান্য নবী ও নেককার মানুষদের থেকে পূর্ব পুরুষদের মাধ্যমে পাওয়া তাদের বিশ্বাসই সঠিক। তাদের মতের বিরুদ্ধে ওহীর মতকে গ্রহণ করতে তারা রাজি ছিল না। আবার তাদের বিশ্বাসকে কোনো ওহীর সূত্র দ্বারা প্রমাণ করতেও রাজি ছিল না। বরং তাদের বিশ্বাস বা কর্ম 'পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে নবী-রাসূল বা নেককার মানুষদের থেকে প্রাপ্ত" এ কথাটিই ছিল তাদের চূড়ান্ত দলীল ও যুক্তি। এ বিষয়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন;

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا
لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ
فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى
اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

"তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাগণকে নারী বলে গণ্য করেছে; তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা-উপাসনা করতাম না।" এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো কেবল আন্দায-অনুমান করে মিথ্যা বলছে। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? বরং তারা বলে,

---

[৫] সুরা (৪৩) যুখরুফ; ২৩ আয়াত।

[৬] দেখুন, সূরা (৩১) লুকমান; ২১; সূরা (২৩) মুমিনূন; ৬৮; সূরা (৪৩) যুখরুফ; ২২ আয়াত।

'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুপথ প্রাপ্ত হব।"[৭]

এখানে মক্কার মানুষদের দুটি বিশ্বাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত ফিরিশতাগণকে নারী বলে বিশ্বাস করা এবং দ্বিতীয়ত তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাস বিকৃত করে নিজেদের কর্মকে আল্লাহর পছন্দনীয় বলে দাবি করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না; কাজেই আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা ফিরিশতাদের পূজা করতাম না। অথচ আল্লাহর পবিত্র নগরীতে পবিত্র ঘরের মধ্যে আমরা ফিরিশতাদের উপাসনা করে থাকি। এ কর্ম যদি আল্লাহর পছন্দনীয় না হতো তবে তিনি অবশ্যই আমাদের শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যেহেতু আমাদেরকে শাস্তি দেন নি, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, এ কর্মে তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন।

তাদের এ বিশ্বাসের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি 'গাইব' বা অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। দেখে, প্রত্যক্ষ করে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। একমাত্র ওহী ছাড়া এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় তা আন্দায, মিথ্যা বা ওহীর বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। আর মক্কার মানুষদের এ বিশ্বাস দুটি প্রমাণের জন্য তারা পূর্বের কোনো আসমানী কিতাব বা ওহীর প্রমাণ দিতে অক্ষম ছিল। কারণ তাদের নিকট এরূপ কোনো গ্রন্থ ছিল না। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল দ্বিবিধ; প্রথমত, ওহীর জ্ঞানের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, পূর্বপুরুষদের দোহাই দেওয়া।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তারা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কোনো ওহীর বাণী এক্ষেত্রে পেশ করতে পারে না; বরং আন্দাযে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

দ্বিতীয় বিষয়টি কুরআনে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথমত, পূর্ব পুরুষদের অনেকেই সত্যিই নেককার ছিলেন বা নবী-রাসূল ছিলেন। তবে তাদের নামে যা প্রচলিত তা সঠিক কিনা তা যাচাই করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের দোহাই না দিয়ে সুস্পষ্ট ওহীর নির্দেশনামত চলতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

---

[৭] সূরা (৪৩) যুখরুফ; ১৯-২২ আয়াত।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"সে সকল মানুষ অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করো তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।"[৮]

অন্যান্য স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত ছিলেন। কাজেই ওহীর বিপরীতে এদের দোহাই দেওয়া বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেছেন :

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

"যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, 'না, না, বরং আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদেরকে যে কর্ম ও বিশ্বাসের ওপরে পেয়েছি তারই অনুসরণ করে চলব। এমনকি তাদের পিতা-পিতামহগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?"[৯]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন যে, পূর্ব পুরুষগণ কেমন ছিলেন যে কথা নিয়ে বিতর্ক না করে মূল বিশ্বাস বা কর্ম নিয়ে চিন্তা কর। যদি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীর জ্ঞান প্রচলিত বিশ্বাস বা কর্মের চেয়ে উত্তম হয় তবে পিতৃপুরুষদের দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করো না। মহান আল্লাহ বলেন :

قٰلَ اَوَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

"(হে নবী) বলুন, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যে পথে পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা

[৮] সূরা (২) বাকারা; ১৩৪ ও ১৪১ আয়াত।
[৯] সূরা (২) বাকারা; ১৭০ আয়াত।

তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' তারা বলে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'।[১০]

ওহীর বিপরীতে অবিশ্বাসীদের এরূপ বিশ্বাসকে 'ধারণা' 'কল্পনা' বা 'আন্দায' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَ لَآ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ

"যারা শিরক করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই হারাম করতাম না।" এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও অবিশ্বাস করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, তোমাদের নিকট কোনো 'ইলম' (জ্ঞান) আছে কি? থাকলে আমাদের নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান নির্ভর মিথ্যা কথাই বল।"[১১]

এখানেও তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাসকে বিকৃত করে তারা যা বলেছে তাকে 'আন্দায', 'ধারণা' বা 'কল্পনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে তাদের নিকট তাদের বিশ্বাসের ও দাবির স্বপক্ষে 'ইলম' বা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ওহীর বক্তব্য দাবি করা হয়েছে।

অন্য স্থানে বলা হয়েছে :

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে; তারা কেবলমাত্র ধারণার অনুসরণ করে চলে এবং তারা শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে।[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে;

---

[১০] সূরা (৪৩) যুখরুফ; ২৪ আয়াত।

[১১] সূরা (৬) আন'আম; ১৪৮ আয়াত।

[১২] সূরা (৬) আনআম; ১১৬ আয়াত।

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ

"অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র ধারণা- কল্পনার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না।"[১৩]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন;

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۝ وَ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান (ইলম) নেই; তারা কেবল ধারনা-অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণা-অনুমানের কোনো মূল্য নেই।"[১৪]

এছাড়া এরূপ বিশ্বাসকে 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বা নিজের মন-মর্জি বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ করে বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমার কাছে পছন্দ কাজেই আমি এ মত গ্রহণ করলাম এবং আমার কাছে পছন্দ নয় কাজেই আমি এ মত গ্রহণ করলাম না। আমার পছন্দ বা অপছন্দ আমি 'ওহী' দ্বারা প্রমাণ করতে বাধ্য নই।

নিঃসন্দেহে, গাইব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় সবই ধারণা, অনুমান, আন্দায বা কল্পনা হতে বাধ্য। আর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিবেক ও যুক্তিগ্রাহ্য ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে এরূপ আন্দায বা ধারণাকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা বা পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে ওহী অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা নিজের মর্জি বা 'প্রবৃত্তির' অনুসরণ বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে;

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

---

[১৩] সূরা (১০) ইউনুস; ৩৬ আয়াত।
[১৪] সূরা (৫৩) নাজম; ২৭-২৮ আয়াত।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথ নির্দেশনা ছাড়া নিজের ইচ্ছা বা মতামতের অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কেউ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[১৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

"তারা তো শুধুমাত্র অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।"[১৬]

কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে?[১৭]

তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ

বস্তুত আমরা একথা বলতে পারি না অমুক কর্ম সবাই করছে বা আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে চালু আছে, কাজেই তা ঠিক এবং আমরা তা করব। কারণ কোনো কর্ম বা বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকা বা পিতা পিতামহদের যুগ থেকে অর্জিত হওয়া তার সঠিক হওয়ার বা নির্ভুল হওয়ার প্রমাণ নয়। সমাজের প্রচলিত কর্ম বা বিশ্বাস ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হবে জ্ঞানের মাধ্যমে।

যেমন মনে করুন কোনো সমাজে প্রচলিত আছে যে কারো জ্বর হলে অমুক গাছের রস বা ফল খেলে সুস্থ হয়ে যাবে। বা এ কথাও প্রচলিত যে অমুক কর্ম করলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার বা বরকত দান করবেন বা সে মৃত্যুর পরে শান্তি পাবে।

সমাজে প্রচলিত থাকা এ ধারণা দু'টির সঠিকত্বের প্রমাণ নয়। এগুলো ঠিক না ভুল তা জানতে হলে আমাদের জ্ঞানের সন্ধান করতে হবে। আমাদের জ্ঞান দু প্রকারের; প্রথমত, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীলব্ধ জ্ঞান।

প্রথম ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি গাছের রস বা ফল খেলে জ্বর সেরে যাবে এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমদের ল্যাবরেটরীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এভাবে আমরা জানতে পারব যে, উপরোক্ত ধারণাটি সঠিক অথবা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি কর্মে আল্লাহ খুশি হবেন বা বরকত দান করবেন বা তাতে মৃত্যুর পরে শান্তি পাওয়া যাবে, এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে

[১৫] সূরা (২৮) কাসাস; ৫০ আয়াত।

[১৬] সূরা (৫৩) নাজম; ২৩ আয়াত।

[১৭] সূরা (৩০) রূম ২৯; সূরা আ'রাফ ১৭৬; সূরা কাহাফ ২৮; সূরা তহা ৪৭ আয়াত।

আমাদেরকে ওহীলব্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে; কারণ এ বিষয়টি আমাদের মানবীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। এজন্য আমরা এক্ষেত্রে দেখব আল্লাহ বিষয়টি ওহীর মধ্যমে আমাদেরকে জনিয়েছেন কিনা।

এ জন্য আমরা দেখি যে, বিভিন্ন যুগে ও জাতিতে যখন কাফিররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের ওপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও বিশ্বাসকে সঠিক বলে দাবি করেছে, তখন তিনি তাদেরকে ওহীর জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন এবং ঈমানের ব্যাপারে ওহীর ওপর নির্ভর না করার নিন্দা করেছেন।[১৮]

মক্কার কাফিরদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করলো এবং তাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার আচরণকে সঠিক বলে দাবি করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পক্ষে ওহীলব্ধ জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানান। আল্লাহ বলেন;

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰي بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا

"বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।"[১৯]

এখানে কুরআন কারীমের প্রমাণ পেশের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির ওপর নির্ভর করা হয়েছে এবং এরপর ওহীর প্রমাণ চওয়া হয়েছে। এরপর তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা বলা হয়েছে।

---

[১৮] দেখুন সূরা বাকারা; ১১১; আলে ইমরান; ১৫১; আনআম; ৮১; আরাফ ৩৩, ৭১; ইউনুস; ৬৮; ইউসুফ ৪০; কাহাফ; ১; হাজ্জ; ৭১; আম্বিয়া; ২৪; নামল; ৬৪; রূম; ৩৫; মুমিন (গাফির) ৩৫ আয়াত।
[১৯] সূরা (৩৫) ফাতির; ৪০ আয়াত।

সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এ যে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈসা (আ), উযাইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), অন্যান্য নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলীল কি? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। তাদের এ বিবেক ও যুক্তিবিরুদ্ধ কর্মের পক্ষে তারা দাবি করত যে, যাদেরকে তারা ইবাদত করে বা বিপদে আপদে যাদেরকে ডাকে তারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা আল্লাহর 'রাসূল', আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তাদের এ দাবি আংশিক সত্য ছিল। আমরা দেখেছি যে, এদের অনেকেই মূলত নবী, ফিরিশতা বা নেককার মানুষ ছিলেন। আর কিছু ছিল কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব। তবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া তো ইবদত পাওয়ার বা ইলাহ হওয়া কোনো প্রমাণ নয়। এজন্য মুশরিকগণ এক্ষেত্রে আরো দুটি দাবি করত। প্রথমত তারা দাবি করত যে, এদের ডাকলে বা এদের ইবাদত করলে এরা আল্লাহর নৈকট্য মিলিয়ে দেন।[২০] দ্বিতীয়ত তারা দাবি করত যে, আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।[২১]

তাদের এ সকল যুক্তি সবই ছিল কল্পনা, ধারণা, অনুমান এবং প্রকৃত ওহীর শিক্ষার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি। এজন্য আল্লাহ বারংবার তাদের কাছে 'কিতাব' বা ওহীর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা দাবি করেছেন। যুক্তি ও বিবেক দাবি করে যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের ইবাদত করতে হবে, তাহলে তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বন্দাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা

---

[২০] সূরা (৩৯) যুমার; ৩ আয়াত।

[২১] সূরা (১০) ইউনুস; ১৮ আয়াত।

আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আমরা তার নির্দেশ পালন করতাম। এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আমরা তার নির্দেশ পালন করতাম। এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি কখনোই দেন নি। কাজেই তোমাদের কর্ম ও যুক্তি বিবেক বিরুদ্ধ এবং ওহীর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল।

মক্কার কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করত। তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কল্পনা ও সমাজের প্রচলিত কথা। কোনো ওহীলব্ধ জ্ঞানের ওপর এ বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না। পবিত্র কুরআনে তাদের এ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করার পরে তাদের কাছে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে ওহীলব্ধ জ্ঞান থেকে, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে :

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

"তোমাদের কাছে কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তাহলে তোমাদের ওহীলব্ধ কিতাবটা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[২২]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্যই ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো জ্ঞানের ওপর হতে হবে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ওহী পাঠিয়েছেন, এসকল ওহীর কিতাব সবই নষ্ট বা বিকৃত হয়ে গেছে। একমাত্র সর্বশেষ রাসূল মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে পাঠানো ওহীই নির্ভূলভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, যার ওপর আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। কোনো আমলের সাওয়াব পাওয়া বা না পাওয়া বা কি পরিমাণ পাওয়া যাবে তা ওহী তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করতে পারি না।

---

[২২] সূরা (৩৭) সাফফাত; ১৫৬-১৫৭ আয়াত। আরো দেখুন; সুরা যুখরুফ; ২১ আয়াত।

উম্মতের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সংক্রান্ত কথা

পূর্ববর্তী উম্মতদের বিভক্তি ও দলাদলির কারণ

কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে আসমানী হেদায়াত প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলি ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মূল কারণ ছিল **ওহীর শিক্ষার ব্যতিক্রম করা বা ওহীর কিছু শিক্ষা ভুলে যাওয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করা, অতিভক্তি, পূর্ববর্তী গুরুজনদের অন্ধভক্তি ও অনুকরণ ইত্যাদি।**

ইহূদী-খৃস্টানদের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

"যারা বলে 'আমরা খৃস্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি। তারা যা করত আল্লাহ তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন।"[২৩]

এ আয়াতে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানদের বিভক্তির মূল কারণ ছিল তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বা তাদের ওপর নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়া। আমরা দেখেছি যে, তাদের এ ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। তারা আল্লাহর কিতাব সাধারণ মানুষদের পড়তে দিত না, অনেক অবহেলা ও অযত্নে কিতাবের অনেক অংশ হারিয়ে ফেলে, অনেক কিছু পরিবর্তন করে এবং মনগড়া কথা রচনা করে তা দিয়ে মূল কিতাবের শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়।

অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অভাব, মতভেদকে শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, নিজের মতকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে

---

[২৩] সূরা (৫) মায়িদা; ১৪ আয়াত।

পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি ছিল পূর্ববর্তী উম্মাতদের দলাদলি বা বিভক্তির কারণ ও প্রকাশ। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন;

وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ

"তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন।"[২৪]

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং জ্ঞান আসার পরেও জিদ, হিংসা, ঔদ্ধত্য, নিজ মত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপরি ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ। মহান আল্লাহ বলেন;

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

"তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশত তারা নিজদের মধ্যে বিভেদ-দলাদলি করে।"[২৫]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন;

وَ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ۝ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ۝

"এবং তোমাদের এ জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।"[২৬]

আহলু কিতাবের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে ওহীর অতিরিক্ত মতামত উদ্ভাবন। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

---

[২৪] সূরা (৫) মায়িদা: ৬৪ আয়াত।

[২৫] সূরা (৪২) শূরা; ১৩ আয়াত। আরো দেখুন; সূরা (২) বাকারা ২১৩ আয়াত, সূরা (৩) আলে-ইমরান; ১৯ আয়াত, সূরা (৪৫) জাসিয়াহ; ১৭ আয়াত।

[২৬] সূরা (২৩) মুমিনুন; ৫২-৫৩ আয়াত। আরো দেখুন; সূরা (৩০) রুম; ৩২ আয়াত।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ

"হে কিতাবীগণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ্ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মে নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ওপর ঈমান আন এবং বলিও না 'তিন'...।[২৭]

আমরা দেখেছি যে, খৃস্টানগণ ওহীর শব্দগুলির অতি ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করে, আর এরূপ ব্যাখ্যার ওপর আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। খৃস্টধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, ঈসা (আ) কেন্দ্রিক বাড়াবাড়িই তাদের মধ্যকার সকল দলাদলি ও ফিরকাবাজির মূল বিষয় ছিল। ত্রিত্ববাদ নামক মনগড়া মতবাদ এবং ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা নিয়েই তাদের যত ফিরকাবাজি।

বিশ্বাসের মধ্যে ওহীর সাথে ব্যাখ্যার নামে মানবীয় মতামত, দর্শন ইত্যাদি যোগ করে তকে ধর্মে বা ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করাকে কুরআন কারীমে 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরেকটি দিক ছিল কতিপয় 'পণ্ডিতের' প্রতি পরবর্তীদের অন্ধ ভক্তি ও তাদের মনগড়া মতামতের অন্ধ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন :

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ۠

"বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের 'হাওয়া' অর্থাৎ প্রবৃত্তি, মনগড়া মত বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[২৮]

---

[২৭] সূরা : ৪ নিসা, ১৭১ আয়াত।

[২৮] সূরা (৫) মায়িদা : ৭৭ আয়াত।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও দলাদলি

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মাতকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ধর্মকে বিভক্ত করে তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ -এর সম্পর্ক থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না বা দলাদলি করো না।" অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

"তোমরা তাদের মত হবে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"[২৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটি সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তার অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"[৩০]

---

[২৯] সূরা (৩) আল-ইমরান; ১০৫ আয়াত।

[৩০] সূরা (৩০) রূম: ৩০-৩২ আয়াত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

"যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[৩১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

"এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, করলে সেগুলি তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।"[৩২]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির মধ্যে বিভক্তি এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে। আমরা দেখেছি যে, 'যাতু আনওয়াত' বৃক্ষ বিষয়ক হাদীসে "রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।"

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟

"তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে পদে অনুসরণ করবে: বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে।" আমরা

[৩১] সূরা (৬) আন'আম: ১৫৯ আয়াত।
[৩২] সূরা (৬) আন'আম: ১৫৩ আয়াত।

বললাম: পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহূদী-খৃস্টানরা?" তিনি বলেন: 'তবে আর কারা?"[৩৩]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ اُمَّتِيْ بِأَخْذِ الْقُرُوْنَ قَبْلِهَا شَبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَفَارِسَ وَ الرُّوْمِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ اُوْلَئِكَ ـ

"কিয়ামত আগমনের আগেই আমার উম্মাত পূর্ববর্তী জাতিগুলির রীতি গ্রহণ করবে, বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে। তখন বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের মত?' তিনি বলেন: 'তাদেরকে বাদ দিলে আর মানুষ কারা?"[৩৪]

যে ব্যাধির কারণে বিভক্তি ঘটে অন্য হাদীসে রাসূলল্লাহ ﷺ তা উল্লেখ করেছেন। যুবাইর ইবনু আওয়াম বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الاُمَمِ قَبْلِكُمْ الْحَسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالَقَةُ لاَ اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

"পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। বিদ্বেষ হলো মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন মুণ্ডন করে।"[৩৫]

এক হাহীসে আল্লাহর নবী বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোন প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।"

এ হাদীসে তিনি বিভক্তি থেকে আত্মরক্ষার পথ জানিয়েছেন, তা হলো, তাঁর ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের ওপর অটল থাকা।

---

[৩৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৪, ৬/২৬৬৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫৪।
[৩৪] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৬৯।
[৩৫] তিরমিযী, আস-সুনাহ ৪/৬৬৪।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِيْ أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَ أَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔

"আমার পূর্বে যে উম্মাতের মধ্যেই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই উম্মাতের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাহাবী ছিলেন, তাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতেন। অতঃপর তাদের পরে এমন একদল উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটে যারা যা বলে তা করে না এবং যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা তারা করে। কাজেই যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন এবংযে ব্যক্তি এদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। এর পরে আর শরিষা পরিমাণ ঈশানও অবশিষ্ট থাকে না।"[৩৬]

এখানে রাসূলুল্লাহ জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে। এছাড়া তিনি সাহাবীগণের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক হাদীসে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন।

আলী এবং ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ (أَحْدَاثُ) الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (يَتَكَلَّمُوْنَ بِالْحَقِّ) (يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزَ حَنَاجِرَهُمْ) يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ (مِنَ الْحَقِّ) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ

[৩৬] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَ هُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنْ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।[৩৭]

এ অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধামিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[৩৮]

উপরের সহীহ হাদীসগুলি সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এসকল হাদীস থেকে আমরা উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি ও বিভক্তির কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি। অন্য কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تَفَرَّقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ اَوْ اِثْنَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَ النَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً.

---

[৩৭] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৮১; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬১।

[৩৮] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।

"ইহুদীর ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খৃস্টানগণও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"[৩৯]

অন্য হাদীসে মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلاَ اِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (اَلْكِتَابِيِّنَ) افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ إِنْ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِيْقِ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَ سَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةِ۔

"তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহূদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে যাবে। এ দলটি হলো 'আল-জামা'আত'।"[৪০]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন :

اِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقَ اُمَّتِىْ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ (اَلْيَوْمَ) وَ أَصْحَابِىْ۔

"বনী ইসরায়েল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল বাদে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন : 'আমি এবং আমার সাহাবীগণ এখন যার ওপর আছি।"[৪১]

এভাবে আমরা দেখেছি যে, মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা একত্রিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর দ্বীন ও হেদায়াত লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত ও বহুদা বিভক্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এরূপ বিভক্তি আসবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় যে,

---

[৩৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৫। তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৪০] আবু দাউদ ৪/১৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৪০৪-৪১৪।

[৪১] তিরমিযী, আস-সুন্নান ৫/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

বিভক্তদের দল-উপদল অনেক হলেও অনুসারী কম। কারণ আমরা দেখব যে, বিভক্তির মূল কারণ আকীদার উৎস হিসেবে ওহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ওহীর সাথে মানবীয় যুক্তি বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করা। আর এ পথ খুললেই বিভক্তির পথ খুলে যায়। এজন্য ফিরকাগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীন বিভক্তি খুবই বেশি। এতে ফিরকার সংখ্যা বাড়লেও অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, উপরের কোনো কেনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভক্ত ৭৩ দলের ৭২ দলই জাহান্নামী। এর অর্থ এ পাপের কারণে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকীদাগত বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। তাদেরকে বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন। তবে বিভ্রান্ত দল ও সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ছাড়া সকলকেই কাফির বলে গণ্য করত।

বিভক্তি বা ইফতিরাকের কারণসমূহ

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী উম্মাত এবং এ উম্মাতের মধ্যে ইফতিরাক বা বিভক্তির কারণগুলি নিম্নরূপ :

১. ওহী ভুলে যাওয়া :

কুরআন কারীমে আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মাতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত ওহীর একটি অংশ ভুলে গিয়েছিল, ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা একটু আগে দেখেছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন;

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ

"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে।"[৪২]

[৪২] সূরা (৫) মায়িদা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়িদা ৪১ আয়াত।

ওহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। অবহেলার মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া, ব্যাখ্যার নামে মূল ওহী বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাই ওহীর স্থলাভিষিক্ত করা, আহবার-রুহবানদের মাসূম বা নিষ্পাপ-নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে ওহীর সমতুল্য বলে গণ্য করা, ওহীর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা কথা প্রচার করা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বাদ দেওয়া, জাগতিক স্বার্থের কারণে ওহীর নির্দেশন বিকৃত করা ইত্যাদি। পূর্ববর্তী জাতিগুলির ন্যায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি মূল কারণ বিভিন্নভাবে এরা ওহী ভুলেছে বা ভুলতে চেষ্টা করেছে। যেমন :

(ক) ওহী বা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যার অধিকার করো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে সরিয়ে রাখা। বিশেষ করে শীয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদাগুলির এটি অন্যতম।

(খ) ওহীর ব্যাখ্যায় কোনো আলিম, মা'সূম ইমামের বা অন্য কারো বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবি করে তার 'ইলম লাদুন্নী', কাশফ, ব্যাখ্যা বা মতামতকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া। এটিও শীয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম।

ﷺ রাসূল ﷺ এর পরে কোনো মানুষের নিষ্পাপত্ব বা নির্ভুলত্বে বা তাঁর ইলম লাদুন্নী, কাশফ বা ইলহামের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করে তার মতামতকে ওহীর সমতুল্য বা ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা। এতে মূল ওহীর আর কোনোই মূল্য থাকে না। কেবলমাত্র ওহীর ব্যাখ্যা নামে কথিত ইমামের মতামতই আকীদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায়। এটিও শীয়াদের বিভ্রান্তির মৌলিক দিক।

(ঘ) ওহীর পাশাপাশি দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে ওহীর মতই আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ওহীর তাফসীর বা ব্যাখ্যার নামে নিজেদের বা কোনো আলিম বা বুজুর্গের মতামতকে ওহীর সাথে আকীদার অংশ বানিয়ে দেওয়া। সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(চ) তাবীল-ব্যাখ্যার নামে ওহীর কিছু বিষয় বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকীদার মধ্যে গণ্য করা। এতে ওহীর মূল ভাষা আকীদা থেকে 'ভুলে যাওয়া' হয়। সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ছ) বানোয়াট কথা বানিয়ে ওহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা বা জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার ওপরে আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শীয়া ও অন্যান্য অনেক ফিরকার বৈশিষ্ট্য।

২. হাওয়া (اَلْهَوٰى) বা মনগড়া মতামতের অনুসরণ

হা, ওয়াও, ইয়া, এ তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত শব্দটির মূল অর্থ শূন্য হওয়া, খালি হওয়া বা নিপতিত হওয়া। এ ক্রিয়ামূল থেকে দু প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় : (ضَرَبَ يَضْرِبُ) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাওয়া ইয়াহবী (هَوَى، يَهْوِى) এবং এক্ষেত্রে অর্থ হয় নিপতিত হওয়া। এ ক্রিয়ার মাসদার : হুবিয়্যান (هُوِيًّا)। আর (سَمِعَ يَسْمَعُ) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাবিয়া-ইয়াহওয়া (هَوِىَ، يَهْوَى) অর্থাৎ ভালবাসা, প্রেম করা, পছন্দ করা ইত্যাদি। এ ক্রিয়ার মাসদার 'হাওয়ান' (هَوًى)। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাওয়া (اَلْهَوٰى) শব্দের অর্থ প্রেম, ভাল লাগা, পছন্দ করা ইত্যাদি। বহুবচন; আহওয়া (اَلْاَهْوَاءُ)।[৪৩]

কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হাওয়ান নাফস' (هَوَى النَّفْس) বা ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে 'আহওয়া' (اَهْوَاءٌ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

اِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ اِفْتَرَقُوْا فِىْ دِيْنِهِمْ عَلَى سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ إِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِىْ الْاَهْوَاءَ كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ وَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَ لاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ۔

"তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহূদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তারা পছন্দ বা মনগড়া মতের (اَهْوَاءٌ) অনুসরণ করবে। এরা সকলেই জাহান্নামী, কেবলমাত্র একটি দল বাদে, যারা 'আল-জামা'আত'। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দল বের হবে যাদের মধ্যে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে

---

[৪৩] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ ৬/১৫; ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/১০০১।

যেমনভাবে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে। তার দেহের সকল শিরা, উপশিরা ও অস্থিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।"[৪৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ 'ইত্তিবাউল হাওয়া' বা পছন্দের অনুসরণ বা মনগড়া মতের অনুসরণ। বস্তুত ধর্ম ও বিশ্বাসের মূল হলো ওহীর নিকট আত্মসমর্পণ। এর স্বরূপ হলো কোনো শিক্ষা বা নির্দেশনা ওহী বলে প্রমাণিত হলে নিজের মত বা পছন্দ-অপছন্দকে তার অধীন করে দেওয়া। প্রয়োজনে নিজের মত বা নিজের মনোনীত ব্যক্তির মত ব্যাখ্যা করে বাদ দিয়ে ওহীর মত ব্যাখ্যাতীতভাবে গ্রহণ করা।

এর বিপরীত হলো ইত্তিবাউল হাওয়া বা নিজের মনমর্যি বা পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করা। এর স্বরূপ হলে একটি মত বা কর্ম মানুষের কোনো কারণে ভাল লাগবে বা সঠিক বলে মনে হবে। এরপর সে এ মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। ওহীর যে বিষয়টি তার মতের পক্ষে থাকবে সেটি সে গ্রহণ করবে। আর যে বিষয়টি তার মতের বিরুদ্ধে যাবে তা সে প্রত্যাখ্যান করবে বা ব্যাখ্যা করবে।

আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ পূর্ববর্তী ধর্ম, প্রচলিত দর্শন, সামাজিক রীতি বা বিশ্বাসের প্রভাবে বা পূর্বপুরুষদের মতামতের প্রভাবে একটি বিশ্বাস বা কর্মকে ভালবেসে ফেলেন। এরপর তার কাছে ওহীর বিষয় প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণ করতে পারেন না। বরং ওহীর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বা না হলে উড়িয়ে দেন এবং পছন্দনীয় মতটিই ধরে থাকেন। ইহূদী-খৃস্টানগণ এবং আরবের কাফিরদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি ছিল অন্যতম কারণ। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ও বিভক্ত দলগুলিরও এটি মূল বৈশিষ্ট্য।

৩. হিংসা-বিদ্বেষ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা বিভক্তি বা ইফতিরাকের অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের মধ্যে অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে। দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায় অথবা মতভেদসহ-ই অবিচ্ছিন্ন থাকা যায়; (১) ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং (২) পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

---

[৪৪] আবু দাউদ ৪/১৯৮; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১০২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৪০৪-৪১৪।

ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ মতভেদ নিরসন করে বা মতভেদের গুরুত্ব কমিয়ে আনে। মতভেদকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ যদি ওহীর মাধ্যমে যা জানা যায় সেটুকু মূল ধরে ওহীর অতিরিক্ত বিষয়কে অমৌলিক সহ্যযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন তবে মতভেদের তীব্রতা কমে যায়। পাশাপাশি আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অপরের মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে।

মতভেদীয় সকল বিষয়কেই এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। সাহাবীগণের সকলের মর্যাদার স্বীকারোক্তিসহ তাঁদের পারস্পরিক তারতম্য নির্ধারণের বিষয়ে, ঈমানের প্রকৃতি ও কবীরা গোনাহকারী বিধানের বিষয়ে, তাকদীর ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে, আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার জন্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি সকলে এ বিষয়ে একমত হতেন যে, ওহীর মাধ্যমে বা কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক জানা যায় তা আমরা গ্রহণ করব। বাকি সমন্বয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে যা বলব তা ওহীর মত চূড়ান্ত বলে গণ্য করব না। বরং এগুলি ইজতিহাদী ব্যাখ্যা, কাজেই এগুলির সমাধান না হলেও আমরা একে অপরের মত সহ্য করব। কারণ আমরা সকলে একই ধর্মের অনুসারী ও পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ।

আমরা দেখতে পাই সাহাবীগণের মধ্যে এ দুটি বিষয়ে প্রগাঢ় বিদ্যমানতার কারণে তাঁদের মতভেদ কখনো বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিম ও ইমামগণও এ দুটি বিষয়ের গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে একদিকে তাঁরা তাঁদের আভ্যন্তরীণ মতভেদগুলি সহজভাবে নিয়েছেন এবং তাঁদের মতভেদ বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয় নি। অপরদিকে তারা বিচ্ছিন্ন ফিরকাসমূহের মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ও যথাসম্ভব সহজ করে দেখেছেন। তাদেরকে ভুলের মধ্যে নিপতিত ও বিভ্রান্তির শিকার বললেও ওহীর কোনো বিষয় সুস্পষ্ট অস্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁরা তাদেরকে কাফির বলেন নি। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তাঁর আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বিদআতী ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন :

لَا يُكَفَّرُ بِهَا حَتَّى الْخَوَارِجُ الَّذِيْنَ يَسْتَحِلُّوْنَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَسَبَّ الرَّسُوْلِ، وَيُنْكِرُوْنَ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَوَازَ رُؤْيَتِهِ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيْلٍ وَشُبْهَةٍ

بِدَلِيْلِ قَبُوْلِ شَهَادَتِهِمْ، إِلاَّ الْخَطَّابِيَّةِ ...... وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عَلِمَ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً كَفَرَ بِهَا.

"এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে এবং আখিরাতে তাঁর দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না। কারণ তাদের এ সকল মতামতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা। এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ মামলা-মুকাদ্দমায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে খাত্তাবিয়্যাহ[৪৫] ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে। আর কোনো ফিরকা যদি দ্বীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজন জ্ঞাত বিশ্বাস অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে।"[৪৬]

৪. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ক্ষেত্রে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'সুন্নাত' এবং সাহাবীগণের 'সুন্নাত' অনুসরণ করাকে নাজাত, সফলতা ও হিদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সুন্নাত থেকে বিচ্যুতিই সকল বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খরিজী ফিরকার ইতিহাসে আমরা তা ভালভাবে দেখতে পাই। খারিজীগণ কুরআনের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবনের সহচর ও দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করত এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মত প্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত।[৪৭]

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা হাদীস অস্বীকার করত না। সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তার হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করত ও প্রশ্ন করত। কিন্তু তারা 'সুন্নাত' -এর গুরুত্ব অস্বীকার করত।

---

[৪৫] খাত্তাবিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ আল্লাহর প্রিয়পাত্র, তাদের মধ্যে 'উলূহিয়্যাত' বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট শিরক করার কারণে এদেরকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ একবাক্যে কাফির বলে ঘোষণা করেন। দেখুন: বাগদাদী, আব্দুল কাহির, আল-ফারুকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৪৭।

[৪৬] ইবনু আবেদ্বীন, রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬১।

[৪৭] ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ ৮১-৮৭।

অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক, বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা জরুরী মনে করত না। বরং কুরআন বা হাদীস থেকে সাধারণভাবে তারা যা বুঝেছে সেটিকেই চূড়ান্ত মনে করত।[৪৮]

বস্তুত সুন্নাত-ই মুমিনের মুক্তির পথ। যতক্ষণ মুমিন সুন্নাতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ তার কোনো ভয় থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যেভাবে যতটুকু বলেছেন বা করেছেন মুমিন যদি তা ততটুকু সেভাবেই বলেন বা করেন এবং তিনি যা বলেননি বা করেনি মুমিন যদি তা বলা বা করা বর্জন করে তবে তার কোনো ভয় থাকে না। সুন্নাতের বাইরে গেলেই বিচ্যুতির সম্ভাবনা খুলে যায়। কারণ সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে যে সংযোজন বা বিয়োজন সে করে তা সঠিক না ভুল তা নিশ্চিত জানার কোনো উপায় তার নেই। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেননি বা বলা বর্জন করেছেন তা না বললে দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে সে চিন্তা করাও ভাল নয়।

৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যা করতে বলা হয় নি তা তারা করবে'। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে যে সকল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, ওহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে সে সকল কাজকে দ্বীনের বা আকীদার অংশ বানিয়ে নেওয়া।

যেমন, ওহীর মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অসৎকাজে লিপ্তকে হত্যা করতে, শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু খারিজীগণ ওহীর অনুসরণের নামে তা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধরদের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার নামে আলী (রা)-কে সাজদা করতে, তাঁর বিশেষ গাইবী জ্ঞান আছে বলে মনে করতে, তাকে নিষ্পাপ বলে দাবি করতে বা অন্যান্য সাহাবীকে ঘৃণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু শীয়াগণ তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশধরদেরকে ভালবাসা, তাঁদের আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও তাদের বেদনায় ব্যথিত হওয়া ইসলামের নির্দেশ। কিন্তু বেদনায় ব্যথিত হওয়ার নামে মাতম বা তাযিয়া বের করা, শোক-সমাবেশ করা, নিজেকে আঘাত

---

[৪৮] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৪-১৪৪৬; হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক ২/৪০৪, ৪৪০, ৪৪৫, ৪/৬১৭; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬।

করে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি ইসলামের নির্দেশ নয়। অনুরূপভাবে তাঁদের জন্মদিনে বা অন্য কোনো দিনে তাঁদের ভালবাসা বা আনন্দের নামে মিছিল, উৎসব ইত্যাদি করাও ইসলামের নির্দেশ নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন জাল দলীল তৈরি করে শীয়াগণ এরূপ করে থাকে।

সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ই এরূপ করেছে। ওহীর ব্যাখ্যার নামে তারা এমন কথা বলেছে বা এমন কাজ করেছে যা করতে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

৬. অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

উপরের বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অনুসরণ করবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। এর একটি নমুনা দেখেছি যে, মুসলিমদের 'যাতু আনওয়াত' দেখে কেউ কেউ অনুরূপ কিছু নিজেদের মধ্যেও প্রচলন করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, এ বিষয়টি ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন, সমাজের পণ্ডিতদের বক্তব্য প্রভৃতি কারণেই বিভিন্ন বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়।

৭. মুহকাম রেখে মুতশাবিহ অনুসরণ

কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ওহীর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় বক্তব্যকে গ্রহণ করা বা আকীদার ভিত্তি বানানো। মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَ مَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

"তিনিই তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি দ্ব্যর্থবোধক-একাধিক অর্থের

সম্ভাবনাময়। যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়গুলির অনুসরণ করে।"[৪৯]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, খৃস্টানদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি একটি দিক ছিল। তাদের নিকট বিদ্যমান 'কিতাবে' আল্লাহর একত্ব, ঈসা (আ)-এর মানবত্ব, রাসূলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। পাশাপাশি 'আল্লাহর রূহ', 'আল্লাহর কলিমা' ইত্যাদি কিছু বিশেষণ তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থও পরিস্কার, তবে তা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এ সকল দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলিকে তারা একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যাকে তারা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা করে বাতিল করে। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিরও একই অবস্থা।

৮. কর্মহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সন্ধান

ওহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করা। মুমিনের দায়িত্ব ওহীর নির্দেশ মত নিজের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা কর। ওহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়, ওহী নিয়ে বিতর্ক নয়। কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে কর্মহীন বিতর্ককে ভালবাসে। আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস। কারণ ওহী মূলত গাইবী বিষয়, এ বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর বিতর্ক কোনো চূড়ান্ত সমাধান আনতে পারে না। এজন্য হাদীস শরীফে ওহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনা জ্ঞানের পথ সুগম করে। মত বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচকদের অজ্ঞতা বা ভুল দূর হয় এবং নতুন অনেক বিষয় জানা যায়। কিন্তু বিতর্ক তা নয়। বিতর্কের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি মত গঠন করে এবং যে কোনেভাবে তার মতটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। নিজ মতের দুর্বলতা ধরা পড়লেও তা স্বীকার করতে রাজি হয় না, কারণ তা তার পরাজয় বলে গণ্য হয়। এজন্য হাদীস শরীফে কুরআন নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

---

[৪৯] সূরা (৩) আল-ইমরান: ৭ আয়াত।

هَجَّرْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

"আমি একদিন দুপুরে আগে আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। তিনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও বিতর্কে রত দুব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তখন তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"[৫০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন :

اِنَّ نَفَرًا كَانُوْا جُلُوْسًا بِبَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ اَلَمْ يَقُلْ اللهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا ضَلَّتْ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هٰذَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ انْظُرُوْا الَّذِيْ أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوْا بِهِ وَالَّذِي نُهِيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় বসেছিলেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেন নি? আবার কেউ বলেন: আল্লাহ কি একথা বলেন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনতে পান। তিনি বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায়, যেন তাঁর মুখমণ্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে দাঁড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমাদের কাজ এটি নয়। তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন কর। যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন কর।"[৫১]

অন্য হাদীসে আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

[৫০] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫৩।
[৫১] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৯৫।

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ۔

"কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়।"[৫২]

উপরের এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝলাম দ্বীন বা শরীয়াতের কোনো ব্যাপারে ওহী তথা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ব্যতিত মনগড়া কোনো কথা বলা উম্মতকে পথভ্রষ্ট করার অন্যতম কারণ।

অথচ কিছু সংখ্যক আলিম বিভিন্ন বইয়ে ফযীলাত ও তদবীর সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক মনগড়া কথার অবতারণা করে থাকেন। আল্লাহ্ আমাদের দ্বীনের সহীহ্ তরীকা অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ও মহিমা

মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন সে অনাদি অনন্ত সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী, মহাকৌশলী। যত প্রকার গুণ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা ও শক্তির কল্পনা করা যায় তার সকল প্রকারের সমাহার হলেন মহান আল্লাহ্।

আল্লাহর পূর্ণ পরিচয় দেয়া বা পাওয়া সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। সসীম, অপারগ, অক্ষম কি করে অসীমের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বুঝতে সক্ষম হবে? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে যেভাবে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে সেভাবেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাধ্যমে তাঁর কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তাবাচক নাম বা ইসমে যাত (اِسْمُ ذَاتٍ)। এছাড়াও আল্লাহর অনেক গুণবাচক বা সিফাতি নাম (اِسْمُ الصِّفَاتِ) আছে। যেমন আর-রাহমান (اَلرَّحْمٰنُ), আর-রাহীম (اَلرَّحِيْمُ), আল-খালিক(اَلْخَالِقُ , আল-মালিক (اَلْمَالِكُ) ইত্যাদি। তাই আল্লাহর পরিচয় দু'ভাবে দেয়া হয়। ক. সত্তাবাচক পরিচয় ও খ. গুণবাচক পরিচয়।

আকাইদ শাস্ত্রে আল্লাহর পরিচয়ে বলা হয়েছে–

---

[৫২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩৭৮। তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৫২। মুসলিম আস-সহীহ১/১৫

اَللّٰهُ عِلْمٌ عَلَى الْاَصَحِّ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ

"আল্লাহ শব্দটি ঐ চিরন্তন অনিবার্য সত্তার নাম, যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, যিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলির অধিকারী।"[৫৩]

আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দটি একবচন। এর কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নেই। এ শব্দের কোনো দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। অধিকাংশ আলেমের মতে, এ শব্দটি বিশেষ কোনো শব্দমূল থেকে আসেনি। আরবী ভাষায় এর হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোনো প্রতিশব্দও নেই। অন্য কোনো ভাষায় 'আল্লাহ' শব্দের কোনো অনুবাদ সম্ভব নয়। তাই খোদা, ঈশ্বর বা ভগবান ইত্যাদি কোনোটাই আল্লাহর পরিচয় বহন করে না। অপরদিকে 'আল্লাহ' নামের সাথে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ বা অংশীবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী 'আল্লাহ'কে আল্লাহ (الله) নামে অথবা তাঁর গুণবাচক নামেই ডাকতে হবে। ধর্মতত্ত্ববিদগণ আল্লাহর সত্তাবাচক পরিচয় এভাবে দিয়েছেন–

আল্লাহ্ চিরন্তন ও অনিবার্য সত্তা

এ মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সর্বোন্নত ও সুমহান শাশ্বত চিরন্তন অনিবার্য সত্তা। জান্নাতে মুমিনগণ তাঁর দীদার (সাক্ষাৎ) লাভ করবেন।

সর্বোত্তম গুণের অধিকারী

তিনি সমস্ত উত্তম গুণের অধিকারী ও সবধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে পূতঃ পবিত্র। তাঁর সত্তা, গুণ, মর্যাদা, কর্ম তথা সর্ব বিষয়েই এমন, যার সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না, তুলনা করা যায় না– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তিনি সৃষ্টিলোকের সকল চিন্তা ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। সকল জ্ঞান, শক্তি ও কল্যাণের উৎস একমাত্র তিনিই। তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তার কোনো উদাহরণ ও নযির নেই।

---

[৫৩] আকাইদে তাওহীদ ফিল কুরআন

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"সকল বিষয়ের ওপর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।" সকল সৃষ্টি তার ইচ্ছায় আবর্তিত হয়।

وَهُوَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ "তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর প্রতিটি কাজই প্রজ্ঞাময়। তিনিই একমাত্র নির্দেশদাতা–হাকিম, আইন ও বিধানদাতা। তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য আসমানে-যমীনে, সাগরে-ভূধরে, প্রতিটি সৃষ্টিলোকে। কর্মে, গুণে, মর্যাদায় এবং সর্ব বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় এবং একক সত্তা।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা

তিনি নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা–خَالِقٌ, মালিক ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক– رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ও নিয়ামক। সৃষ্টির লয়-ক্ষয়, উত্থান-পতন, জীবন-মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসীবত, আনন্দ-বেদনা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী তিনিই। আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগণিত সিফাত বা গুণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি অনন্ত অসীম। তিনি সংখ্যা ও পরিমাপ হতে উর্ধ্বে। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি অবিমিশ্র। স্থান ও কালের গণ্ডি হতে তিনি মুক্ত। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। কোনো প্রকার রঙ ও বর্ণ থেকে পবিত্র। কোনো কিছুর সাথেই তাঁর তুলনা হয় না لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ। কোনো কিছু তাঁর ক্ষমতা ও ইলম বহির্ভূত নয়।

রব অর্থ লালন পালনকারী বা নিয়ন্ত্রনকারী বা রক্ষক বা বিধায়ক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ লালন পালনকারী এ কথার অর্থ হলো মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃজন থেকে শুরু করে উহার ক্রম উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো পর্যন্ত যা যা করা দরকার তার ব্যবস্থা করা, তার বিনাশ বা ধ্বংস করা, কল্যাণ অকল্যাণ করা, সচ্ছলতা অসচ্ছলতা দান করা, সুস্থতা অসুস্থতা দান করা, গোটা বিশ্বজাহানের সকল কিছুর পরিচালনা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি করার ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তাকে আরবীতে 'রব' বলা হয়। আমরা বাংলায় পালনকর্তা বলে থাকি। সৃষ্টি করতে হলে সৃষ্টি করার জন্য যত উপাদান দরকার তার ওপর স্রষ্টার কর্তৃত্ব থাকতে হবে এবং ঐ সকল উপাদান সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর থাকতে হবে। নচেৎ তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না। তদরূপ লালন পালন করে বড় করতে, খাদ্য সরবরাহ করতে যে সব উপাদান দরকার

তার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব থাকা জরুরী এবং ঐসকল উপাদান সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর থাকতে হবে। নচেৎ তিনি লালন পালন করতে বা খাদ্য সরবরাহ করতে পারবেন না। মানুষ সৃষ্টি বা তার লালন পালনের জন্য আলো বাতাস মাটি পানিসহ আসমান যমীনের সকল কিছুরই প্রয়োজন হয়। এসকল কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব না থাকলে মানব সৃষ্টি বা মানুষের একটি খাদ্যকণাও সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই রবুবিয়্যাৎ বা লালন পালনের জন্যে সৃজন থেকে শুরু করে সকল কিছুর ওপর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অধিকারী হতে হয়। এ কারণে আল্লাহকে লালন পালনকারী স্বীকার করার অর্থ হলো, আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃজনকারী, ভাল মন্দ করার অধিকারী, সংরক্ষক, পরিচালক ও বিনাশকারী বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা বুঝায়।

আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

"আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।"[৫৪]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি নিজেই কুরআন মাজীদে তাঁর গুণ ও সিফাতসমূহের বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ হয়েছে। এসব নাম তার বিশাল অপরিসীম কুদরতের প্রকাশ। কোনো নাম তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ করে কোনো নাম তাঁর পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল হওয়ার কথা প্রকাশ করে। কোনো নাম তাঁর প্রতিপালক, জীবিকা দানকারী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী হওয়ার কথা বুঝায়। এমনি করে তাঁর প্রতিটি নামই তাঁর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও কুদরতের কথা প্রকাশ করে।

আবূ হুরাইয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে (হিফাযত করবে) সে জান্নাতে যাবে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে তিনি বিজোড়, বিজোড়কে ভালোবাসেন।[৫৫]

মূলত আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করা, এগুলোর হিফাযত করার অর্থ হচ্ছে এগুলোর অর্থ জানা, বুঝা, এগুলোর ওপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা, এগুলোর সাথে

---

[৫৪] সূরা ত্ব-হা ২০:৮
[৫৫] মিশকাত : ২১৭৯ সহীহ বুখারী ও মুসলিম

কাউকে শরীক না করা অর্থাৎ এ সমস্ত গুণের সমতুল্য, সমকক্ষ কেউ নেই বলে বিশ্বাস করা, এগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল করা, নিজের জীবনে আল্লাহর সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যা এসমস্ত নাম দ্বারা বুঝা যায় এবং এসব নামে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর এসব গুণ ও সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া, এসব নামের উসিলা দিয়ে নিজের মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য দু'আ করা। আশা করা যায় এ সমস্ত নামের উসিলা দিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্যই দু'আ কবুল করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী আল্লাহ। সুতরাং সেসব নাম ধরে তোমরা তাঁকে ডাক।"[৫৬]

১। اَللّٰهُ (আল্লাহ্) : এ হচ্ছে বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের নাম। সমস্ত গুণ, যাবতীয় কল্যাণ ও পূতঃ পবিত্রতার শিরমণি এ নাম। তিনি ছাড়া এ নাম আর কখনো কারো জন্য ব্যবহৃত হয়নি- এবং হতে পারবে না। সৃষ্টি, ক্ষমতা , জ্ঞান, প্রশংসা ও করুণার উৎস এ নাম। এ নাম সৃষ্টির আগে থেকে ছিল। সৃষ্টি ধ্বংসের পরও থাকবে। এ নামের অস্তিত্ব অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, চিরন্তন-শাশ্বত।

২। اَلرَّحْمٰنُ (আর্-রাহমান) : দয়াময়, যাঁর দয়া সমগ্র বিশ্বকে ঘিরে আছে। অত্যধিক দয়াপরবশ, দয়ার সাগর। অতিশয় দয়াবান। অর্থাৎ আল্লাহ সেই মেহেরবান সত্তা, যিনি মানবজাতির প্রতি সীমাহীন অনুরাগী, করুণাময়-দয়াপরবশ। তিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহ দ্বারা তাদের ভূষিত করেছেন। তাঁর দয়া থেকে পাপী-তাপী কেউই বঞ্চিত নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের ওপরই তাঁর দয়া বিদ্যমান।

৩। اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) : দয়াবান ও বিশেষ দয়ার অধিকারী, স্থায়ী দয়াবান যা শুধু মু'মিনদের প্রতি করা হয়। তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ চির প্রবাহমান। তাঁর স্থায়ী এ রহমতের ধারা কখনো ছিন্ন হয় না। মু'মিনদের প্রতি তাঁর রহমতের ধারা দুনিয়ায় ও আখিরাতেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকবে।

---

[৫৬] সূরা আ'রাফ ৭ : ১৮০

৪। اَلْمَلِكُ (আল মালিক) : রাজা, বাদশাহ, রাজাধিরাজ। আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সব কিছুর প্রকৃত মালিক। তাঁর সম্মুখে সকলেই নিঃস্ব-অসহায়। যিনি রাজ্য, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও বাদশাহীর মালিক। এ রাজত্ব বা কর্তৃত্ব যেমন প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর জন্য বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয় তেমনিভাবে পার্থিব জীবনে রাষ্ট্রে ও সমাজেও তাঁরই রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তথা তাঁর আইন ও বিধান মেনে নিতে হয়। নচেৎ তাঁকে মালিক বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করা হয় না। আর কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কোনো একটি গুণ বা সিফাত হুবহু স্বীকার ও বিশ্বাস না করলে সে মুমিনের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

৫। اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দুস) : অতিশয় পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার অক্ষমতা, দুর্বলতা ও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে- অতিশয় পূতঃপবিত্র সত্তা। নশ্বরতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা, ত্রুটি বা কোনো অপগুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

৬। اَلسَّلَامُ (আস সালাম) : শান্তিময় ও নিরাপদ। কোনো প্রকার অশান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয়না, কারণ কোনো প্রকার বিপদ-আপদ, দুর্বলতা, অক্ষমতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁকে স্পর্শ করেনা।

৭। اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) : নিরাপত্তাদাতা, নিরাপত্তা বিধায়ক, আশ্রয় ও প্রশান্তিদানকারী।

৮। اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন) : নেগাহ্বান, রক্ষক, সকল কিছুর তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৯। اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) : মহাপরাক্রমশালী। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী কার্যকর। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই, কিছুই নেই, তিনি অন্যের ওপর বিজয়ী। সকলকে তিনি পরাভুত করতে সক্ষম, কারণ সকল কিছু তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে কেউ পরাভুত করতে বা তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। যা তিনি চান তা কার্যকর করতে তিনি সক্ষম। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কোনো ক্ষমতা নেই।

১০। اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) : শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী। তিনি অতিশয় কঠোর। অত্যন্ত জবরদস্ত, অদম্য শক্তির অধিকারী। সৃষ্টির যেকোনো শক্তি তাঁর সম্মুখে সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসহায়। সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করতে এবং পুনঃসৃষ্টি করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে তিনি দুর্বার ক্ষমতা রাখেন।

১১। اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) : অহংকারের অধিকারী- যাঁর অহংকার শোভা পায়। গর্ব, অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের একমাত্র অধিকারী। প্রত্যেক বড়ত্বের দাবীদার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। গোটা সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। তাই তিনি ছাড়া কেউ বড়ত্বের দাবী বা অহংকার করতে পারেনা। তাঁর বড়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার কেউ নেই।

১২। اَلْخَالِقُ (আল খালিক) : সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী। অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিনিই সর্বোত্তমভাবে সকল কিছু সৃষ্টিকারী, সৃষ্টির নীল নকশা প্রস্তুতকারী। সকল কিছুর সর্বপ্রকার গুণ, ক্ষমতা, শক্তি ও কর্মের স্রষ্টা একমাত্র তিনি।

১৩। اَلْبَارِئُ (আল বারী) : ত্রুটিহীন স্রষ্টা। অস্তিত্ব দানকারী। অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ শূন্যতার বা অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে অস্তিত্ব দান করেন।

১৪। اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাব্বির) : আকৃতিদানকারী। প্রকল্পক, নক্শা অঙ্কনকারী, ডিজাইনার। সকল কিছুর আকৃতিদানকারী।

১৫। اَلْغَفَّارُ (আল গাফ্ফার) : বড় ক্ষমাশীল- যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ মার্জনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

১৬। اَلْقَهَّارُ (আল কাহ্হার) : দুর্দান্ত প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমতা ধর, ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোনো বাধা নেই। সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন।

১৭। اَلْوَهَّابُ (আল ওয়াহ্হাব): অতিশয় দাতা ও দানশীল। যাঁর দান অবারিত।

১৮। اَلرَّزَّاقُ (আর রাযযাক) : রিযিকদাতা- সৃষ্টিকুলকে অধিক অধিক রিযিক দানকারী। সৃষ্টিকুলের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী।

১৯। اَلْفَتَّاحُ **(আল ফাত্তাহ্)** : সঠিক সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা দানকারী। যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী। বিপদ মুক্তকারী, যাঁর দয়ার ভাণ্ডার খোলা।

২০। اَلْعَلِيْمُ **(আল আ'লীম)**: অতিশয় জ্ঞানী, অসীম জ্ঞানের আধার। যিনি গুপ্ত ব্যক্ত সবকিছু জানেন। বান্দার প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা-কল্পনা ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি সঠিকভাবে জ্ঞাত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।

২১। اَلْقَابِضُ **(আল কাবিদ্)**: রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারী।

২২। اَلْبَاسِطُ **(আল বাসিত)** : রিযিক ইত্যাদির সম্প্রসারণকারী। প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা দানকারী।

২৩। اَلْخَافِضُ **(আল খাফিয্)**: যিনি নিচে নামান। অবনতকারী।

২৪। اَلرَّافِعُ **(আল রাফিউ)**: যিনি উপরে উঠান। উন্নয়নকারী।

২৫। اَلْمُعِزُّ **(আল মুইযয্)**: সম্মান ও ইজ্জত দানকারী।

২৬। اَلْمُذِلُّ **(আল মুযিল্ল্)**: অপমান ও অপদস্থকারী।

২৭। اَلسَّمِيْعُ **(আস সামীউ)**: সর্বশ্রোতা-ছোট বড় সকল স্বরের। বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা তিনি শুনেন। গোটা সৃষ্টিকুলে সকলের কথা একই সাথে শুনতে ও বুঝতে পারেন। একজনের কথা শুনতে অন্যজনের কথা প্রতিবন্ধক হয়না। কারণ তাঁর মধ্যে কোনো অক্ষমতা নেই।

২৮। اَلْبَصِيْرُ **(আল বাছীর)**: সর্বদ্রষ্টা, একই সাথে অণুপরমাণুসহ ছোট বড় সকল জিনিসের ওপর দর্শক। এক দৃশ্য অন্য দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়না। নিখিল সাম্রাজ্যের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর বান্দাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও আচরণের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

২৯। اَلْحَكَمُ **(আল হাকাম্)**: নির্দেশ দানকারী, বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র বিচারকর্তা, নিরঙ্কুশ ফয়সালাকারী, মীমাংসাকারী। তাঁর ফয়সালাই সকলকে মেনে নিতে হবে।

৩০। اَلْعَدْلُ (আল আদলু): ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়বিচারক- যিনি যা উচিত তাই করেন।

৩১। اَللَّطِيْفُ (আল লাতীফু): তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, অতিশয় সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকারী, যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন।

৩২। اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীরু): তিনি সব বিষয়ে খবর রাখেন। যিনি গুপ্ত ভেদ অবগত, ভেতরের বিষয় জ্ঞাত।

৩৩। اَلْحَلِيْمُ (আল হালীমু): ধৈর্যশীল-যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শাস্তি দেন না। সীমাহীন সহিষ্ণু। শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না। বান্দাদের শোধরানো ও অনুশোচনার অবকাশ দিয়ে থাকেন। তিনি কখনো উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হন না। অতিশয় উচ্চ ও মহামর্যাদাবান।

৩৪। اَلْعَظِيْمُ (আল আযীমু): বিরাট ও বহু সম্মানী। নিজ অস্তিত্বে ও গুণাবলিতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও মহান।

৩৫। اَلْغَفُوْرُ (আল গাফুরু): যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। অতিশয় করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

৩৬। اَلشَّكُوْرُ (আশ্ শাকুরু): মর্যাদাদানকারী, যিনি অল্প কাজে বেশি পুরস্কার দেন। সততা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার মূল্য দানকারী।

৩৭। اَلْعَلِيُّ (আল আলিয়্যু): চরম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। সর্বোচ্চ সমাসীন, সর্বোপরি।

৩৮। اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু): বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধ্বে বড়, অতিশয় ও শ্রেষ্ঠ।

৩৯। اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীযু): বড় রক্ষাকারী- যিনি বান্দাদের সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। আসমান-যমীনের প্রতিটি জিনিসকে তিনি হিফাযত করেন। তিনি বান্দার হিফাযতকারী।

৪০। اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীতু): খাদ্যদাতা, দৈহিক ও আত্মিক শক্তিদাতা। প্রত্যেক সৃষ্টিকে সঠিক অংশ পুরোপুরিভাবে দান করেন।

৪১। اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীবু): হিসাব গ্রহণকারী। যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন, যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন।

৪২। اَلْجَلِيْلُ (আল জালীলু) : গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত- যাঁর মহিমার তুলনা নেই।

৪৩। اَلْكَرِيْمُ (আল কারীমু): মুক্ত ও উদার দাতা। অধিকদাতা। অত্যন্ত সদাচারী। আশার অতিরিক্ত দাতা। যিনি বিনা প্রশ্নে দান করেন।

৪৪। اَلرَّقِيْبُ (আর রাক্বীবু):পর্যবেক্ষণকারী, যিনি বান্দাদের তৎপরতার ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখেন। সকল বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখেন।

৪৫। اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীবু): দু'আ শ্রবণকারী ও কবুলকারী। ডাকে সাড়া দাতা, উত্তরদাতা।

৪৬। اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসিউ): তিনি অত্যন্ত মুক্ত ও প্রশস্ততার অধিকারী। বান্দাদের প্রতি তিনি বড়ই উদার ও সহানুভূতিশীল। সম্প্রসারণকারী; অথবা যাঁর দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য সর্বব্যাপী সম্প্রসারিত ও বিপুল।

৪৭। اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীমু) : প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি সকল কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। তিনিই সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৌশল-প্রকৌশল ও বিজ্ঞতার উৎস ও আধার। সৃষ্টির কাঠামো ও বান্দাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের তিনি সুকৌশল ও বিজ্ঞতার সাথে ফয়সালা করেন।

৪৮। اَلْوَدُوْدُ (আল ওয়াদুদ): পরম বন্ধু। দয়া ও মহব্বতের উৎস। তিনি বান্দার কল্যাণকে ভালোবাসেন।

৪৯। اَلْمَجِيْدُ (আল মাজীদু): গৌরবময়, অসীম অনুগ্রহকারী। তিনি অতিশয় মহীয়ান ও মর্যাদাবান।

৫০। اَلْبَاعِثُ (আল বায়িসু): প্রেরক, রাসূল প্রেরণকারী, রিযিক প্রেরণকারী, কবর হতে হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানকারী।

৫১। اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদু): তিনি সর্বত্র উপস্থিত। সবকিছুর সাক্ষী। প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৫২। اَلْحَقُّ (আল হাক্কু) : সত্য, তিনি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং হক মা'বুদ। তাঁর প্রভুত্ব এবং বাদশাহী সত্য ও যথার্থ। তিনি প্রকৃত সত্তা, অতি বাস্তব। তাঁর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করলে তাঁর কিছুই যায় আসে না। তিনি সত্য প্রকাশক। যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন।

৫৩। اَلْوَكِيْلُ (আল ওয়াকীলু): কর্মকর্তা, দায়িত্বশীল। যাঁর ওপর নির্ভর করা যায়। কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগান দেন।

৫৪। اَلْقَوِيُّ (আল কাবিয়্যু): শক্তিবান, শক্তির আধার। অতিশয় শক্তিশালী। তাঁর শক্তির নিকট কারো শক্তিই খাটে না। তাঁর ক্ষমতা কখনো শেষ হবেনা।

৫৫। اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীনু): বড় ক্ষমতাবান। যার ওপর কারো ক্ষমতা নেই। তিনি সুদৃঢ় ও নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৫৬। اَلْوَلِيُّ (আলওলিয়্যু): পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, অভিভাবক, বন্ধু। যিনি মুমিনদের ভালোবাসেন ও সাহায্য করেন।

৫৭। اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদু): স্বপ্রশংসিত। প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তিনি কারো প্রশংসা লাভের মুখাপেক্ষী নন।

৫৮। اَلْمُحْصِىُ (আল মুহসী): হিসাবরক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন।

৫৯। اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদিউ): বিনা নমুনায় স্রষ্টা, যিনি মডেল বা আকৃতি না দেখে সৃষ্টি করেন।

৬০। اَلْمُعِيْدُ **(আল মু'য়ীদু)**: মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

৬১। اَلْمُحْيِيْ **(আল মুহয়ী)**: জীবনদাতা।

৬২। اَلْمُمِيْتُ **(আল মুমীতু)**: মৃত্যুদানকারী।

৬৩। اَلْحَيُّ **(আল হাইয়্যু)**: চিরঞ্জীব। তিনি সকল সময় থেকে আছেন এবং থাকবেন। ঘুম, তন্দ্রা, অবচেতনা ইত্যাদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

৬৪। اَلْقَيُّوْمُ **(আল কাইয়্যুমু)** : চিরন্তন, চির শাশ্বত। চিরকাল থেকে আছেন- চিরকাল থাকবেন। সৃষ্টির কাঠামোকে ধারণ করে আছেন। স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, সব কিছুর প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বজাহানের সকল কিছুকে যিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, ধারণ করে আছেন, সংরক্ষণ করে আছেন।

৬৫। اَلْوَاجِدُ **(আল ওয়াজিদু)**: যিনি যা চান তা পান।

৬৬। اَلْمَاجِدُ **(আল মাজীদু)**: বড় দাতা, সম্মানিত।

৬৭। اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ **(আল ওয়াহিদুল আহাদ)**: তিনি এক, শুধুই এক। তিনি একক। তাঁর জাত ও গুণাবলিতে তিনি সম্পূর্ণ এক ও একক। কেউই তাঁর শরীক নয় এবং কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সবাই এবং সব কিছুই এ এক-এককের মুখাপেক্ষী।

৬৮। اَلصَّمَدُ **(আস্ সামাদু)**: অমুখাপেক্ষী- যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। কারণ তাঁর সত্তায় জ্ঞানে শক্তিতে ক্ষমতায় কোনো প্রকার কমতি, ঘাটতি নেই, কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো প্রকার কোনো দুর্বলতা, অপারগতা নেই।

৬৯। اَلْقَادِرُ **(আল কাদিরু)**: ক্ষমতা বান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। মহাশক্তিধর। অর্থাৎ যেকোনো সময় যেকোনো শক্ত, কঠিন ও বিরাট কাজ করার তিনি শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন।

৭০। اَلْمُقْتَدِرُ (**আল মুকতাদিরু**): মহাশক্তিমান, স্বাধীন, প্রবল পরাক্রমশালী, কোনো কিছুতেই বাধ্য নন। সকলের ওপর যাঁর ক্ষমতা রয়েছে।

৭১। اَلْمُقَدِّمُ (**আল মুকাদ্দিমু**): অগ্রবর্তীকারী। যিনি নিকটে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। তিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দাহদের সম্মান মর্যাদায় অগ্রবর্তী করেন।

৭২। اَلْمُؤَخِّرُ (**আল মুআখখিরু**): পশ্চাদবর্তীকারী। যিনি দূরে রাখেন এবং পেছনে করেন যাকে চান।

৭৩। اَلْاَوَّلُ (**আল আউয়ালু**): প্রথম, অনাদি। তিনি সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির পূর্ব থেকে আছেন। সকল সময় থেকে আছেন।

৭৪। اَلْاٰخِرُ (**আল আখিরু**): সর্বশেষ, অনন্ত। তিনি সৃষ্টিজগতের ধ্বংসের পরও থাকবেন। সকল সময় থাকবেন।

৭৫। اَلظَّاهِرُ (আয্ যাহিরু): প্রকাশ্য, তিনি প্রকাশ্য গুণে ও নিদর্শনে। তিনি সর্বত্র প্রকাশমান। তাঁর অস্তিত্ব সূক্ষ্ম ও গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বে ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলছে। এ হিসেবে তিনি প্রকাশ্য।

৭৬। اَلْبَاطِنُ (**আল বাতিনু**): গোপন। যিনি গুপ্ত সত্তাতে প্রচ্ছন্ন।

৭৭। اَلْوَالِى (**আল ওয়ালী**): অভিভাবক, মুরব্বী, উত্তরাধিকারী।

৭৮। اَلْمُتَعَالِى (**আল মুতায়ালী**): সর্বোপরি, সম্মানিত।

৭৯। اَلْبَرُّ (**আল বাররু**): মুহসীন, অনুগ্রহকারী। সহানুভূতিশীল। কল্যাণময়।

৮০। اَلتَّوَّابُ (**আত্ তাওয়্যাবু**): তাওবা গ্রহণকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন। বান্দার তাওবা কবুল করেন তিনি।

৮১। اَلْمُنْتَقِمُ (**আল মুনতাকিমু**): প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন।

৮২। اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ) : বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকারী, অত্যধিক ক্ষমাশীল।

৮৩। اَلرَّؤُوْفُ (আর রাউফু): বড় দয়ালু, সীমাহীন অনুগ্রহ ও সহানুভূতিশীল।

৮৪। مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল-মুলক): রাজাধিপতি, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। যাঁর রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

৮৫। ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম): মহিমা ও সম্মানের অধিকারী, মহাসম্মানিত মাহানুভব।

৮৬। اَلْمُقْسِطُ (আল মুকসিতু): ন্যায়বিচারকারী, অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক হতে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৮৭। اَلْجَامِعُ (আল জামিউ): কিয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী।

৮৮। اَلْغَنِىُّ (আল গানিয়্যু): মুখাপেক্ষীহীন। তাঁর কোনো অভাব নেই, কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তাঁর সবই আছে এবং সব কিছু কেবল তাঁরই। তাই সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী।

৮৯। اَلْمُغْنِى (আল মুগনী): অভাব মোচনকারী। যিনি কাউকে কারো মুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

৯০। اَلْمَانِعُ (আল মানিউ): প্রতিরোধকারী, বিপদে বাধাদানকারী।

৯১। اَلضَّارُّ (আদ্দাররু): অকল্যাণকারী, ক্ষতিকারক, যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন। মন্দ করার একমাত্র মালিক।

৯২। اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ): কল্যাণকারী, উপকারী। যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। ভাল করার একমাত্র মালিক।

৯৩। اَلنُّوْرُ (আন নূরু): আলোকময়, আলোক, প্রভা, প্রভাকর, জ্যোতির্ময়।

৯৪। اَلْهَادِىْ (আলহাদী): পথ প্রদর্শক (যারা তাঁর দিকে যেতে চায় তাদেরকে)।

৯৫। اَلْبَدِيْعُ (আল বাদিউ): নব স্রষ্টা, কোনো প্রকার উদাহরণ ছাড়াই তিনি পয়দা করেন। অদ্বিতীয় স্রষ্টা।

৯৬। اَلْبَاقِىْ (আল বাকী): সর্বদা অবস্থানকারী, চিরস্থায়ী। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন।

৯৭। اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিসু): তিনিই সব কিছুর প্রকৃত ও চিরন্তন মালিক। উত্তরাধিকারী। সকল কিছু শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন।

৯৮। اَلرَّشِيْدُ (আর রাশীদু): সত্যদর্শী, সৎ পথপ্রদর্শক। দ্বীনী ও দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। কারো পরামর্শ বা বাতলানো ছাড়া যার কাজ উত্তম ও ভালো হয়।

৯৯। اَلصَّبُوْرُ (আসসাবূরু): বড়ই ধৈর্যশীল।

এখানে কেবল হাদীসে বর্ণিত নিরানব্বইটি নামেরই উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও কুরআন মাজীদে বেশ কিছু নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

اِلٰه - ইলাহ, اَلرَّبُّ- প্রতিপালক, اَلْمَوْلٰى- প্রভু, মালিক, اَلشَّدِيْدُ- মহা কঠোর, اَلْمُحِيْطُ-পরিবেষ্টনকারী, اَلنَّصِيْرُ- সাহায্যকারী, اَلْمُبِيْنُ- সুস্পষ্টকারী, اَلْفَاطِرُ- সৃষ্টিকর্তা, اَلْقَرِيْبُ- নিকটবর্তী, اَلْمُسْتَعَانُ- আশ্রয়দাতা, اَلْغَالِبُ- চির বিজয়ী, اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ- ন্যায়ের সঙ্গে চিরদণ্ডায়মান, اَلْمُنْعِمُ- নিয়ামতদাতা, اَلْمُعْطِى দাতা, اَلسَّتَّارُ গোপনকারী ইত্যাদি।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব নামের সঠিক তাৎপর্য জানা, বুঝা এবং এ নামগুলোর তাৎপর্য অনুযায়ী এসব নামে তাঁকে ডাকার এবং দু'আ প্রার্থনা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহর মহান নাম ও ইসমু আ'যম দ্বারা দু'আ করা

বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, দু'আ করার শুরুতে আল্লাহ প্রশংসা বা হামদ-সানা করে, নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং আল্লাহর মহান পবিত্র নামসমূহ ধরে ডেকে ডেকে দু'আ করলে আল্লাহ দু'আ কবুল করেন। এভাবে দু'আর আগে হামদ-সানা ও আল্লাহর মহান নামসমূহ ধরে দু'আ করলে একদিকে যেমন মনে আল্লাহর প্রতি আবেগ, ভালবাসা আসে তেমনি দু'আতে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আমরা যে প্রকারের দু'আ করতে চাই, মহান আল্লাহর, সে প্রকারের নাম নিয়ে তার উসিলা দিয়ে দু'আ করতে পারি। এতে আশাকরা যায় আল্লাহ তাঁর ঐ মহান নামের বদৌলতে বান্দার দু'আ কবুল করবেন। আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার বিষয়ে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন :

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করা হবে।"[৫৭]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا ، مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০'র একটি কম, যে ব্যক্তি এ নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে নামগুলির বিবরণ দেওয়া হয়নি। ৯৯টি নাম সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্য কয়েকজন মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত বিবরণকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি সংকলন করে তার সনদের দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

---

[৫৭]. সূরা আ'রাফ : ১৮০।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, ৯৯টি নামের তালিকা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নয়। পরবর্তী রাবী এগুলি কুরআনের আলোকে বিভিন্ন আলিমের মুখ থেকে সংকলিত করে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে উল্লেখিত অনেক নামই এ তালিকায় নেই। কুরআন করীমে মহান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয়েছে 'রাব্ব' বা প্রভু নামে। এ নামটিও এই তালিকায় নেই।[৫৮]

এক্ষেত্রে আগ্রহী মুসলিম চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯৯টি নাম হিসাব রাখতে নির্দেশনা দিলেন কিন্তু নামগুলির নির্ধারিত তালিকা দিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আংশিক গোপন রাখা হয়, মুমিনের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য। যেমন, লাইলাতুল কাদ্‌র, জুম'আর দিনের দোয়া কবুলের সময় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নামের নির্ধারিত তালিকা না বলে আল্লাহর নাম সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন বান্দা আগ্রহের সাথে কুরআন কারীমে আল্লাহর যত নাম আছে সবই পাঠ করে, সংরক্ষণ করে এবং সকল নামে আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং সেগুলির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে।[৫৯]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী সংকলিত তালিকাটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।[৬০] সর্বাবস্থায় আগ্রহীগণ এই নামগুলি মুখস্থ করতে পারেন। এ ছাড়া কুরআন কারীমে উল্লেখিত আল্লাহর সকল মুবারাক নাম নিয়মিত কুরআন পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

আল্লাহর নামসমূহের ওসীলায় দুঃখ, বেদনা, চিন্তা এমনকি রোগ এবং পেরেশানী দূর করার দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَتِكَ. نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ. مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ. اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ. اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ. اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِي. وَنُوْرَ صَدْرِي. وَجَلَاءَ حُزْنِي. وَذَهَابَ غَمِّي

---

৫৮. সহীহ বুখারী ২/৯৮১, নং ২৫৮৫, সহীহ মুসলিম ৪/২০৬৩, নং ২৬৭৭।

৫৯. সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৩০, নং ৩৫০, নং ৩৫০৭, সুনানু ইবনি মাজাহ/ ২/১২৬৯, নং ৩৮৬১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬২-৬৩।

৬০. নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১৫১, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/১৪-১৬, জামিউল উসূল ৪/১৭৩-১৭৫।

'হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার (একজন) বান্দার পুত্র, (একজন) বান্দীর পুত্র, আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি প্রর্থনা করছি সে সমস্ত নামের প্রত্যেকটির ওসীলা ধরে, যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় গাইবি জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তার মাধ্যমে তোমার নিকট এ আকুল নিবেদন জানাই যে, তুমি কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি বানিয়ে দাও, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরিতকারী বানিয়ে দাও।'

"আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখনই কোনো ব্যক্তির কোনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠতা বা দুঃখ-বেদনার মধ্যে নিপতিত হবে তখন সে এ (উপরের বাক্যগুলো দ্বারা) দু'আ পাঠ করবে, যখন কোনো ব্যক্তি এ দু'আ পাঠ করবে তখন আল্লাহ অবশ্যই তার চিন্তা এবং বেদনা দূর করে দিবেন, তার চিন্তাকে আনন্দে পরিণত করে দিবেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি দু'আটি মুখস্থ করব? তিনি বললেন: কেন নয়, প্রত্যেকটি শ্রবণকারীর উচিত এ দু'আ মুখস্থ করা। (সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২৫৩, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৪০৪-৪০৭, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯০, মুসনাদ আহমদ ১/৩৯১, ৪৫২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৩৬,১৮৬। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।)

মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-১

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থঃ "হে আল্লাহ!আমি আপনার নিকট এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্মদান করেননি ও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

বুরাইদাহ আসলামী (রা.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ করছে (উপরের) কথা দিয়ে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে

বলছি, নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন (দু'আ কবুল করেন) এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" (সুনানে তিরমিযী ৫/৫১৫,নং ৩৪৭৫, সুনানে আবু দাউদ ২/৭৯,১৪৯৩, সুনানে ইবনু মাযাহ ২/১২৬৭,নং ৩৮৫৭, হাদীসখানা সহীহ)

মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-২

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

অর্থঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি (এ বলে) যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হে মহা দাতা, হে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে বিশ্বজাহানের ধারক অভিভাবক।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সাথে বৃত্তাকারে বসেছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু'আ করল এবং দু'আর মধ্যে বলল (উপরের কথাগুলো)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "নিশ্চয় সে আল্লাহ কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৫০, নং ৩৫৪৪, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৬৮নং ৩৮৫৮, সুনানু আবি দাউদ ২/৭৯ নং১৪৯৫, সুনানু নাসাঈ ৩/৫২ নং ১৩০০, হাদীসটির সনদ সহীহ)

মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-৩, দু'আ ইউনুস আ.

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থঃ "আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি অত্যাচারিতদের অন্তর্ভুক্ত।"

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা, বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যুন্নুন (ইউনুস) মাছের পেটে যে দু'আ বলে দু'আ করেছিল- এর দ্বারা যে কোনো মুসলিমই দু'আ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আ কবূল করবেন।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫২৯ নং ৩৫০৫, হাদীসটি সহীহ)

আমাদের দেশের প্রচলিত অনেক বইয়ে এ সকল নামের আরো অনেক ফযীলাত লেখা হয়েছে। যেমন প্রত্যহ এগুলি পাঠ করলে অন্নকষ্ট হবে না, রোগ ব্যাধি দূর হবে, স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারত হবে, মনের আশা পূর্ণ হবে, দৈনিক এত বার অমুক নামটি এত দিন পর্যন্ত পড়লে, বা লিখলে অমুক ফল লাভ করা যাবে অথবা অমুক নাম প্রতিদিন এত বার এ পদ্ধতিতে করলে অমুক ফল পাওয়া যাবে, অথবা অমুক নাম এতবার পাঠ করতে হবে ইত্যাদি। এ ধরনের কোনো কথাই কুরআন বা হাদীসের কথা নয়। কোনো কোনো বুযুর্গ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কোনো আমল বা তদবীর করেছেন বা শিখিয়েছেন। তবে এগুলিকে আল্লাহর কথা বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মনে করলে বা হাদীস হিসেবে বর্ণনা করলে রাসূলূল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলা হবে।

রাসূল ﷺ-এর ওপর সালাত ও সালাম

আল্লাহর নবী ﷺ এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা আল্লাহর যিকর ও দু'আ বা প্রার্থনামূলক ইবাদাতের একটি বিশেষ প্রকরণ। এতে মুমিন বান্দাহ যেমন আল্লাহর স্মরণ করেন তেমনি সৃষ্টির সেরা নবীয়ে আকরাম ﷺ এর ওপর অবারিত রহমত ও শান্তি বর্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। নবীর প্রতি সালাত ও সালামের মাধ্যমে বান্দাহ নিশ্চিতরূপে আল্লাহর যিকরের যাবতীয় ফজিলত, নবী প্রেম অর্জন ও নিজের গুনাহ মাফ এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী হতে পারেন।

সালাত ও সালামের অর্থ ঃ

বাংলাভাষায় বিভিন্ন ইসলামী আরবী শব্দের ফার্সী অনুবাদ বা ফার্সী প্রতিশব্দ প্রচলিত হওয়ায় মূল আরবী ও ইসলামী শব্দের আবেদন হারিয়ে গেছে। এমন কি এ কারণে আমরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ ও পরিভাষা পর্যন্ত জানিনা। এরূপ একটি শব্দ হলো 'সালাত'। মুসলিম জীবনের অন্যতম দু'টি ইবাদাতের নাম হলো 'সালাত'। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতকে আমরা ফার্সী ভাষায় নামাজ এবং নবীর প্রতি সালাতকে আমরা ফার্সী ভাষায় দরূদ বলে থাকি।

সকল ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতাগণ 'সালাত' এর অর্থ করেছেন, দুআ বা প্রার্থনা করা, রহমত ও বরকতের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতকে (নামাজ) সালাত নামকরণের কারণ এ ইবাদাতের মূলে আছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত প্রদানের বা সালাত পাঠানোর অর্থ রহমত, করুণা ও বরকত

প্রদান করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ কে সালাত প্রদান বা প্রেরণের অর্থ হলো তাঁকে রহমত প্রদান করা, সর্বোত্তম মর্যাদা ও প্রশংসা প্রদান করা। 'ফিরিশতারা কারো ওপর সালাত প্রেরণ করেছেন' এর অর্থ তাঁরা আল্লাহর কাছে উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমতের, মর্যাদা ও ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করেছেন। কোনো মানুষ অন্যের ওপর 'সালাত' প্রদান করেছেন বা প্রেরণ করেছেন বলতে বুঝায় ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত, ক্ষমা ও মর্যাদার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

কুরআনে কারীমে সালাত

আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُه لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ

অর্থ: "আল্লাহ তো তিনি যিনি তোমাদের ওপর সালাত প্রদান করেন (তোমাদেরকে দয়া করেন, ক্ষমা করেন, তোমাদের প্রশংসা ছড়িয়ে দেন এবং তোমাদের সম্মানিত করেন) এবং ফিরিশতাগণও (তোমাদের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন); যেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন।"

এ আয়াতে আল্লাহ ঈমানদারগণের প্রতি সালাত প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁর অফুরন্ত করুণা, ক্ষমা ও বরকত প্রদান করেন। আর ফিরিশতাগণ মু'মিনগণের ওপর সালাত পাঠ করেন অর্থাৎ সম্মানিত ফিরিশতাগণ আল্লাহর নিকট মু'মিনগণের জন্য করুণা, ক্ষমা ও বরকত চেয়ে প্রার্থনা করেন।

সূরা তাওবার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবীকে মু'মিনগণের প্রতি সালাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থ:"(হে রাসূল!) আপনি (মু'মিনদের) সম্পদ থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পবিত্রতা, বরকত ও বৃদ্ধি প্রদান করবে এবং আপনি তাদের ওপর 'সালাত' দান করুন (তাদের কল্যাণ, বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করুন)। নিশ্চয় আপনার 'সালাত' তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে।"

সর্বোপরি মহান আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ মহানবী ﷺ এর ওপর 'সালাত' প্রদান করেন। আর মু'মিনগণকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন নবীর প্রতি সালাত ও

সালাম প্রেরণ করার জন্য। সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর ওপর 'সালাত' প্রদান করেন। (আল্লাহ তাঁর মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তাফসীরে তাবারী ও ইবনে কাসীর)। হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর ওপর 'সালাত' ও 'সালাম' প্রেরণ করো।

আমরা বুঝলাম: নবী করীম ﷺ-এর ওপর আল্লাহ তা'আলার সালাত পাঠের অর্থ হলো, রহমত অবতীর্ণ করা! আর ফিরিশতাগণ ও মুসলমানদের সালাত পাঠের অর্থ হলো, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য দু'আ করা। হাদীসে নববীতেও সালাতের এরূপ অর্থ বর্ণিত আছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ"

আবু হুরায়রা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি তার সালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার ওযু না ভাঙা পর্যন্ত মালাকরা অর্থাৎ ফিরিশতারা তার জন্য (সালাত) দু'আ করবেন। তারা বললেন: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর। (বুখারী)[৬১]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ»

---

[৬১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুচ্ছলাত।

আয়িশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা কাতারের ডান পাশের লোকদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দু'আ করে থাকেন। (আবু দাউদ)[৬২]

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে আকরাম ﷺ এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং অত্যন্ত বড় নেক কাজ। বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, হাবীব ও খলীল রাসূলে আকরাম ﷺ আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নি'আমত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি, মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাঁর জন্য যে মানব আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও রহমতের জন্য প্রার্থনা করবে না, তাঁর ওপর যে মানুষ সালাম পাঠাবেনা, সে মানুষ কত বড় কৃপণ ও মানবজাতির কলঙ্ক হতে পারে তা কি কল্পনা করা যায়? এজন্য একজন মু'মিনের নূন্যতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে, সে তার ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক রাসূলে আকরাম ﷺ এর ওপর হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করবে। তাঁর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। যদিও আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়েছেন। তবুও মানব সন্তানের দায়িত্ব তাঁর জন্য প্রার্থনা করা।

সালাত পাঠের ফযীলাত

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নবীর প্রতি যদিও সালাত পাঠ আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য তবুও দয়াময় আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রতি সালাত পাঠকারীর ওপর এতো বেশী খুশী হন যে, এর জন্য তিনি অফুরন্ত পুরস্কার দান করবেন।

(১) আল্লাহ দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রা. বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّه مَنْ صَلَّي عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

"তোমরা আমার ওপর সালাত পাঠ করো; কারণ যে ব্যাক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, নং-৩৮৪।)

---

[৬২] সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খণ্ড, হা/নং ৬২৮, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত 'ডান পাশের লোকদের ওপর' কথাটি সহীহ সনদে পাওয়া যায় না। বরং হাদীসের আসল শব্দ হলো নিম্নরূপ- আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেন যারা কাতারকে মিলায় এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দু'আ করে থাকেন। (দেখুন- সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খণ্ড, হা/নং-৬৭৬, পৃ. ১৯৯।

হযরত আবু বুরদা ইবনু নিয়ার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّي عَلَيَّ صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَصَلَوَاتٍ, وَرَفَعَهُ بِهَاعَشْرَ دَرَجَاتٍ , وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ, وَمَحَا عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ

"যদি কেউ অন্তর থেকে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ সে সালাতটির বিনিময়ে তার প্রতি ১০টি রহমত নাযিল করেন, তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গুনাহ ক্ষমা করবেন।" (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১, হদীসটির সনদ হাসান)

হযরত আনাস রা. বলেন' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّي عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَصَلَوَاتٍ, وَحُطَّتْ عَنْه عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ, وَرَفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তার ওপর দশটি সালাত (রহমত) নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।" (সুনানে নাসাঈ, কিতাবুস সাহউ, নং ১২৯৭, মুসনাদ আহমাদ ১১৫৮৭, ১৩৩৪৩, বুখারী আদাবুল মুফরাদ, বাবু সালাতিন নবী, হাদীস সহীহ)

হযরত আবু তালহা রা. বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে দেখা গেল। তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দের ছাপ ছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি খুবই আনন্দচিত্ত। আপনার চেহারা মুবারকে আনন্দের ছাপ রয়েছে। তিনি বললেন:

اَجَلْ, اَتَانِيْ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّي عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

"হ্যাঁ, আমার প্রভুর নিকট থেকে একজন দূত এসে আমাকে বললেন: আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার ওপর সালাত পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য দশটি সাওয়াব (পুরস্কার) লিখবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন,

তার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য ঠিক অনুরূপ সালাত (রহমত ও মর্যাদা) ফিরিয়ে দিবেন।" (মুসনাদ আহমাদ ৪/২৯, হাদীসটি হাসান)

অন্য হাদীসে আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত চেহারায় আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম; আমরা আপনার চেহারা মুবারকে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন: আমার কাছে ফিরিশতা এসে বলল, আপনার প্রভু বলেছেন-

أَمَا يَرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"আপনি কি খুশি নন যে, যদি কেউ আপনার ওপর একবার সালাত পাঠ করে তাহলে আমি তার ওপর দশবার সালাত (রহমত ও মর্যাদা) দান করবো। আর যদি কেউ আপনার ওপর একবার সালাম জানায় আমি তার ওপর দশবার সালাম (শান্তি) বর্ষণ করবো।" (সুনানু নাসাঈ, কিতাবুস সাহউ নং১২৮৩, ১২৯৫, মুসনাদ আহমাদ,)

আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন আউফ রা. বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে যান, আমিও তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন এবং সাজদায় যান। তিনি সাজদারত অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পেয়ে যাই এ ভেবে যে, সাজদারত অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল কিনা? এজন্য আমি কাছে এসে নজর করি। তিনি মাথা তুলে বললেন: আব্দুর রহমান, তোমার কি হয়েছে? তখন আমি আমার (মনের ভয়ের) কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন: জিবরাঈল আমাকে বললেন: আপনি কি এজন্য খুশি নন যে, আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

"আপনার ওপর যে সালাত (দরূদ) পাঠাবে আমিও তার ওপর সালাত (রহমত, ক্ষমা) পাঠাবো, আর যে আপনার ওপর সালাম পাঠাবে আমি তার ওপর সালাম পাঠাবো।" (নবীজি বলেন:) আর এজন্য আমি শুকরানা সাজদা করি।" (মুসনাদে আহমাদ ১/১৯১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৪৪, ৩৪৫, ৭৩৫। মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৮৭, হাদীসটি সহীহ)

(২) নবীর ওপর সালাত পাঠকারীর জন্য ফিরিশতাগণ আল্লাহর নিকট রহমত, ক্ষমা ও মর্যাদার জন্য প্রার্থনা করে।

নবীর ওপর সালাত পাঠের পুরস্কারের আরেকটি দিক হলো, আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতাগণ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করেন।

হযরত আমের আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া রা. বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا صلّٰى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَالِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ

"যে ব্যক্তি আমার ওপর সালাত পাঠ করবে, সে যতক্ষণ আমার ওপর সালাত পাঠ করতে থাকবে ফিরিশতাগণ ততক্ষণ তার জন্য সালাত (দু'আ) করতে থাকবে, অতএব কোনো বান্দাহ চাইলে (আমার ওপর) কম সালাত পাঠ করুক বা বেশী বেশী করে সালাত পাঠ করুক।" (সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ ১/২৭৩, মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১/২৯৪ নং ৯০৭, হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য)

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَالِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ

"কোনো ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর একবার সালাত পাঠ করে তাহলে আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ তার ওপর সত্তর বার সালাত পাঠান, অতএব কোনো বান্দাহ চাইলে তা বেশী করে করুক অথবা কম করে করুক।" (মুসনাদ আহমাদ ২/১৭২,১৮৭, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৬০, হাদীসটির সনদ হাসান।)

(৩) সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌছানো হয়

সালাত পাঠের পুরস্কারের ৩য় দিক, সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌছানো হবে। অন্য কোনো পরলোকগত মানুষের জন্য দু'আ করা হলে তা আল্লাহ হয়তো কবুল করবেন এবং যার জন্য দু'আ করা হয়েছে তাকে বিনিময়ে মর্যাদা বা পুণ্য দান করবেন। কিন্তু পরলোকগত ব্যক্তি হয়তো দু'আকারীর বিষয়ে বিস্তারিত জানবেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর সালাত পাঠকারীর সকল পুরস্কারের অতিরিক্ত আনন্দ এই যে, তাঁর নাম ও পরিচয়সহ তার সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌছানো হবে।

৪: রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য জান্নাতে উত্তম মর্যাদা প্রার্থনা করা কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশে ধন্য হওয়ার বড় কারণ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার ওপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাবে ; কারণ 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, আল্লাহর একজন বান্দাই এ স্থান লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সে বান্দাহ। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তার জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম হা/৩৮৪)

৫: দরূদ শরীফ গুনাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ أُبَيٌّ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ» . قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»: فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ»

উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন: আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করি। আমি কত সময় দরূদ পড়ব? তিনি বললেন: যত তোমার মন চায়। আমি বললাম: চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম: দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম: আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব।

তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে। (তিরমিযী) [৬৩]

৬: রাসূল ﷺ-এর জন্য দরূদ পাঠকারীর ওপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত অবতীর্ণ করেন আর তাঁকে সালামদাতার ওপর শান্তি বর্ষণ করেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَال: فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ "

আব্দুর রহমান (রা) বলেন, একদা রাসূলে করীম ﷺ বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অত:পর দীর্ঘক্ষণ সাজদা করলেন। এমন কি আমাদের ভয় হলো তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল নাকি? আমি তাঁকে দেখতে আসলাম। তখন তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন: তোমার কী হলো? আমি তাঁকে আমাদের ভয়ের কথা ব্যক্ত করলাম। তারপর তিনি বললেন: জিবরীল (আ) আমাকে বললেন: আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: "যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ পাঠ করবে আমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করবে আমি তার ওপর শান্তি নাযিল করব।" (আহমদ)[৬৪]

৭: সকাল-বিকাল দশবার করে দরূদ পড়া, রাসূলে করীম ﷺ-এর সুপারিশ অর্জনের বড় কারণ।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

[৬৩] সহীহ সুনানু তিরমিযী, দ্বিতীয় খণ্ড, হা/নং ১৯৯৯।

[৬৪] ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী-ইসমাঈল কাজী, তাহকীক; আলবানী, হা/নং-৭।

আবুদ্দারদা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে। (ত্বাবারানী)[৬৫]

৮: দরূদ পাঠ করা দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ» "

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: আমি সালাত আদায় করছিলাম। নবী করীম ﷺ এবং আবুবকর ও উমর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা তারপর নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করলাম। অত:পর নিজের জন্য দু'আ করলাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন: তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। (তিরমিযী)[৬৬]

৯: একবার দরূদ পাঠ করলে আমলনামায় দশটি পুণ্য লেখা হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ"

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশটি সওয়াব লিখে দেন। (ইসমাঈল আলকাজী)[৬৭]

১০: রাসূলে করীম ﷺ সালামদাতার সালামের উত্তর দান করেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

---

[৬৫] সহীহ জামিউসসাগীর, হা/নং ৬২৩৩।

[৬৬] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-৪৮৬।

[৬৭] ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক; আলবানী, হা/নং-১১।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম করে তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দেই। (আবু দাউদ)[৬৮]

বি:দ্র: বিভিন্ন হাদীসে দরূদ পাঠের প্রতিদান ভিন্ন ধরনের বর্ণিত আছে। তা বাস্তবে পাঠকারীর ইখলাছ, ঈমান ও পরহেজগারী এবং নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

দরূদ শরীফের গুরুত্ব

১. রাসূল ﷺ-এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়ে না তার জন্য তিনি বদ দু'আ করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ»

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো কিন্তু সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না। সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারল না। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। (তিরমিযী)[৬৯]

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়ে না তার জন্য জিবরীল (আ) বদ দু'আ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলেছেন।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ» فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: «آمِيْنَ» . فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: «آمِيْنَ» فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: «آمِيْنَ» . فَلَمَّا

---

[৬৮] ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং-৬।

[৬৯] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খণ্ড, হা/নং-২৮১০।

نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِيْنَ. فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِيْنَ. فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِيْنَ

কা'আব ইবনু উজরাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি প্রথম স্তরে চড়লেন তখন বললেন: হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেন: হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারো বললেন: হে আল্লাহ কবুল করুন। খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনো শুনিনি। তখন তিনি বললেন: আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বলল: যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হল না সে বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লাম তখন বললেন, আপনার নামের পরে যে দরূদ পড়লো না সে বঞ্চিত হোক তখন আমি বললাম হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে চড়লাম, তখন তিনি বললেন: যে পিতা-মাতাকে অথবা তাঁদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহ কবুল করুন। -হাকিম।[৭০]

৩. যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়ে না সে কৃপণ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»

আলী (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: সে ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো, কিন্তু সে আমার ওপর সালাত পড়ল না।-তিরমিযী।[৭১]

---

[৭০] ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক, আলবানী, হা/নং-১৯।
[৭১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খণ্ড, হা/নং-২৮১১।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّ «أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

আবু যার (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি বড় কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো, কিন্তু সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না।-ইসমাঈল আল কাজী।[৭২] (সহীহ)

৪. রাসূল ﷺ-এর ওপর সালাত পাঠ না করা কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ فِيْهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ"

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: যে মজলিসে লোকেরা আল্লাহর যিকির করবে না এবং নবী করীম ﷺ-এর ওপর সালাত পড়বে না, সে মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। যদিও নেক আমলের কারণে জান্নাতে চলে যায়।-আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, খতীব।[৭৩] (সহীহ)

৫. রাসূল ﷺ-এর ওপর সালাত পাঠ না করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ»

আব্বাস (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পড়া ভুলে যাবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে। ইবনু মাজাহ।[৭৪]

৬. যে দু'আর পূর্বে দরূদ পড়া হয় না সে দু'আ কবুল হয় না।

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

---

[৭২] ফাযলুচ্ছালাত আলান্নাবী, ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং-৩৭।

[৭৩] সিলসিলা সহীহা: আলবানী, প্রথম খণ্ড, হা/নং ৭৬।

[৭৪] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খণ্ড, হা/নং-৭৪০।

আলী (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: যতক্ষণ রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়া হবে না, ততক্ষণ দু'আ কবুল করা হয় না। ত্বাবারানী।[৭৫]

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত দরূদসমূহ

১. নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত তাঁর প্রতি সালাতের শব্দগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

عَنْ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "

(১) আবু হুমাইদ আবু সাঈদী (রা) বলেন: সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওপর সালাত পড়ব কিভাবে? রাসূল করীম ﷺ বললেন: তোমরা বল (আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।) হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও রাসূলুল্লাহদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও রাসূলুল্লাহদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। (বুখারী)[৭৬]

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي،

---

[৭৫] সিলসিলা সহীহা: আলবানী, পঞ্চম খণ্ড, হা/নং-২০৩৫। এ হাদীসের স্বপক্ষে একটি মাওকুফ হাসান হাদীস আছে। তা হলো, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তার কোনো অংশ ওপরে উঠে না। যতক্ষণ না তোমরা নবী করীম ﷺ-এর ওপর সালাত পাঠ কর। (তিরমিযী), হাসান, সহীহ তিরমিযী হা/নং-৪৮৩।

[৭৬] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া।

فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: "قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ"

(২) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: আমার সাথে কাআব ইবনু উজরার সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন: আমি কি সে হাদিয়াটুকু তোমার কাছে পৌছাব না যা আমি নবী করীম ﷺ-এর থেকে শুনেছি? আমি বললাম: অবশ্যই আপনি আমাকে সে হাদিয়া দেন। তারপর বললেন: আমরা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার এবং আহলে বাইতের ওপর কীভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? কেননা আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা বলে দিয়েছেন। তিনি বললেন: তোমরা বল: (আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।) হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৭৭] (বুখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَأَخْبِرْنَا بِهَا، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

[৭৭] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى وَدِدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ سَأَلَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "

(৩) উকবা ইবনু আমর (রা) বলেন: এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে এসে বসল এবং বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কীভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি। তবে আপনার ওপর কিভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তা আমাদের বলে দেন। তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তা'হলে অনেক ভালো হতো। তারপর তিনি বললেন: তোমরা আমার ওপর সালাত পাঠ করার জন্য বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্নায়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারেক আ'লা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারিকতা আ'লা ইবরাহীম ওয়া আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ**। অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর এবং নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ এবং তার পরিবার পরিজনের ওপর এমনভাবে বরকত নাযিল কর যেমনভাবে বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম এবং তার পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।- ইসমাঈল কাজী।[৭৮] (হাসান)

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَتّٰى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ

[৭৮] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং-৫৯।

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»

(৪) আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন: রাসূলে করীম ﷺ একদা সা'দ ইবনু উবাদার মজলিসে আমাদের কাছে আসলেন। তখন বশীর ইবনু সা'দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আপনার ওপর দরূদ পড়ি। আমরা কীভাবে আপনার ওপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তা হলে অনেক ভালো হতো। তারপর তিনি বললেন: তোমরা বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে পৃথিবীতে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -মুসলিম[৭৯]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ"

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা কীভাবে আপনার ওপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন: তোমরা বল: **"আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন**

[৭৯] সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত।

আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা ছল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মদ-এর ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম-এর ওপর।[৮০](বুখারী)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ اَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ»

(৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রা) বলেন: আমার সাথে কাআ'ব ইবনু উজরার সাক্ষাত হলো, তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনাকে কীভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি। তবে আপনার ওপর কীভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন: তোমরা বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।'** অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৮১] (মুসলিম)

---

[৮০] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর।

[৮১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ "

(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা কীভাবে আপনার ওপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন: তোমরা বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা।'** অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ-এর ওপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইবাহীম-এর ওপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম-এর ওপর।[৮২] (নাসায়ী)

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: " قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "

(৮) আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ওপর দরূদ পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। আমরা কীভাবে আপনার ওপর দরূদ পড়ব? রাসূলে করীম ﷺ বললেন: তোমরা বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।'** অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও রাসূলগণের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের

[৮২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-১২২৬।

ওপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও রাসূলগণের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ এ জগতে ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। –(ইবনু মাজাহ)[৮৩]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، وَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ "

(৯) যায়েদ ইবনু খারিজাহ (রা) বলেন: আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা আমার ওপর দরূদ পড় এবং অনেক বেশি চেষ্টা করে দু'আ কর। এভাবে বল: **'আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর রহমত বর্ষণ কর। (নাসায়ী) [৮৪]

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ أَخُو بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: " صَلُّوا عَلَيَّ وَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "

(১০) মূসা ইবনু ত্বালহা (রা) বলেন: যায়েদ ইবনু খারিজাহ আমাকে বললেন যে, তিনি বলেছেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কীভাবে সালাম করব তা আমরা জানি। তবে আপনার ওপর সালাত তথা দরূদ কীভাবে পাঠ করব? তখন তিনি বললেন: তোমরা আমার ওপর দরূদ পাঠ করত: বল: **'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।'** অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৮৫] -মুসনাদ আহমদ।

---

[৮৩] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খণ্ড, হা/নং-৭৩৮।

[৮৪] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-১২২৫।

[৮৫] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী-ইসমাঈল কাজী, তাহকীক; আলবানী, হা/নং-৬৮।

নবী করীম ﷺ-এর ওপর সালাম প্রেরণের জন্য মাসনুন শব্দ হলো নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেনঃ নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আল্লাহই হলেন 'সালাম'। অতএব তোমরা যখন সালাত আদায় করবে তখন বলবেঃ **'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছলাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিচ্ছলিহীন'**-এরূপ বললে আসমান ও জমিনের প্রত্যেক নেককার ব্যক্তি তা প্রাপ্ত হবে। তারপর বলবে **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'**। বুখারী[৮৬]

(দরূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে তাজ, দরূদে লাকী এবং দরূদে আকবারের শব্দগুলো সুন্নাহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।)

দরূদ পড়ার স্থানসমূহ

১. সালাত শেষ করার পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ. يَقُوْلُ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَجِلَ هٰذَا» . ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ

[৮৬] সহীহ বুখারী, কিতাবুচ্ছালাত।

فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

ফুজালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতে (নামাযে) দুআ করতে শুনলেন। লোকটি নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করল না। তখন তিনি বললেন: এ লোকটি তাড়াহুড়া করল। তারপর তাকে ডেকে বললেন: যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়বে তখন প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়বে। অত:পর যা ইচ্ছা দু'আ করবে। (তিরমিযী) [৮৭]

২. জানাযার সালাতে (নামায) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ

আবু উমামাহ (রা) বলেন: তাঁকে একজন সাহাবি বলেছেন: জানাযার সালাতে সুন্নাত হলো, প্রথমে ইমাম তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীরের পর চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তারপর (দ্বিতীয়) তাকবীর (এর পর) দরূদ পাঠ করবে এবং (তৃতীয় তাকবীরের পর) মৃতের জন্য বিশেষভাবে দুআ করবে। কুরআন পাঠ করবে না। তারপর (চতুর্থ তাকবীরের পর) চুপে চুপে সালাম দিবে। -শাফেয়ী[৮৮]

৩. আযান শুনার পর দু'আ পড়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ

---

[৮৭] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খণ্ড, হা/নং-২৭৬৭।

[৮৮] মুসনাদুশ শাফেয়ী, সালাতুল জানায়িয, হা/নং-৫৮১।

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন: যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে তখন তাঁর ন্যায় বল। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। তারপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য উসীলায় দু'আ করবে। কারণ উসীলা হল জান্নাতে একটি উচ্চতর মর্যাদা। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু একজনই প্রাপ্ত হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে উসীলার দুআ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।' -মুসলিম[৮৯]

৪. ঈমানদারের প্রতি সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي "

আবু হুরাইরা (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: তোমরা আমার কবরকে মেলায় পরিণত কর না। আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার ওপর দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।-আহমদ[৯০] (সহীহ)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ

---

[৮৯] সহীহ মুসলিম, কিতাবুছছলাত।
[৯০] ফাযলুছছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক; আলবানী, হা/নং-২০।

رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِیْ قَالَ لِیْ تِلْكَ الْمَلَكُ : يَا مُحَمَّدُ اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ صَلّٰى عَلَيْكَ السَّاعَةَ.

অর্থ: আবু বকর ছিদ্দীক (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমার কবরের কাছে একজন মালাইকা (ফেরেশতা) নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করে তখন সে মালাক আমাকে বলে: হে মুহাম্মদ! অমুকের ছেলে অমুক এ মুহূর্তে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করেছেন। -দায়লামী[৯১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা রয়েছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌছিয়ে দেন। -নাসায়ী[৯২]

৫. জুমু'আর দিন নবী করীম ﷺ-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: 'জুমু'আর দিন আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়, কারণ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার ওপর দরূদ পড়বে তার দরূদ আমার কাছে পৌছে দেয়া হয়।' হাকেম, বায়হাকী[৯৩]

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ. وَفِيْهِ قُبِضَ. وَفِيْهِ النَّفْخَةُ.

---

[৯১] সিলসিলা, সহীহা, আলবানী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-১২১৫।
[৯২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-১২১৫।
[৯৩] সহীহুল জামিউস সাগীর, প্রথম খণ্ড, হা/নং-১২১৯।

وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ»

আউস ইবনু আউস (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: সর্বোত্তম দিন হলো, জুমু'আর দিন। এ দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে, এ দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এ দিনেই লোকেরা বেহুঁশ হবে। অতএব তোমরা এ দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমাদের দরূদ কীভাবে পৌঁছানো হবে? আপনি তো মাটিতে মিশে যাবেন। তখন তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জমিনের ওপর নবীদের শরীর খাওয়া হারাম করেছেন। (আবু দাউদ)[৯৪]

৬. দু'আ ও মুনাজাত করার সময় আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর দরূদ পড়ার আদেশ রয়েছে।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ» . قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي اُدْعُ تُجَبْ»

ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বসেছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করল তথায় সে বলল: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর। তখন নবী করীম ﷺ বললেন: হে সালাত আদায়কারী! তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছ। যখন তুমি সালাত আদায় করতে গিয়ে বসবে তখন আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে তারপর আমার ওপর দরূদ পড়বে তারপর দু'আ করবে। ফুযালা (রা) বলেন: তারপর আর এক লোক সালাত আদায় করল। সে আল্লাহর প্রশংসা করল এবং নবী করীম ﷺ-এর

---

[৯৪] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খণ্ড, হা নং-৯২৫।

ওপর দরূদ পড়ল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন: হে সালাত আদায়কারী! তুমি দু'আ কর। তোমার দু'আ গ্রহণযোগ্য হবে।- তিরমিযী[৯৫]

৭. গুনাহ্ ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দরূদ পড়া সুন্নাত। দরূদ শরীফ গুনাহ্ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ أُبَيٌّ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ» . قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قُلْتُ: النِّصْفَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» : «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ»

উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন: আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করি। আমি কত দরূদ পড়ব? তিনি বললেন: যত তোমার মন চায়। আমি বললাম: চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম। দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম: আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব। তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে।- তিরমিযী[৯৬]

৮. রাসূল ﷺ-এর নাম শুনা, পড়া কিংবা লেখার সময় দরূদ পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»

"আলী (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: সে ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো কিন্তু সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না।-তিরমিযী।[৯৭]

---

[৯৫] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খণ্ড, হা/নং-২৭৬৫।
[৯৬] সহীহ ইবনু তিরমিযী, দ্বিতীয় খণ্ড, হা/নং-১৯৯৯।
[৯৭] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খণ্ড, হা/নং-২৯১১।

৯. মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবী করীম ﷺ-কে সালাম করা সুন্নাত।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ»

ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ ﷺ বলেন: নবী করীম ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: **'বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'** অর্থাৎ, আল্লাহর নামে মসজিদে প্রবেশ করছি, আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দাও। আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন: **'বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা'** অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজা খুলে দাও।-ইবনু মাজাহ।[৯৮]

১০. সালাতের সালাম ফিরানোর পর নবী করীম ﷺ-এর ওপর সালাম পৌছানো সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: নবী করীম ﷺ যখন সালাত থেকে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন: **সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা**

---

[৯৮] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খণ্ড, হা/নং-৬২৫।

ইয়াছিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! লোকেরা যা বলে তা থেকে তুমি পবিত্র এবং মর্যাদাপূর্ণ, সকল নবীর ওপর সালাম ও শান্তি হোক, আর সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।[৯৯]

১১. প্রত্যেক মজলিসে নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা) বলেন: কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ করে না এবং রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়ে না, তাহলে সে মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। অতএব তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিবেন কিংবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন।-তিরমিযী।[১০০]

১২. প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু দ্দারদা (রা) বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে।-ত্বাবারানী।[১০১]

আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

যে কোনো ফরজ সালাতের পর উচ্চঃস্বরে সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

ঈদের সালাত, জুমু'আর সালাতের পর দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই। কোথাও একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চঃস্বরে দরূদ ও সালাম পাঠ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

---

[৯৯] উদ্দাতুল হিসনুল হাসীন, হা/নং-২১৩।
[১০০] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খণ্ড, হা/নং-২৬৯১।
[১০১] সহীহুল জামিউল সাগীর, হা/নং-৬২৩৩।

ফাযায়িলে দরূদ সংক্রান্ত দূর্বল ও জাল হাদীস

১. যে ব্যক্তি আমার ক্ববরের নিকট আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে; আমি তা শুনতে পাই আর যে ব্যক্তি আমার ওপর দূর থেকে দরূদ পাঠ করে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন ফিরিশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বানোয়াট : সিলসিলা যঈফাহ হা/ ২০৩।

২. যে ব্যক্তি জুমু'আহ্‌র দিনে আমার প্রতি আশিবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার আশি বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। কেউ তাঁকে বললো : আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করবো হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : বলো হে আল্লাহ! তুমি দয়া করো তোমার বান্‌দা, তোমার নাবী, তোমার রাসূল উম্মী নাবীর ওপর এবং একবার গিরা দিবে।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/ ২১৫।

৩. যে দু'আর পূর্বে নাবী ﷺ এর প্রতি দরূদ পড়া হয় না তা আকাশ ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে।

দুর্বল : ফাযলুস সালাত 'আলা ন্নাবী ﷺ হা/ ৭৪।

৪. আবূ বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি যখন মারা যাবো তখন আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আমার কাছে তোমাদের আমল পেশ করা হবে। আমি তা ভাল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা কবো আর যদি অন্য কিছু দেখি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো।

সনদ দুর্বল : ফাযলুস সলাত 'আলা ন্নাবী ﷺ হা/ ২৫।

৫. কেউ নবী ﷺ-এর ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তার প্রতি সত্তর বার সলাত পড়েন।

মুনকার মাওকুফ : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩০।

৬. কেউ আমার প্রতি সলাত পাঠ করলে আমিও তার জন্য সলাত পড়ি এবং এটি ছাড়াও তাকে দশটি নেকী দেয়া হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩২।

৭. যে ব্যক্তি আমার প্রতি দৈনিক এক হাজার বার দরূদ পাঠ করবে; জান্নাতে তার বাসস্থানটি না দেখানো পর্যন্ত সে মরবে না।

মুনকার : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩৩।

৮. আবূ কাহেল বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমাকে বললেন : হে আবূ কাহেল! যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রত্যেক দিনে তিনবার দরূদ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক রাতে তিনবার দরূদ পাঠ করবে আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ রেখে; আল্লাহর ওপর হক হয়ে যায় তাকে ঐ রাতে এবং ঐ দিনে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া।

মুনকার : আবূ 'আসিম, ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩৪।

৯. যে ব্যক্তি এ বলে দু'আ করবে : জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মাহুয়া আহলুহু (অর্থ : আল্লাহ পুরস্কার দিন মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের পক্ষ হতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য)- এ দু'আ সত্তর জন ফিরিশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় (অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত এর সওয়াব লিখতে লিখতে ফিরিশতারা হয়রান হয়ে যান)।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩৬।

১০. আনাস হতে মারফুভাবে বর্ণিত। পরস্পরকে ভালবাসে এমন দুই বান্দা যখন একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করে এবং উভয়ে নবী ﷺ- এর প্রতি দরূদ পাঠ করে; তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের আগের এবং পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩৭।

১১. যে ব্যক্তি বলে : "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আনযিলহু মাক্ব'আদাল মুক্বাররাব ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ"-তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/ ১০৩৮।

দৃষ্টি আকর্ষণ : বাজারে প্রচলিত কতিপয় পুস্তকে ভিত্তিহীন ফযীলাত বর্ণনা সহকারে কতিপয় মনগড়া দরূদ উল্লেখ রয়েছে। দরূদগুলো ভিত্তিহীন বিধায় নির্দিষ্টভাবে সেগুলোর পক্ষে কোন হাদীস গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ নেই। যেমন **দরূদে লাকী, দরূদে হাজারী, দরূদে তাজ, দরূদে মাহী, দরূদে খায়ের. দরূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে ফুতুহাত, দরূদে রুইয়াতে নাবী ﷺ ইত্যাদি।** কোন সহীহ হাদীস এমনকি যঈফ হাদীসেও এসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই এসব মনগড়া দরূদ পাঠ করলে ফযীলাত পাওয়া যাবে না। এছাড়া ফযীলাত পেতে হলে মৌলভী, পীর বা পীরের কোন খাস মুরিদকে ডেকে এনে ঘরে ঘরে মিলাদ পড়াও শিরনি বিলাও-প্রচলিত এসব কাজের কোন ভিত্তি নেই। নিছক ব্যবসা ও জন সাধারণকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা হাতানোর জন্য এসবের প্রচলন। নাবী ﷺ-

এর যুগে কিংবা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের যুগে (খাইরুল কুরূনে) বা তার পর চার শতাব্দী পর্যন্ত এভাবে দরূদ ও মিলাদ পড়ার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই এগুলো ফযীলাতের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ। এগুলো স্পষ্ট শিরক ও বিদ'আতের নামান্তর। এমনিভাবে গানের সূরে ছন্দ মিলিয়ে 'ইয়া নাবী সালামু'আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু 'আলাইকা ইয়া হাবীব সাল্লালামু 'আলাইকা ... ইত্যাদি বলারও কোন ভিত্তি নেই। কাজেই এগুলো বর্জনীয়। বরং যেসব দরূদ নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কেবল সেগুলো পাঠ করলেই দরূদ পাঠের ফযীলাত অর্জন করা সম্ভব।

এছাড়া কতিপয় পুস্তকে অমুক দরূদ ও অমুক দু'আ এতো বার (যেমন ২৫, ৮০ ইত্যাদি) পাঠ করলে নাবী ﷺ-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করা যাবে, বহু পরিক্ষীত, ইত্যাদি মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার, স্বপ্নে নাবী ﷺ-কে দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে ঐসব বানোয়াটি 'আমল, মনগড়া তদবীর এবং এ বিষয়ে পীর বুযূর্গের কথিত কিচ্ছা কাহিনীর কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

সুতরাং এসব বর্জন করাই শ্রেয়। যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশিত বইতে এসব মনগড়া 'আমলকে ফযীলাত লাভের 'আমল বলে প্রচার করছেন আশা করি, তারা এগুলো বর্জন করে সহীহ হাদীসে বর্ণিত দরূদগুলোই প্রকাশ করবেন, এটাই ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় মিথ্যা প্রচারের কারণে বড় গুনাহের বোঝা বহন করতে হবে -কাজেই সতর্ক হোন।

আল-কুরআনুল কারীম

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত

পবিত্র কুরআন মাজীদ বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর দেয়া নি'আমতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তুলনাহীন নি'আমত। তাঁর রহমতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় রহমত। এ কারণেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ, অসীম দয়াবান আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থাৎ, এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে। যেহেতু এ কিতাব মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য, জীবনের সাফল্য লাভ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করে, মানুষের সকল গোপন-প্রকাশ্য, ব্যক্তি ও সমষ্টির শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসার চূড়ান্ত ব্যবস্থাপত্র, গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া মানুষের জন্য আলোর মশাল, ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির একমাত্র ব্যবস্থাপত্র সেহেতু এর চেয়ে বড় নি'আমত আর হতে পারেনা। মানুষের জন্যে ন্যায় ও ইনসাফের কোনো মানদণ্ড যদি থেকে থাকে তা একমাত্র আল কুরআন।

এমনিতে তো আমাদের ওপর আল্লাহর অসংখ্য নি'আমত রয়েছে। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে দু হাতে সে নি'আমত লুটে নিচ্ছি। কিন্তু এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি নি'আমত শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপকার দিবে যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি। শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবার সাথে সাথে দুনিয়ার সকল নি'আমতও আমাদের জন্য শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল কুরআনই এমন নি'আমত যার দ্বারা দুনিয়ার এ সকল নি'আমতকে দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত নি'আমতে পরিণত করার সাথে সাথে পরকালীন জীবনে স্থায়ী ও অকল্পনীয় নি'আমতে পরিণত করবে। এ কারণেই কুরআন অবতরণের রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম মোবারক রাত্রি অর্থাৎ 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে। এছাড়া যেখানে যেখানে এ কুরআন নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ঘটনাকে আল্লাহ তাঁর নিজের রহমত, পুনঃ পুনঃ বিতরণ করা রহমত, নিজের সীমাহীন হিকমাত এবং

নিজের অসীম শক্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন। রমযান মাস শেষে যে ঈদ উৎসব পালন করা হচ্ছে তা মূলত কুরআন নাযিলের বর্ষপূর্তির উৎসব। কারণ কুরআন নাযিলের কারণেই রমযান মাসের মর্যাদা, কুরআনের নি'আমতে সিক্ত হওয়ার জন্যই সিয়াম সাধনা। আর কুআনের নি'আমত পেয়ে ধন্য হওয়ার জন্যই ঈদ বা খুশি। আর কুরআনের মাস পেয়েও যারা কুরআনের নি'আমতে সিক্ত হতে পারেনি তাদের চেয়ে হতভাগা আর দূর্ভাগা কেউ কি হতে পারে? তাদের কিসের উৎসব। কুরআনের মত মহান নি'আমত পেয়ে উৎসব পালনের কথা আল্লাহ তা'আলাই ঘোষণা করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ . قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِه فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশবাণী এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর হিদায়াত ও রহমত মুমিনদের জন্য। হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, এ (কুরআন এসেছে) আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ায়। সুতরাং এ কারণেই লোকদের উৎসব করা উচিত। তারা যা জমা করে এটি তার চেয়ে উত্তম।" সূরা ইউনুস ঃ ৫৬-৫৭

আল কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি

আল কুরআন সুন্দর মানুষ, আদর্শ সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। আল কুরআন সাফল্য ও বিজয় লাভের 'মাষ্টার কি'। এটা শুধু কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস যার জ্বলন্ত সাক্ষী। ৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে। ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কাওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী পত্রে স্থান করে দিয়েছে! এ কুরআন মেষ পালের রাখালদের মানবেতিহাসের সেরা মানুষরূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সাম্রাজ্যের শাসক বানিয়েছে। কালো কুচকুচে ক্রীতদাসদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করে অসীম সাহসী সেনাপতি পদে সমাসীন করে দিয়েছে। গোত্র প্রিয় বেদুঈনদের মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনাপতি ও কর্মবীর বানিয়ে দিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজকে বিকশিত করে উঠাতে পারে সাফল্যের উচ্চ শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি

কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চ আসনে। আল কুরআনই সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে কোনো জাতি আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে সাফল্য, গৌরব ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়।

আমাদের দেশে কুরআন পাঠ করা হয় সাধারণত নেকী লাভ এবং রোগ-বালাই ইত্যাদির তদবীরে। এগুলোকেই দেখানো হয় বড় নি'আমত হিসেবে। কিন্তু কুরআন কেবল এসব উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়নি। এসব উদ্দেশ্যে কুরআনকে ব্যবহার করা হলে কুরআন থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। কুরআন থেকে ফায়দা পেতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ংগম করতে হবে এবং সে শিক্ষাকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্বমানবতার ইহকালীন শান্তি সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির জন্য জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর সর্বশেষ অবতীর্ণ ও চূড়ান্ত সংবিধান হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ বিশ্বাস একজন মুমিনের সঠিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যারা করে তাদের অবশ্যই কুরআন বুঝতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে। এভাবেই সফল ও সার্থক হতে পারে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য আর প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ। কুরআন দিতে চায় মহাসমুদ্র অথচ মানুষ তার এক ফোটা নিতেই ব্যাতিব্যস্ত। মানবতার জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে!

আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমার দায়িত্বে। অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি তখন তুমি তার পাঠের অনুসরণ কর।" (সূরা কিয়ামাহ ৭৫:১৭-১৮)

এ আয়াতে কুরআন অর্থ 'পাঠ করা' বলা হয়েছে।

নোট: আলিমগণ কুরআন শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন, তার মধ্যে কিছু মত নিচে পেশ করা হলো:

১. قُرْآنٌ আল্লাহর বাণীর এমন এক নাম যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল এক একটি আল্লাহর দেয়া নাম। (ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ)

২. قُرْاٰنٌ এর মূল শব্দ হলো قَ رْ نٌ যার অর্থ হলো একটি জিনিসকে অপর জিনিসের সাথে মিলানো, কুরআন মাজীদের আয়াত এবং সূরাসমূহ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আছে, তাই তাকে কুরআন বলা হয়।

৩. قُرْاٰنٌ এর মূল শব্দ হলো قَ رَ نَ (কারানা) অর্থাৎ সে একত্রিত করেছে। কুরআনের এ নাম এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনে অতীতের আল্লাহর অবতীর্ণ সকল কিতাবের মূল শিক্ষাকে একত্রিত করা হয়েছে। (আল্লামা জুযায রাহিমাহুল্লাহ)

৪. قُرْاٰنٌ এর মূল শব্দ হলো: قَ رَ ءَ (কারাআ) অর্থাৎ, সে পাঠ করেছে। এ নাম এজন্য দেয়া হয়েছে যে তার বারবার তিলাওয়াত করা হয় (আল্লামা আলাহায়ানী রাহিমাহুল্লাহ)। দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ। এ চতুর্থ মতটি আলিমগণের নিকট অধিক বিশুদ্ধ।[১] কুরআনের আয়াতেও যার ইঙ্গিত রয়েছে।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ

১. اَلْقُرْاٰنُ –(সর্বাধিক পঠিত) আল্লাহর বাণী:

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ.

"পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।" (সূরা রাহমান ৫৫:১-২)

২. اَلْكِتَابُ (গ্রন্থ)-আল্লাহর বাণী:

الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ: "আলিফ-লাম-মীম। এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।" (সূরা বাকারা ২:১-২)

৩. اَلْفُرْقَانُ (পার্থক্যকারী)– আল্লাহর বাণী:

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا.

অর্থ: "পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি পার্থক্যকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।" (সূরা ফুরকান ২৫:১)

৪. اَلذِّكْرُ (উপদেশ)- আল্লাহর বাণী:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী।" (সূরা হিজর ১৫:৯)

৫. اَلتَّنْزِيْلُ –(অবতীর্ণকৃত) আল্লাহর বাণী:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ: "আর নিশ্চয়ই এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত।" (সূরা শুআরা ২৬:১৯২)

৬. اَلْحَقُّ (সত্য) আল্লাহর বাণী:

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّا اَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ.

অর্থ: "তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।" (সূরা সাজদা ৩২:৩)

৭. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (সর্বোত্তম বাণী)–আল্লাহর বাণী:

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ.

অর্থ: "আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী তথা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।" (সূরা যুমার: ২৩)

৮. بُرْهَانٌ (স্পষ্ট প্রমাণ)–আল্লাহর বাণী:

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْراً مُّبِيْناً.

অর্থ: "হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। (সূরা নিসা ৪:১৭৪)

কুরআন মাজীদের সতেরটি গুণবাচক নাম নিম্নরূপ:

১. مَجِيْدٌ (সম্মানিত)-আল্লাহর বাণী:

قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.

অর্থ: "কাফ; সন্মানিত কুরআনের কসম।" (সূরা ক্বাফ ৫০:১)

২. كَرِيْمٌ (সম্মানিত)–আল্লাহর বাণী:

اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই এটি একটি সম্মানিত কুরআন।" (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:৭৭)

৩. عَظِيْمٌ (মহান)–আল্লাহর বাণী:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

অর্থ: "আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন।" (সূরা হিজর ১৫:৮৭)

৪. عَزِيْزٌ (মহা শক্তিধর)–আল্লাহর বাণী

وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ.

অর্থ: "আর এটি নিশ্চয়ই এক মহাশক্তিধর গ্রন্থ।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১:৪১)

৫. نُوْرٌ (আলো)–আল্লাহর বাণী:

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ: "অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি আলো ও স্পষ্ট কিতাব।" (সূরা মায়িদা ৫:১৫)

৬. مَوْعِظَةٌ (উপদেশ)

৭. شِفَاءٌ (আরোগ্য)

৮. هُدًى (হিদায়াত)

৯. رَحْمَةٌ (রহমত)

আল্লাহর বাণী

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: "হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭)

১০. مُبَارَكٌ (বরকতময়)–আল্লাহর বাণী

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ: "আর এভাবেই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি, একটি বরকতপূর্ণ কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো হয়তো তোমার প্রতি রহম করা হবে।" (সূরা আনআম ৬:১৫৫)

১১. مُبِيْنٌ (স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী)-আল্লাহর বাণী:

الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ: "আলিফ-লাম-রা; এ হল কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ।" (সূরা হিজর ১৫:১)

১২. حَكِيْمٌ (জ্ঞানগর্ব)

১৩. عَلِيٌّ (মহান)–আল্লাহর বাণী:

اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَاِنَّهٗ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি তো একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর নিশ্চয়ই তা আমার কাছে উম্মুল কিতাবে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপূর্ণ।" (সূরা যুখরু ফ ৪৩:৩-৪)

১৪. بَشِيْرٌ (সুসংবাদদাতা)

১৫. نَذِيْرٌ (ভয় প্রদর্শনকারী)–আল্লাহর বাণী:

كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ قُرْاٰناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْراً وَنَذِيْراً فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَيَسْمَعُوْنَ.

অর্থ: "এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শুনবে না।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১:৩-৪)

১৬. مُصَدِّقٌ (সত্যায়নকারী)

১৭. مُهَيْمِنٌ (সংরক্ষণকারী)-আল্লাহর বাণী:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ.

অর্থ: "আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর ওপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফায়সালা কর।" (সূরা মায়িদা ৫:৪৮)

কুরআন মাজীদের প্রতিক্রিয়া

১. যদি কুরআন মাজীদকে পাহাড়ের মতো বিশাল সৃষ্টির ওপর অবতীর্ণ করা হতো তাহলে তা ভয়ে টুকরা টুকরো হয়ে যেত।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَه خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

অর্থ: "এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ।" (সূরা হাশর ৫৯:২১)

২. কুরআনের আয়াত শুনে কিছু কিছু কল্যাণকামী অমুসলিমদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে যায়।

وَاِذَا سَمِعُواْ مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

"আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন।" (সূরা মায়িদা ৫:৮৩)

৩. কুরআনের আয়াত শুনে ঈমানদারদের অন্তর কেঁপে ওঠে।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

অর্থ: "আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা হাজ্জ ২২:৩৪-৩৫)

৪. কুরআন মাজীদ মনোযোগসহ তিলাওয়াত করলে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। কুরআন মাজীদ বুঝে তিলাওয়াত করলে অন্তর নরম হয়।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

অর্থ: "আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো হিদায়াতকারী নেই।" (সূরা যুমার ৩৯:২৩)

৫. কুরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ: "মু'মিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা

তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" (সূরা আনফাল ৮:২)

৬. জ্ঞানীগণ কুরআন তিলাওয়াত শুনে সিজদায় পড়ে যায়।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58)

অর্থ: "তাদের প্রতি যখন রহমানের আয়াত তিলাওয়াত করা হতো তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়তো।" (সূরা মরিয়ম ১৯ : ৫৮) (সাজদা)

৭. কুরআন মাজীদ তাঁর শ্রবণকারীদের মাঝে বিনয় বৃদ্ধি করে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا.

অর্থ: "বল, তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয়ই এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৭-১০৯)

৮. কুরআন মাজীদের কিছু কিছু সূরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ. وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ. وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর (রা) বললেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা এবং সূরা তাকভীর বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।" (তিরমিযী: ৩২৯৭)

৯. সূরা নাজম তিলাওয়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদা করলেন তখন মুসলিমদের সাথে উপস্থিত অমুসলিমরাও নিজেদের অজান্তেই সিজদা করল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন, তাঁর সাথে সাথে মুসলিমগণ, মুশরিকরা, জ্বীন ও ইনসান সকলেই সিজদা করল।" (বুখারী, ৪৮৬২)

১০. কুরাইশ নেতা উতবা বিন রাবিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মত বিনিময় করার জন্য আসল, কিন্তু সূরা ফুস্‌সিলাতের তিলাওয়াত শুনে সে এতো প্রতিক্রিয়াশীল হলো যে, কোনো কিছু বলা এবং শুনা ব্যতীতই সে চলে গেল এবং কুরাইশ সরদারগণকে বললো : আল্লাহর কসম! কুরআন কোনো কবির কবিতাও নয় এবং না কোনো জ্যোতিবিদ্যা।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِي قَالَ: حُدِّثْتُ اَنْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَكَانَ سَيِّدًا قَالَ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَلَا اَقُوْمُ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَاُكَلِّمَهُ وَاَعْرِضَ عَلَيْهِ اُمُورًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا، فَنُعْطِيَهُ أَيَّها شَاءَ وَيَكُفَّ عَنَّا؟ وَذَلِكَ حِينَ اَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَرَاَوْا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُوْنَ وَيَكْثُرُوْنَ، فَقَالُوْا: بَلَى يَا اَبَا الْوَلِيْدِ، فَقُمْ اِلَيْهِ فَكَلِّمْهُ (1). فَقَامَ اِلَيْهِ عُتْبَةُ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا اِبْنَ اَخِي، اِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ مِنَ السِّطَةِ فِي الْعَشِيْرَةِ. وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ، وَاِنَّكَ قَدْ اَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَّهْتَ بِهِ اَحْلَامَهُمْ، وَعِبْتَ بِهِ اٰلِهَتَهُمْ وَدِيْنَهُمْ، وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ اٰبَائِهِمْ. فَاسْمَعْ مِنِّي اَعْرِضْ عَلَيْكَ اُمُوْرًا تَنْظُرُ فِيْهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنَّا بَعْضَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ،

اَسْمَعُ". قَالَ: يَا اِبْنَ اَخِي، اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ (2) هٰذَا الْاَمْرِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ اَمْوَالِنَا حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْ اَكْثَرِنَا اَمْوَالًا (3). وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتّٰى لَا نَقْطَعَ اَمْرًا دُوْنَكَ. وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا. وَاِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِيْ يَأْتِيْكَ رَئِيًّا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِيْعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ، وَبَذَلْنَا فِيْهِ اَمْوَالَنَا حَتّٰى نُبَرِّئَكَ مِنْهُ، فَاِنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ التَّابِعُ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُدَاوَى مِنْهُ اَوْ كَمَا قَالَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ عُتْبَةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ قَالَ: "اَفَرَغْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاسْتَمِعْ مِنِّي" قَالَ: اَفْعَلُ. قَالَ: {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. حٰمٓ. تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ. بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ} ثُمَّ مَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ. فَلَمَّا سَمِعَ عُتْبَةُ اَنْصَتَ لَهَا وَاَلْقَى يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ اِنْتَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّجْدَةِ مِنْهَا، فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ: "قَدْ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ، فَاَنْتَ وَذَاكَ (4) فَقَامَ عُتْبَةُ اِلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اُقْسِمُ يَحْلِفُ (5) بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ اَبُو الْوَلِيْدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِهِ. فَلَمَّا جَلَسَ اِلَيْهِمْ قَالُوْا: مَا وَرَاءَكَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ؟ قَالَ: وَرَائِيْ اَنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَاللّٰهِ مَا هُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكِهَانَةِ. يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اَطِيْعُوْنِي وَاجْعَلُوْهَا لِيْ، خَلُّوْا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيْهِ

فَاعْتَزِلُوهُ، فَوَاللهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأٌ، فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ، وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ. قَالُوا: سَحَرَكَ وَاللهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ! قَالَ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ

অর্থ: "মুহাম্মাদ বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উতবা বিন রাবীয়া তার কাওমের একজন ধৈর্যশীল সরদার ছিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে হারামে একাকী ছিলেন, উতবা কুরাইশদের বৈঠকে উপস্থিত ছিল, সে বলতে লাগল জনাব! আমি কেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট গিয়ে কিছু কথা বলব না এবং কিছু আরজ রাখব না? হতে পারে সে কোনো একটি কথা গ্রহণ করবে, আর যা সে গ্রহণ করবে তা পুঁজি করে আমরা তাকে আমাদের এখানে দাওয়াতী কাজ থেকে বাঁধা দিব, এটা ঐ সময়ের কথা যখন হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর মুশরিকরা অনুমান করতে পেরেছিল যে, তাঁর সাথীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে, বৈঠকে উপস্থিত লোকেরা বললো: আবু ওলীদ কেন নয়? অবশ্যই তার নিকট গিয়ে কথা বল। তাই উতবা উঠে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে বসল এবং বলতে লাগল, হে আমার ভাতিজা! আমাদের মাঝে তোমার যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে এবং তোমার যে বংশ মর্যাদা তা তোমার জানা, এখন তুমি তোমার জাতির সামনে একটি কঠিন বিষয় নিয়ে এসেছ, যা তোমার জাতির ঐক্যবদ্ধতাকে বিনষ্ট করে দিয়েছ। জাতি মুরুব্বীদেরকে তুমি বোকা বানিয়ে দিয়েছ। তাদের ধর্ম এবং মূর্তিকে দোষারোপ করছ, তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরকে কাফির বানাচ্ছ, আমার কথা শুন, আমি তোমার নিকট কিছু আরজ রাখছি এ বিষয়ে তুমি চিন্তা -ভাবনা কর, হতে পারে এর মধ্য থেকে কোনো বিষয় তোমার পছন্দ হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আবুল ওলীদ আরজ পেশ কর, আমি শুনছি। উতবা বললো: ভাতিজা এ দাওয়াত যা তুমি নিয়ে এসেছ। যদি এ থেকে তোমার উদ্দেশ্য হলো, তুমি সম্পদ চাও তাহলে আমরা তোমার জন্য ঐ পরিমাণ সম্পদ জমা করব যার মাধ্যমে তুমি সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হবে। আর যদি তুমি এর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানিয়ে নিচ্ছি, তুমি ব্যতীত আমরা আর কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। আর যদি তুমি বাদশাহি চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশা বানিয়ে নিচ্ছি, আর এ ভূত বা তোমার নিকট আসা যা তুমি দেখ, যদি তুমি নিজে তা দূর করতে না পার তাহলে আমরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব

এবং এজন্য এতো টাকা খরচ করব যে, যেন তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মনে রেখ কখনো কখনো মানুষের ওপর জিন-ভূত চেপে বসে এবং তার চিকিৎসা করতে হয়। উতবা আরো কিছু বললো, এরপর যখন তার কথা শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আচ্ছা এখন একটু আমার কথা শুনুন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম-সাজদা) তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন।

حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: "হা–মীম। (এ গ্রন্থ) পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১:১-৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন তখন উতবা চুপচাপ স্বীয় হস্তদ্বয় কোমরের পেছনে রেখে শুনছিল, যখন তিনি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তিনি সিজদা করলেন এবং বললেন: আবুল ওলীদ তুমি কি আমার কথা শুনেছ? উতবা বললো: হ্যাঁ শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এখন তুমি তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। উতবা উঠে তাদের বৈঠকের লোকদের নিকট আসল, মুশরিকরা উতবাকে দেখে নিজেরা নিজেরা বলছিল, আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, আবু ওলীদ আমাদের নিকট ঐ চেহারা নিয়ে আসছে না যে চেহারা নিয়ে সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। যখন উতবা এসে বসে গেল তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু ওলীদ ওখানে কী হলো বল? উতবা বললো: ওদিকের খবর হল এ যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন বাণী শুনেছি যা ইতঃপূর্বে আর কখনো এমন বাণী শুনিনি, আল্লাহর কসম এটা কোন কবিতাও নয় আবার না কোনো জ্যোতির্বিদ্যা, যদি তোমরা আমাকে মানো তাহলে আমি বলব যে, তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও এবং তাকে কিছু বলবে না, আল্লাহর কসম! এ বাণীর কারণে কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ হবে, যদি আরবরা তাকে হত্যা করে তাহলে তোমাদের বদনামী ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তার বিজয় তোমাদের বিজয়, তার সম্মান তোমাদের সম্মান, সে তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে। মুশরিকরা বললো: আবু ওলীদ আল্লাহর কসম তুমিও তার যাদুতে যাদুগ্রস্ত হয়ে গেছ, উতবা বললো : এটা আমার

অভিমত এখন তোমরা যা চাও তা কর।" (এ ঘটনাটি ইবনে কাসীর বেদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

১১. কুরআন মাজীদের মিষ্টতা এবং সৌন্দর্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي اَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ. فَاَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِاَيْدِيْهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَاَرَى سَبَبًا وَاصِلًا، مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ. فَاَرَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ. ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا. ثُمَّ اَخَذَ بِهٖ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلَا. ثُمَّ اَخَذَ بِهٖ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ بِهٖ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِاَبِي اَنْتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَلَاَعْبُرَنَّهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُعْبُرْهَا» قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلَامِ، وَاَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْاٰنُ حَلَاوَتُهُ وَلِيْنُهُ، وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ.

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, বাদল থেকে ঘি এবং মধু ঝরছে, আর লোকেরা তা তাদের হাতে তুলে নিচ্ছে, কেউ কম নিচ্ছে কেউ বেশি, আবু বকর (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আল্লাহর কসম! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিন, তিনি বললেন: আচ্ছা ব্যাখ্যা কর, আবু বকর (রা) বললো: বাদল হল ইসলাম, আর বাদল থেকে ঝরো ঘি এবং মধুর ব্যাখ্যা হলো কুরআন মাজীদের স্বাদ এবং সৌন্দর্য, আর কম এবং বেশি নেয়ার অর্থ হলো কুরআন মাজীদ থেকে কম এবং বেশি করে উপকৃত হওয়া।" (মুসলিম: ৬০৬৬)

মাসআলা-১২.আবু বকর (রা) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করলে মক্কার মুশরিকদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা তা শ্রবণ করার জন্য ভিড় করত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ. حَتّٰى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ. فَقَالَ: اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: اَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ اَنْ اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّيْ. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَاَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ. فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي اَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ. اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوْا: لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَاِنَّا نَخْشَى اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِاَبِي بَكْرٍ. فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ. فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَاَ الْقُرْاٰنَ، وَاَفْزَعَ ذَلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ،

فَأَرْسَلُوْا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ. فَقَالُوْا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِأَبِيْ بَكْرٍ الْإِسْتِعْلاَنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ: "আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরিকদের পক্ষথেকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন আবু বকর (রা) হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলেন, যখন বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌছলো তখন কাররা বংশের সরদার ইবনু দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন সে জিজ্ঞেস করল আবু বকর তুমি কোথায় যাবে? আবু বকর (রা) বললো: আমার জাতি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছি, যেন আমি আমার রবের ইবাদাত করতে পারি। ইবনু দাগিনা বললো: আবু বকর তোমার মতো লোককে না বের করা যায় আর না সে নিজে বের হয়ে যায়। তুমি অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে থাক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অপরের দুঃখ নিজের ওপর চাপিয়ে নাও, মেহমানের সম্মান কর, ঝগড়া-ঝাটিতে সত্যের সাহায্য কর। তাই আমি তোমাকে আমার নিরাপত্তায় নিয়ে নিলাম। ফিরে চলো আর নিজের শহরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদাত কর, আবু বকর (রা) ইবনে দাগীনার কথায় মক্কায় ফিরে আসলো। সন্ধ্যার সময় ইবনে দাগিনা আবু বকরকে সাথে নিয়ে কুরাইশ সরদারদের নিকট গেল এবং বললো: আবু বকরের মতো লোককে কখনো তাড়ানো যায় না এবং না সে নিজে ইচ্ছা করে বের হতে পারে।

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে বের করে দিতে চাও, যে অসহায়কে আশ্রয় দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে, মতবিরোধের সময় সত্যের পক্ষে থাকে? কুরাইশরা ইবনে দাগিনার দেয়া নিরাপত্তাকে তো ফিরিয়ে দিলই না বরং বললো: আবু বকরকে ভালোভাবে জানিয়ে দাও যে, সে যেন তার ঘরে থেকে যতটা পারে ততটা স্বীয় রবের ইবাদাত করে, নামায আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে, আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে যেন এ সমস্ত কাজ না করে। সে এ সমস্ত কাজ প্রকাশ্যে করলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাদের স্ত্রী-রা ফিতনায় পড়ে যাবে।

ইবনে দাগীনা এ সমস্ত বিষয়সমূহ আবু বকর (রা)-কে জানিয়ে দিল, আবু বকর (রা) এ শর্তে মক্কায় থেকে গেলেন যে, তিনি তার ঘরের মধ্যে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদাত করবেন, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন না, স্বীয় ঘরের বাহিরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন না, এরপর হঠাৎ আবু বকর (রা) তাঁর ঘরের আঙ্গীনায় একটি মসজিদ বানালেন সেখানে তিনি নামায পড়লে এবং কুরআন তিলাওয়াত করলে মুশরিকদের স্ত্রী-রা একত্রিত হয়ে যেত, আবু বকর (রা)-এর তিলাওয়াত শুনে পেরেশান হয়ে যেত এবং বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর (রা) আল্লাহর ভয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেন, যখন তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি তার নয়নাশ্রুর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না, অবস্থা দেখে কুরাইশরা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসল তখন কুরাইশ সরদাররা তার নিকট অভিযোগ করল যে, আমরা আবু বকরের জন্য তোমার দেয়া নিরাপত্তা শুধু এজন্য মেনে নিয়েছিলাম যে, সে তার ঘরে বসেই স্বীয় রবের ইবাদাত করবে, কিন্তু আবু বকর (রা) এ শর্ত ভঙ্গ করেছে, তার ঘরের আঙ্গীনায় মসজিদ বানিয়েছে এবং ওখানে প্রকাশ্যে নামায আদায় করছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী-রা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই তুমি আবু বকরকে নিষেধ কর, যদি সে চায় তাহলে স্বীয় ঘরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদাত করুক, আর যদি সে তা না মানে এবং প্রকাশ্যে ইবাদাত করতে অনড় হয়, তাহলে তাকে দেয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে চাই না।

কিন্তু আবু বকরের প্রকাশ্য ইবাদাত কোনোভাবেই আমাদের নিকট সহনীয় নয়। তাই ইবনে দাগীনা আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে বললো: আবু বকর আমি তোমার ব্যাপারে কুরাইশ সরদারদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তুমি জান, তাই হয় তুমি সে শর্তের ওপর অটল থাক, অন্যথায় আমার দেয়া নিরাপত্তা

আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি চাই না যে আরবদের নিকট থেকে একথা শুনি যে, আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে তা ভঙ্গ করেছে। আবু বকর (রা) উত্তরে বললো: আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। (বুখারী: ৩৯০৫)

কুরআন মাজীদের ফযীলাত

১. কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের রাত (লাইলাতুল কদরের) ইবাদাতের সাওয়াব হাজার মাস (৮৩ বছরের) ইবাদাতের সওয়াবের চেয়ে অধিক।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থ: "নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে।' তোমাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা ক্বদর ৯৭:১-৩)

২. কুরআন মাজীদ নিজে শিখা, অপরকে শিখানো, তা প্রচার করা, তদানুযায়ী আমল করা বড় জিহাদ।

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا.

অর্থ: "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরু দ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।" (সূরা ফুরকান ২৫:৫২)

৩. আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমত কুরআন মাজীদ।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ.

অর্থ: "আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের ওপর আল্লাহর নি'আমত এবং তোমাদের ওপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। (সূরা বাকারা ২:২৩১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

অর্থ: "হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। হে নবী! বল, 'এ (কুরআন এসেছে)আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়'। যা তারা জমা করে এটি তার চেয়ে উত্তম।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭-৫৮)

৪. কুরআন মাজীদের আয়াত এবং শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা কিয়ামাত পর্যন্ত সম্ভব হবে না।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰافِظُوْنَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী।" (সূরা হিজর ১৫:৯)

৫. কুরআন মাজীদে বর্ণিত আক্বীদা (বিশ্বাস) ঘটনাবলি এবং তার সত্যতাকে কেউ কিয়ামাত পর্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারবে না। কুরআন মাজীদের শিক্ষার বিস্তারকে পৃথিবীর কোনো শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না।

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

অর্থ: "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৪২)

৬. কুরআন মাজীদের সাবয়ে' তিওয়াল সূরাসমূহ তাওরাতের সমান। কুরআন মাজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ যাবুরের সমান। কুরআন মাজীদের সূরা ফাতিহা ইঞ্জিলের সমান। কুরআন মাজীদের মুফাসসাল সূরাসমূহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছেন।

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَمَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَمَكَانَ الْاِنْجِيْلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ.

অর্থ: "ওয়াসিলা বিন আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন, তাওরাতের স্থলে আমাকে সাবয়ে' তিওয়াল সূরাসমূহ দেয়া হয়েছে, যাবুরের স্থলে আমাকে শত আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ দেয়া হয়েছে, ইঞ্জিলের স্থলে আমাকে সূরা ফাতিহা দেয়া হয়েছে, আর মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ অতিরিক্ত দেয়া

হয়েছে। আর আমাকে এর মাধ্যমে মর্যাদাবান করা হয়েছে।" (তাহাভী, ত্বাবারানী)

নোটঃ সাবয়ে তিওয়াল বলা হয় নিম্নোক্ত ৭টি সূরাকে।

১. সূরা বাক্বারা।
২. সূরা আলে-ইমরান;
৩. সূরা নিসা;
৪. সূরা মায়িদা;
৫. সূরা আনআম;
৬. সূরা আ'রাফ;
৭. সূরা আনফাল।

২. মিয়িন (শত আয়াত বিশিষ্ট) বলা হয় ঐ সমস্ত সূরাসমূহকে যার আয়াত সংখ্যা ১০০-২০০ পর্যন্ত, এর মধ্যে রয়েছে সূরা ইউনুস থেকে সূরা শু'আরা পর্যন্ত।

৩. মাসানী বলা হয় ঐ সমস্ত সূরাকে যার আয়াত সংখ্যা ১০০ থেকে কম, তার মধ্যে রয়েছে সূরা নামল থেকে সূরা হুজুরাত পর্যন্ত।

৪. মুফাসসাল সূরা বলা হয় সূরা ক্বাফ থেকে নিয়ে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে।

মুফাস্সাল সূরাসমূহ আয়াতের দিক থেকে যতই ছোট হোক না কেন বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা পরিপূর্ণ। তাই এ সমস্ত সূরাসমূহকে মুফাসসাল বলা হয়। ৫. মুফাস্সাল সূরা সমূহকে আবার নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. তিওয়াল মুফাস্সালঃ সূরা ক্বাফ থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত।

খ. আওসাত মুফাস্সালঃ সূরা ত্বারিক থেকে সূরা বায়্যিনা পর্যন্ত।

গ. কেসার মুফাসসালঃ সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

৭.কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।

عَنْ اَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ.

অর্থঃ "আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেননা কিয়ামতের দিন তা তার তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।" (মুসলিমঃ ১৯১০)

৮. কিয়ামাতের দিন কুরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাঁর অনুসারীদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ اِمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ.

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: কিয়ামাতের দিন কুরআন মাজীদ সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তাঁর তিলাওয়াতকারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে এবং তাঁর কথা মানা হবে, আর যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে নিজের আদর্শ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে তাকে কুরআন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, আর যে তা পিছনে ফেলে রাখবে অর্থাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল: ২৩০৬)

৯. কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ সে সকল লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করে।

عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ.

অর্থ: "আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলিল হবে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াবে।" (মুসলিম: ৫৫৬)

১০. কুরআন মাজীদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: «مَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে; কেননা তাতে রয়েছে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান।" (কানযুল উম্মাল: ৮৬৬৬)

১১. কুরআন মাজীদ মুশরিকদের জন্যও রহমত এবং মাগফিরাতের পয়গাম বহন করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ نَاسًا، مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوا، وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا، فَاَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ، لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ: {وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ، وَلاَ يَزْنُوْنَ} [اَلْفُرْقَانُ: 68] وَنَزَلَتْ {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ، لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ}.

অর্থ: ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক অধিক পরিমাণে মানুষ হত্যা করেছে, ব্যভিচার করেছে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো: আপনি যা বলছেন এবং যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাতো অনেক ভালো, আপনি আমাদেরকে বলুন যে, আমরা যে পাপ করেছি ইসলাম গ্রহণ করলে কি তা ক্ষমা হবে? তাদের উত্তরে সূরা ফুরকানের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো: আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফ্সকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামাতের দিন তার আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ফুরকান ২৫:৬৮-৭০)

'বলুন, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (সূরা যুমার: ৫৩)।" (বুখারী: ৪৮১০)

১২. কুরআন মাজীদের অনুসরণকারী সর্বদা সঠিক পথে থাকবে।

اَلَا وَاِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ: اَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সাবধান আমি তোমাদের মাঝে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি, তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহর রশিস্বরূপ, যে তা অনুসরণ করবে সে হিদায়াতের ওপর থাকবে, আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।" (সহীহ মুসলিমঃ সাহাবীদের রা. মর্যাদা অধ্যায়)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা অনুযায়ী আমল কর তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নত (হাদীস)।"(হাকিমঃ ২৯৩৭)

১৩. কুরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা পৃথিবীতে বিজয়ী এবং সম্মানের সাথে থাকবেঃ

عَنْ عُمَرُ قَالَ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

অর্থ: "উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাবধান অবশ্যই তোমাদের নবী বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কোনো কোনো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আবার কোনো কোনো মানুষকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেন।" (মুসলিমঃ১৯৩৪)

১৪. কুরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারীরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

عَنْ جُبَيْرٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوْا قَالَ : «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفَهُ بِيَدِي اللهِ. وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا. وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا.

অর্থ: "জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর, এ কুরআনের এক দিক আল্লাহর হাতে আর অপর দিক তোমাদের হাতে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাক, আর তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে তোমরা কখনো ধ্বংস হবে না এবং পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুজামুল কাবীরঃ ৪৯১)

১৫. কুরআন মাজীদ স্থায়ী মু'জিযা।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللهُ اِلَيَّ، فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন, নবীগণকে এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছে যা দেখে ঐ যুগের লোকেরা ঈমান এনেছে, কিন্তু আমাকে যে মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হল কুরআন মাজীদ, যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে দেয়া হয়েছে, (যা থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত লোকেরা উপকৃত হতে থাকবে) আমি আশা করছি কিয়ামতের দিন আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে।" (বুখারী: ৪৯৮১)

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ফযীলাত

১. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী আল্লাহর সাথে এমন ব্যবসা করে যার মাধ্যমে সে নিম্নোক্ত পাঁচটি কল্যাণ লাভ করে।

১. ঐ ব্যবসায় তার কোনো ক্ষতি হবে না।

২. অঙ্গিকার অনুযায়ী তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান ও সাওয়াব দেয়া হবে।

৩. আল্লাহ স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহে তার প্রতিদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেছেন।

৪. তার পাপও ক্ষমা করা হয়।

৫. তার অন্যান্য সৎ আমলসমূহকে মূল্যায়ন করা হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ.

অর্থ: "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাওয়াব

পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।" (সূরা ফাতির ৩৫:২৯-৩০)

২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে শান্তি হাসিল হয় :

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ: "জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" (সূরা রাদঃ ২৮)

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ وَتَدْنُوْ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

অর্থ: বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিল, আর তার পার্শ্বে একটি ঘোড়া দু'টি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, তিলাওয়াত করার সময় একটি বাদলের মত ছায়া এসে ঘোড়াটিকে ঢেকে দিল, আর ঐ বাদল ধীরে ধীরে ঘোড়ার নিকটবর্তী হচ্ছিল, ঘোড়া তা দেখে লাফালাফি করতে লাগল, যখন সকাল হল তখন ঐ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হল এবং তাঁকে ঐ ঘটনা খুলে বললো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এ হল শান্তি যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতরণ করছিল।" (মুসলিমঃ ৭৯৫)

৩. কুরআন তিলাওয়াত অন্তরের আনন্দ এবং চোখের জ্যোতি, দুঃখ, বেদনা, চিন্তা এমনকি রোগ এবং পেরেশানী দূর করে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ: **اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي، وَنُوْرَ**

صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ غَمِّي. إِلَّا اَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ". قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟. قَالَ: «اَجَلْ. يَنْبَغِيْ لِمَنْ سَمِعَهُنَّ اَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ.

অর্থ: "ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখনই কোনো ব্যক্তির কোনো দুঃখ- চিন্তা হবে তখন সে এ দু'আ পাঠ করবে, হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার কোনো বান্দার ছেলে এবং তোমার কোনো বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সে সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তার মাধ্যমে তোমার নিকট এ আকুল নিবেদন জানাই যে, তুমি কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি বানিয়ে দাও, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা -ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ- উৎকণ্ঠার বিদূরিতকারী বানিয়ে দাও।

যখন কোনো ব্যক্তি এ দু'আ পাঠ করবে তখন আল্লাহ তার চিন্তা এবং বেদনা দূর করে দিবেন, তার চিন্তা কে আনন্দে পরিণত করে দেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি দু'আটি মুখস্থ করব? তিনি বললেন: কেন নয়, প্রত্যেকটি শ্রবণকারীর উচিত এ দু'আ মুখস্থ করা। (আহমদ : ৪৩১৮)

৪. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী একটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে সাওয়াব পাবে।

عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوسَى. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ. يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ. وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর তিলাওয়াত করল

তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকীর বদলা হবে দশগুণ, আমি একথা বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর।" (তিরমিযী: ২৯১০)

৫. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমলকারী সর্বোত্তম মু'মিন।

عَنْ اَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ. طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيْحَ لَهَا.

অর্থ: "আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হলো লেবুর মতো তার স্বাদও মিষ্টি আবার ঘ্রাণও ভালো, আর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না কারী মু'মিনের উদাহরণ হল খেজুরের ন্যায়, তার স্বাদতো ভালো কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই, আর কুরআন তিলাওয়াতকারী পাপী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ফুলের মতো আর ঘ্রাণ ভালো কিন্তু স্বাদ তিক্ত, আর কুরআন তিলাওয়াত না কারী ফাজেরের উদাহরণ হলো মাকাল ফলের মতো যার স্বাদ তিক্ত।" (বুখারী: ৭৫৬০)

৬. কুরআন মাজীদ অনুযায়ী আমলকারী মু'মিন ঈর্ষাযোগ্য :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " لاَ حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ-

১. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে।

২. এভাবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে দিন-রাত ব্যয় করতে থাকে। (বুখারী: ৫০২৫)

৭. অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি ঈর্ষাকারী মু'মিন ঈর্ষাযোগ্য। কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি হিংসা করাও সওয়াব পাওয়ার যোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ [ص:192] آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ-

১. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত তিলাওয়াত করে আর তার প্রতিবেশি তা শুনে বলে হায়! আমাকেও যদি এভাবে কুরআন মাজীদ শিখানো হতো যেমন তাকে শিখানো হয়েছে, তাহলে আমিও এভাবেই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতাম।

২. এভাবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে, আর তার প্রতিবেশী তা দেখে বলে হায়! আমাকেও যদি তার মতো সম্পদ দেয়া হতো যেমন তাকে দেয়া হয়েছে তাহলে আমিও তার মতো আল্লাহর পথে তা ব্যয় করতাম যেমন সে করছে।" (বুখারী : ৫০২৬)

৮. ভালোভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে।

আটকিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।

عَنْ عائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ اَجْرَانِ.

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিরা সম্মানিত ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে। আর যারা আটকিয়ে কষ্ট করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।" (মুসলিম ১৮৯৮)

নোট:

১. কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী বলতে কুরআনের হাফিযদেরকে বুঝানো হয়েছে (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।
২. উল্লেখিত হাদীসে আটকিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তির চেয়ে বেশি বলে প্রমাণ করে না বরং দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে বলতে বুঝানো হয়েছে সাধারণ মানুষের সওয়াবের দ্বিগুণ।

৯. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরাধিকারী যা তিনি মুসলিমদের জন্য রেখে গেছেন:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «يَا اَهْلَ السُّوْقِ، مَا اَعْجَزَكُمْ» قَالُوْا: وَمَا ذَاكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسَمُ، وَاَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُوْنَ فَتَاْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ» قَالُوْا: وَاَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِيْ الْمَسْجِدِ» فَخَرَجُوْا سِرَاعًا اِلَى الْمَسْجِدِ، وَوَقَفَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتّٰى رَجَعُوْا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوْا: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يُقْسَمُ. فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: «اَمَا رَاَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ اَحَدًا؟» قَالُوْا: بَلٰى، رَاَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ، وَقَوْمًا

يَتَذَاكَرُوْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ. فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: «وَيْحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদ্বীনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন: হে বাজারের লোকেরা কোন্ জিনিস তোমাদেরকে থামিয়ে রেখেছে? লোকেরা বললো: হে আবু হুরাইরা এটা কেমন কথা? আবু হুরাইরা বললো: ওখানে নবী ﷺ এর মিরাস (সম্পত্তি) বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বণ্টন হচ্ছে? আবু হুরাইরা (রা) বললো: মসজিদে। লোকেরা দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে গেল, আবু হুরাইরা (রা) ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবু হুরাইরা (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো কী হলো তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বললো: আমরা মসজিদে গেলাম কিন্তু ওখানে কোনোকিছু বণ্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম, আবু হুরাইরা (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখ না? লোকেরা বললো: কেন নয় আমরা ওখানে কিছু সংখ্যক লোককে নামায আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছে, আবার কিছুলোক হালাল-হারামের মাসআলা-মাসায়িল বর্ণনা করছে, আবু হুরাইরা (রা) বললো: তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিরাস (সম্পত্তি)। (মু'জামুল আওসাত: ১৪৩০)

১০. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারীদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহ নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন:

১. তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল হবে।

২. আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

৩. ফেরেশতাগণ তাদের চতুষ্পার্শ্বে তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়।

৪. আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের স্মরণ গৌরবের সাথে করেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ

عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কিছুলোক আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তাদের কথা ওদের নিকট স্মরণ করেন যারা তাঁর নিকট আছে, স্মরণ রাখ যার আমল তাকে পিছনে রেখেছে তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।" (মুসলিম: ৭০২৮)

১১. কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির জন্য তা আকাশে শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালোভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ.

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তা সবকিছুর মূল, আর তুমি জিহাদ করবে; কেননা তা ইসলামের বৈরাগ্যতা এবং তুমি আল্লাহর যিকির করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, কেননা তা তোমার জন্যে পরকালীন শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালোভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ।" (আহমাদ: ৫৫৫)

১২. কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ .

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ভালোবাসা স্থান করতে চায়

সে যেন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে।" (আবু নুআইম হুলইয়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-১৮৭২)

১৩. কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের তিলাওয়াত পৃথিবীর বড় বড় নি'আমতসমূহ থেকে মূল্যবান।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَاُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ. خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ পছন্দ করে যে, যখন সে ঘরে ফিরে যাবে তখন তিনটি মোটা মোটা সুস্বাস্থ্যবান উট পাবে? আমরা বললাম: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি বললেন: কুরআন মাজীদের তিনটি আয়াত নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত করা ঐ তিন উট থেকেও উত্তম।" (মুসলিম: ১৯০৮)

১৪. তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন মাজীদের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করার সাওয়াব পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَرَاَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَاَ خَمْسِيْنَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِيْنَ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَرَاَ ثَلَاثَمِائَةِ آيَةٍ يَقُوْلُ الْجَبَّارُ: قَدْ نَصَبَ عَبْدِيْ فِيَّ، وَمَنْ قَرَاَ اَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَاَكْثَرُ، مَا شَاءَ مِنَ الْاَجْرِ، فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ رَبُّكَ لِلْعَبْدِ: اقْرَاْ وَارْقَ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلٰى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ، يَقُوْلُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبِّ اَنْتَ اَعْلَمُ، قَالَ: يَقُوْلُ: بِهٰذِهِ الْخُلْدُ، وَبِهٰذِهِ النَّعِيْمُ

অর্থ: "ফুযালা বিন উবাইদ এবং তামিমুদ্দারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাযে দশটি আয়াত তিলাওয়াদত করে তার জন্য এক কিন্তার সাওয়াব, আর এক কিন্তার পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, কিয়ামাতের দিন তোমার রব বলবে: কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতের বদলে এক স্তর ওপরে উঠ, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করা পর্যন্ত ওপরে উঠ, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করা পর্যন্ত ওপরে উঠতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে বলবেন: আমার নিয়ামাত গ্রহণ করার জন্য তোমার হাত উন্মুক্ত কর, বান্দা হাত উন্মুক্ত করে বলবে: হে আমার রব তুমি তোমার দান সম্পর্কে ভালোভাবে জান, আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এক হাতে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ গ্রহণ কর আর অপর হাতে অন্যান্য নিয়ামতসমূহ গ্রহণ কর।" (মুজামুল কাবীর: ১২৫৩)

১৫. রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করার সমান সওয়াব পাবে।

عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ".

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে সে সম্পূর্ণ রাত জাগরণকারী হিসেবে গণ্য হবে।" (দারেমী-১৬৯৫৮)

১৬. প্রতিদিন দশটি আয়াত তিলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট গাফিল বলে গণ্য হবে না। প্রতিদিন একশত আয়াত তিলাওয়াতকারী আল্লাহর আনুগত্যশীল বলে গণ্য হয়। প্রতিদিন এক হাজার আয়াত তিলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট সাওয়াবের ভাণ্ডার লাভকারী বলে চিহ্নিত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنطِرِيْنَ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে সে গাফিল বলে

গণ্য হবে না, আর যে ব্যক্তি একশত আয়াত তিলাওয়াত করে সে আনুগত্যশীল বলে গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্য সাওয়াবের ভাণ্ডার লিখা হবে।" (আবু দাউদ: ১৪০০)

১৭. কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত এবং অনুধাবন করা মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে সফল হওয়ার কারণ।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ " وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ " قَالَ: " فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلَانِ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ.

অর্থ: বারা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কবরে মু'মিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? (মু'মিন হলে) সে বলবে আমার রব আল্লাহ, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কী? সে বলবে আমার দ্বীন ইসলাম, তারা আবার জিজ্ঞেস করে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সে উত্তরে বলবে: আমি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছি।" (আবু দাউদ: ৪৮৫৫)

১৮. কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত মৃতব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: «يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মানুষকে কবরে দাফন করা হয় তখন ফেরেশতা মাথার দিক থেকে আযাব দেয়ার জন্য আসে, তখন কুরআন তিলাওয়াত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা

সামনের দিক থেকে আসে তখন দান খয়রাত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে আসে তখন মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাকে বাধা দেয়।" (মুজামুল আওসাত: ৯৪৩৮)

১৯. কুরআন মাজীদ বেশি বেশি তিলাওয়াতকারীকে জান্নাতের তাজ পরিধান করানো হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ «يَجِيءُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ اَنَا الَّذِي كُنْتُ اُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَاُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَاَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ. فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، فَيَقُوْلَانِ: يَا رَبُّ، اَنّٰى لَنَا هٰذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا: بِتَعْلِيْمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْاٰنَ، وَاِنَّ صَاحِبَ الْقُرْاٰنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ، وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামাতের দিন কুরআন মাজীদ দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তিলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিন? আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কুরআন তিলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তিএবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতা-মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা আবেদন করবে- হে আমার রব এ সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার কে কুরআন শিখানোর কারণে। কুরআন তিলাওয়াতকারীকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে এভাবে তিলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার

সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তিলাওয়াত করা বন্ধ করবে।" (তাবারানী)

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ» . قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُوْلُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا. فَهُوَ فِي صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذًّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيْلًا ".

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন: সূরা বাকারা শিখ। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, জাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন: সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান শিখ, কিয়ামাতের দিন এ উভয় সূরা তার পাঠকারীর ওপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে বাদল বা ছাতির ন্যায়, বা সাড়িবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামাতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কুরআন মাজীদ তার সাথে হালকা

পাতলা লোকের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিন? কুরআন তিলাওয়াতকারী বলবেঃ আমি তোমাকে চিনি না, কুরআন বলবেঃ আমি তোমার সাথী কুরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, তার পিতা-মাতাকে দু'টি মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মুকাবিলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা বলবেঃ এ পোশাক আমাদেরকে কোন্ আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে তোমাদেরকে কুরআন শিখানোর কারণে, এরপর কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কুরআন তিলাওয়াত কর এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ কর, যতক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে ওপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তিলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে।" (আহমদঃ ২২৯৫০)

কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত কিছু দুর্বল ও জাল হাদীস

১. হাদীসে কুদসীতে রয়েছে : আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে মশগুল থাকার কারণে যিকির ও দু'আ করার সুযোগ পায় না আমি তাকে দু'আ করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশি দান করি। আর আল্লাহর কালামের সম্মান সমস্ত মাখলুকের ওপর সেরূপ যেরূপ আল্লাহর সম্মান সকল মাখলুকের ওপর।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিুস সাগীর হা/ ২৯২৬, যঈফাহ হা/ ১৩৩৫।

২. আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারবে না যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হতে বাহির হয়েছে। অর্থাৎ আল-কুরআন।

দুর্বল : হাকিম, জামি'উস সাগীর হা/ ৪৮৫২। তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

৩. আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম করিও। এ আমলের দ্বারা আসমানে তোমাদের আলোচনা হবে আর এ আমল যমীনে তোমার জন্য হিদায়াতের নূর হবে।

খুবই দুর্বল : বায়হাক্বী, জামি'উস সাগীর হা/ ৪৯৩১/ তাহক্বীক্ব আলবানী : খুবই দুর্বল।

৪. আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন শিক্ষা করো, অতঃপর তা পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা পাঠ করে আর তাহাজ্জুদে তা পাঠ করতে থাকে তার উদাহরণ সেই খোলা থলির ন্যায় যা মেশকের দ্বারা পরিপূর্ণ, যার খোশবু সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করলো অতঃপর কুরআন তার সিনায় থাকা সত্ত্বেও সে ঘুমিয়ে থাকে, তার উদাহরণ সেই মেশকের থলির ন্যায়, যার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিউস সাগীর হা/ ২৮৭৬। তাহক্বীক্ব আলবানী : দুর্বল।

৫. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ কুরআন কারীম চিন্তা ও অস্থিরতা (সৃষ্টি করার) জন্য নাযিল হয়েছে। তোমরা যখন তা পাঠ করো কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো। আর কুরআন সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করো। কারণ যে ব্যক্তি তা সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করে না সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ হা/ ১৩৫৮-তাহক্বীক্ব আলবানী : দুর্বল। আবূ দাউদ আহমাদ। বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ রাফি' এর নাম হল, ইসমাঈল ইবনু রাফি'। সে দূর্বল মাতরূক।

৬. ফাযালাহ ইবনু 'উবায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: গায়িকার মালিক তার গায়িকার গান যতটুকু মনোযোগ দিয়ে শোনে, আল্লাহ উঁচু স্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ হা/ ১৩৫৭, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/ ২৯৫১।

৭. কুরআন বহনকারী ও না বহনকারীর মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য এরূপ যেমন সৃষ্টিজগতের ওপর সৃষ্টিকর্তার।

বানোয়াট : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এটি মিথ্যা হাদীস।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আদব

১. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার পূর্বে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম' তিলাওয়াত করা ওয়াজিব।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

অর্থ: "সুতরাং যখন আপনি কুরআন পড়বেন তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চান।"(সূরা নাহল ১৬:৯৮)

২. কুরআন মাজীদ ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করা উচিত।

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً .

অর্থ: "অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর।" (সূরা মুযযাম্মিল ৭৩:৪)

৩. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় নয়নাশ্রু ঝরানো মুস্তাহাব।

وَيَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعاً .

অর্থ: "আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৯)

৪. তিলাওয়াত করার সময় একই আয়াত বারবার দোহরানো বৈধ।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، يَقُوْلُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا» وَالْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} .

অর্থ: "আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাহাজ্জুদ নামাযে নবী ﷺ একটি আয়াত সকাল পর্যন্ত বারবার তিলাওয়াত করছিলেন, আর আয়াতটি ছিল 'আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' (সূরা মায়িদা: ১১৮)।" (ইবনে মাজাহ: ১৩৫০)

৫. কুরআন মাজীদ সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা উচিত।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِيِّ اَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْاٰنِ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহ কোনো কিছু এতো মনযোগ দিয়ে শুনে না যতো মনযোগ দিয়ে শুনেন নবীর উত্তম ও মিষ্টি কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।" (মুসলিম: ১৮৮১)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوْا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ».

অর্থ: "বারা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কণ্ঠে কুরআন মাজীদকে সুন্দর করে তিলাওয়াত কর।" (নাসায়ী: ১০১৫)

৬. যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ। অভিনয় ব্যতীত সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতের সময় সুস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে তার স্পন্দন সৃষ্টি করে তিলাওয়াত করা উচিত।

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ، وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাত্হ বা সূরা ফাত্হের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তিলাওয়াত করেছিলেন এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তিলাওয়াত করছিলেন।" (বুখারী: ৫০৪৭)

৭. আস্তে আস্তে বিনা আওয়াযে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে উত্তম:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ».

অর্থ: "উকবা বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: উচ্চকণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে আর আস্তে আস্তে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি গোপনে দান করে।" (তিরমিযী: ১৩৩৫, আবু দাউদ: ১৩৩৩, নাসাঈ: ২৫৬১)

৮. মসজিদে বসে এমন আওয়াযে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা উচিত যেন অন্যদের ইবাদাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، «اَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ».

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সাবধান! তোমরা সবাই তোমাদের রবের গোপনে আলাপ রত আছ (সালাত রত অবস্থায়), তাই তোমাদের কেউ অপরকে কষ্ট দিবে না, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে না।" (আহমাদ: ১১৮৯৭)

৯. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় কুরআন তিলাওয়াতকারীর ওপর আল্লাহভীতি এবং কোমলতা থাকা উচিত:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ، الَّذِي اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَاُ، حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ».

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত সুন্দর কণ্ঠে ঐ ব্যক্তি করছে যার আওয়াজ শুনে মনে হবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করছে।" (ইবনু মাজাহ: ১৩৩৯)

১০. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় ভীতিমূলক আয়াত তিলাওয়াত করতে গিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করা, তাসবীহর আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা মুস্তাহাব:

عَنْ حُذَيْفَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَاِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اِسْتَجَارَ، وَاِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهٌ لِلّٰهِ سَبَّحَ».

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করছিলেন, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তিনি যখন আল্লাহর রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন আল্লাহর নিকট রহমত প্রর্থনা করতেন, আর যখন শাস্তির আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন আউযুবিল্লাহ বলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন, আর যখন আল্লাহর পবিত্রতা সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন সুবহানাল্লাহ বলে তার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন।" (আহমাদ: ২৩২৬২)

নোট: মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এ আমল নামাযের মধ্যেও করা যাবে বলে প্রমাণিত।

১১. তাশদীদ এবং মদ্দ বিশিষ্ট অক্ষর দীর্ঘ করে তিলাওয়াত করা উচিত:

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ مَدًّا» ، ثُمَّ قَرَاَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} [اَلْفَاتِحَةُ: 1] يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

অর্থ: "কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : তিনি টেনে টেনে কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ টেনে টেনে তিলাওয়াত করলেন, এরপর রহমান এবং রাহিমও টেনে টেনে তিলাওয়াত করতেন।" (বুখারী: ৫০৪৬)

১২. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় হাই উঠলে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে হাই দেয়া উচিত, হাই শেষ হলে আয়াত তিলাওয়াত করতে শুরু করবে।

عَنِ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ".

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ হাই দিবে তখন যেন সে তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে; কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে।" (মুসলিম: ৭৬৮৫)

১৩. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ বলা বা হাঁচিদাতার উত্তরে ইয়ারহামুকুমুল্লাহ বলা সালামের উত্তর দেয়া বৈধ।

عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ: اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ اِبْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ مَلَكًا، اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.

অর্থ: "ইবনু রাফি (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায আদায় করেছি, নামাযের মধ্যে আমার হাঁচি আসলে আমি আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফিহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বনা ওয়া ইয়ারদা। অর্থ, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁর অধিক প্রশংসা, পবিত্র এবং বরকতময়, যেমন আমাদের রব পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট থাকেন।' যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলেন এবং লোকদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন নামাযের মধ্যে কে কথা বললো? কেউ উত্তর দিল না, তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখনও কেউ উত্তর দিল না, তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন তখন রিফায়া বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি বলেছিলে? রিফায়া আবার ঐ কথাগুলো বললো যা সে নামাযে বলেছিল, তিনি বললেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, ত্রিশেরও অধিক ফেরেশতা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল যে, কে কার আগে একথাগুলো আকাশে নিয়ে যাবে।" (তিরমিযী: ৪০৪)

১৪. ভ্রমণ বা সফররত অবস্থায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা বৈধ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ، وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ».

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাতহ বা সূরা ফাতহের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তিলাওয়াত করেছিলেন এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তিলাওয়াত করছিলেন।" (বুখারী: ৫০৪৭)

১৫. কুরআন মাজীদ ততক্ষণ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা উচিত যতক্ষণ তিলাওয়াত করার আগ্রহ থাকে।

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ، فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

অর্থ: "জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর যতক্ষণ তাতে তোমাদের মনোযোগ থাকে, আর যখন তোমরা অন্যমনস্ক হয়ে যাবে তখন তা তিলাওয়াত করা বন্ধ করবে।" (বুখারী: ৫০৬০)

১৬. তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মাজীদ খতম করা ঠিক নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ».

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মাজীদ খতম করে সে কুরআন বুঝেনি।" (তিরমিযী: ২৯৪৯)

১৭. চল্লিশ দিনে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «اِقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَرْبَعِيْنَ».

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী ﷺ তাকে বলেছেন: চল্লিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর।" (তিরমিযী: ২৯৪)

১৮. পবিত্র অবস্থায় বিনা অজুতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা যাবে।

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ، اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ،

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একরাতে তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মাইমুনা (রা)-এর বাড়িতে ছিলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমি বিছানায় প্রান্তে শুয়েছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী বিছানায় দৈর্ঘ্যে শুয়েছিলেন, প্রায় অর্ধরাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বসে বসে স্বীয় হাত দিয়ে চেহারায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, এরপর দাঁড়িয়ে পানির ঝুলানো পাত্রের নিকট গেলেন, ভালো করে অযু করলেন, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমিও উঠলাম এবং সবকিছু শেষ করলাম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। (বুখারী: ১৮৩)

১৯. মাসিকের সময় মহিলারা হাতমোজা পরিধান করে বা কাপড় দিয়ে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে।

وَكَانَ اَبُوْ وَائِلٍ: «يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلٰى اَبِي رَزِيْنٍ، فَتَأْتِيْهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ».

অর্থ: "আবু ওয়ায়িল (রা) তার ঋতুবর্তী খাদেমকে আবুরাযিন (রা) এর নিকট পাঠালেন কুরআন মাজীদ নিয়ে আসার জন্য, আর সে কাপড়ের ওপর দিয়ে ধরে তা নিয়ে আসল।" (বুখারী: ২৯৭)

২০. গোসল ফরয হলে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা বা করানো নিষেধ।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের জন্য কোনো নিষিদ্ধ সময় নেই।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ

অর্থ: "আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ সর্বাবস্থায়ই আমাদেরকে কুরআন শিখাতেন, তবে গোসল ফরয হলে তা করতেন না।" (তিরমিযী: ১৪৬)

২১. কুরআন মাজীদ গানের মত করে তিলাওয়াত করা নিষেধ।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتًّا. إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَسَفْكَ الدَّمِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْاٰنَ مَزَامِيْرَ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ.

অর্থ: "আউফ বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি ৬টি বিষয় তোমাদের জন্য ভয় করছি, বোকা লোকদের নেতৃত্ব, রক্তপাত, বিধি-বিধান ক্রয়-বিক্রয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, যুবকদের কুরআন মাজীদ গানের মত তিলাওয়াত করা, পুলিশের আধিক্য।" (ত্বাবারানী: ২১৪)

নোট: বিধি-বিধান বিক্রির অর্থ হল আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ বেচাকেনা করা, পুলিশের আধিক্য বলতে বুঝায় জনসাধারণের প্রতি নির্দয় শাসক।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়:

১. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কিবলামুখী হয়ে বসা।
২. কুরআন মাজীদ ধরার জন্য অযু করা।
৩. কুরআন তিলাওয়াত করার আগে মেসওয়াক করা।
৪. কুরআন খতম করার দিন রোযা রাখা।
৫. কুরআন তিলাওয়াত করার পর তিলাওয়াত কৃত কুরআন কোনো মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য বখশানো।
৬. মৃতব্যক্তির স্মরণে সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তার রূহে সাওয়াব পৌঁছানো।

তিলাওয়াতে সাজদার বিধান

১. সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা করার ফযীলাত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِذَا قَرَاَ اِبْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي اُمِرَ اِبْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আদম যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায়, আর বলে হায় আদম কে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে সাজদা করেছে তাই সে জান্নাতে যাবে, আর আমি সাজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি কিন্তু সাজদা করতে অস্বীকার করেছি, তাই আমি জাহান্নামে যাব।" (মুসলিম ২৫৪)

২. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় সাজদার আয়াত আসলে তখন তিলাওয়াতকারী এবং তিলাওয়াত শ্রবণকারীর জন্য সাজদা করা মুস্তাহাব।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ، فَيَقْرَاُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتّٰى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ»

অর্থ: " ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যখন সাজদা বিশিষ্ট সূরা তিলাওয়াত করতেন তখন সাজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সাজদা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছি না। (মুসলিম: ১৩২৩)

৩. সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার সময় অযু থাকা উত্তম তবে জরুরি নয়।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، «يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَيُهْرِيقُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا تَوَضَّأَ

অর্থ: "সাঈদ বিন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা) যানবাহন থেকে অবতরণ করে পেশাব করতেন, অতঃপর যানবাহনে আরোহণ করে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং সাজদা করতেন কিন্তু অযু করতেন না।" (ইবনু আবি শাইবা: ৫৫৩)

৪. সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা করা ওয়াজিব নয়।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

অর্থ: যায়েদ বিন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ এর সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করলাম কিন্তু তিনি তা শ্রবণে সাজদা করলেন না।" (আবু দাউদ: ১৪০৬)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ

অর্থ: " উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জুম'আর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে সূরা নহল তিলাওয়াত করলেন। এতে সাজদার আয়াত এল, তখন তিনি মিম্বার থেকে নেমে সাজদা করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সাজদা করলো। এভাবে যখন পরবর্তী জুম'আ এল তখন তিনি সেই সূরাই পাঠ করলেন। আর এতে যখন সাজদার আয়াত আসলো তখন তিনি বলেন: হে মানবমণ্ডলী আমরা সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সর্বদা সাজদা করি, তাই যে ব্যক্তি সাজদা করল সে সঠিক কাজ করল, আর যে ব্যক্তি সাজদা করেনি তার কোনো পাপ হবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) এ সময় উমার রা. সাজদা দিলেন না। " (বুখারী: ১০১১)

৫. যানবাহনে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সেখানে সাজদা করা জায়িয।

যানবাহনে আরোহণকারী স্বীয় হাতের ওপরও সাজদা করতে পারবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْاَرْضِ، حَتّٰى اِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ»

অর্থ: " ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন সকল লোকজন সাজদা করল কেউ যানবাহনে আরোহিত ছিল আবার কেউ মাটিতে, যারা মাটিতে ছিল তারা মাটিতে সাজদা করল আর যারা যানবাহনের উপরে ছিল তারা তাদের হাতের ওপর সাজদা করল।" (আবু দাউদ: ১৪১৩)

৬. সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদায় পঠনীয় সুন্নাতী দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ، يَقُوْلُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাহাজ্জুদ নামাযে তিলাওয়াত সাজদায় নবী ﷺ এ দু'আ পাঠ করতেন: আমার মুখমণ্ডলসহ আমার সমস্ত দেহ সাজদায় অবনমিত, সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভব করেছেন স্বীয় ইচ্ছা এবং শক্তিতে।" (তিরমিযী: ৩৪২৫)

৭. সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর আল্লাহু আকবার বলে সাজদা থেকে মাথা উঠানো সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানোও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

কুরআন মাজীদ শিখার ফযীলাত

১. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সমস্ত জ্ঞান অর্জনকারীর চেয়ে উত্তম:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ»

অর্থ: "উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী ৫০২৭)

২. কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।" (মুসলিম: ৭০২৮)

৩. কুরআন মাজীদ শিক্ষাকারীকে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামাত দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

১. তার ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয়।

২. আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়া দিয়ে তাদেরকে আবরিত করে রাখেন।

৩. তাদের সম্মানে ফেরেশতাগণ তাদের আশ পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

৪. আল্লাহ গৌরব করে ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা স্মরণ করেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّاَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কিছুলোক আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তাদের কথা ওদের নিকট স্মরণ করেন যারা তাঁর নিকট আছে, স্মরণ রাখ যার আমল তাকে পিছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।" (মুসলিম ৭০২৮)

৪. কুরআনের জ্ঞান অর্জনকারীদেরকে ফিরিশতারা ভালোবাসে।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى بُرْدٍ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنِّي جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ

অর্থ: "সাফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি মসজিদে একটি হেলানদানীর ওপর হেলান দিয়েছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য উপস্থিত হয়েছি, তিনি বললেন : জ্ঞান অন্বেষণকারীর আগমন বরকতময় হোক, জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশতারা তাদের পাখা দিয়ে আবরিত করে রাখুক। এরপর তারা একে অপরের ওপর আরোহণ করে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের নিকট পৌছে যাক, ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে এজন্য এতো ভালোবাসে যে তারা যে জ্ঞান অন্বেষণ করে ঐ জ্ঞানকে ফেরেশতারা পছন্দ করে।" (মুজামুল কাবীর: ৭৩৭৪)

৫. জ্ঞান অর্জনের জন্য মসজিদ বা মাদরাসায় আগমনকারী একটি পূর্ণ হজ্জের সাওয়াব পাবে:

عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَاَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ

অর্থ: "আবু উমামা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি শুধু এজন্য মসজিদে গমন করে যে ভালো কিছু শিখবে বা জানবে তাহলে সে একটি পূর্ণ হজ্জের সাওয়াব পাবে।" (মুজামুল আওসাত: ৭৪৭৩)

৬. কুরআন মাজীদের দশটি আয়াত শিখা পৃথিবীর সমস্ত লাভজনক সম্পদের চেয়ে লাভজনক:

عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ فُلَانَ، فَرَبِحْتُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «اَلَا اُنَبِّئُكَ بِمَا هُوَ اَكْثَرُ رِبْحًا؟» قَالَ: وَهَلْ يُوْجَدُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ تَعَلَّمَ آيَاتٍ» فَذَهَبَ، فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ. فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ অমুক বংশ থেকে পণ্য ক্রয় করেছি, আর এতে আমার এতো অধিক লাভ হয়েছে, তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে বেশি লাভজনক পণ্যের কথা বলবো? লোকটি বললো: এর চেয়ে লাভজনক পণ্যও কি আছে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের দশটি আয়াত শিখে সে এর চেয়েও অধিক মুনাফা পাবে, ঐ ব্যক্তি তখন ফিরে গিয়ে দশটি আয়াত শিখে আবার নবী ﷺ-এর নিকট আসল এবং তাঁকে জানাল।" (মুজামুল কাবীর: ৮০১২)

৭. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনকারী সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيَأْتِيْكُمْ اَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْنُوْهُمْ "

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের নিকট লোকেরা জ্ঞান অর্জনের জন্য আসবে, যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে সাধুবাদ জানাবে এবং তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে।" (ইবনু মাজাহ: ২৪৭)

৮. কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণকারীদের কারণেই পৃথিবীতে কল্যাণ বিরাজ করছে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: «اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، اِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، اَوْ عَالِمًا، اَوْ مُتَعَلِّمًا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা অভিশপ্ত, একমাত্র আল্লাহর যিকির, তিনি যা পছন্দ করেন, ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণকারী, ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যতীত। (ইবনু মাজাহ: ২৩২২)

৯. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জন করা অন্য সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ الْعِلْمِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ»

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার নিকট জ্ঞানের আধিক্য ইবাদাতের আধিক্য থেকে প্রিয়, আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হলো তা যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে।" (বায্যার: ২৯৬৯)

১০. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য ফেরেশতারা তাদের পর বিছিয়ে দেয়।

কুরআন মাজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ، وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي الْمَاءِ

অর্থ: "আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়,

আল্লাহতার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অর্জনকারীদের প্রতি খুশি হয়ে তাদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেয়, জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছু এমনকি সমুদ্রের মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (ইবনে মাজাহ: ২২৩)

১১. কুরআন মাজীদ শিখার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমানের।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ভালো কিছু শিখার বা শিখানোর জন্য আমার এ মসজিদে আগমন করে তার মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়, আর যে ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে আসে সে ঐ ব্যক্তির সমমানের যার নযর অপরের সম্পদের দিকে।" (ইবনে মাযাহ: ২২৭)

১২. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে গণ্য হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ، اَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ»

অর্থ: "আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তারা কারা? তিনি বললেন: তারা কুরআনের ধারক এবং বাহক, তারা আল্লাহর প্রিয় এবং বিশেষ বান্দা।" (ইবনে মাজাহ: ২১৫)

১৩. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অন্বেষণকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিরাস (রেখে যাওয়া সম্পদ) থেকে তাঁর নিজের অংশ পায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ السُّوْقِ، مَا أَعْجَزَكُمْ» قَالُوْا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسَمُ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُوْنَ فَتَأْخُذُوْنَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ» قَالُوْا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدِ» فَخَرَجُوْا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَوَقَفَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوْا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْئًا يُقْسَمُ. فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: «أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟» قَالُوْا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّوْنَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُوْنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: «وَيْحَكُمْ، فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদ্বীনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন: হে বাজারের লোকেরা কোন্ জিনিস তোমাদেরকে থামিয়ে রেখেছে? লোকেরা বললো: হে আবু হুরাইরা এটা কেমন কথা? আবু হুরাইরা বললো: ওখানে নবী ﷺ এর মিরাস (সম্পত্তি) বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশগ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বণ্টন হচ্ছে? আবু হুরাইরা (রা) বললো: মসজিদে। লোকেরা দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে গেল, আবু হুরাইরা (রা) ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবু হুরাইরা (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কী হলো তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বললো: আমরা মসজিদে গেলাম কিন্তু ওখানে কোনোকিছু বণ্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম, আবু হুরাইরা (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখ না? লোকেরা বললো: কেন নয় আমরা ওখানে কিছু

লোককে নামায আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছে, আবার কিছুলোক হালাল-হারামের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করছে, আবু হুরাইরা (রা) বললেন: তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিরাস (সম্পত্তি)। (মুজামুল আওসাত: ১৪৩০)

১৪. কুরআন মাজীদের জ্ঞান শিক্ষাকারী পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শিক্ষাকারীদের চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ: "উসমান (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে কুরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী: ৫০২৮)

১৫. কুরআনের জ্ঞান অর্জনকারীরা নবীগণের ওয়ারিস।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ، اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا. اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থ: "আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবিদের ওপর ঐ রকম যেমন চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকাদের ওপর। আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস, নিশ্চয়ই নবীগণ টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী রেখে যান না, অতএব, যে ব্যক্তি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে। সে ততটুকু পরিমাণে নবীগণের উত্তরাধিকারী হবে।" (ইবনে মাজাহ: ২২৩)

১৬. কুরআন শিক্ষাদানকারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত নাযিল করেন।

কুরআন শিক্ষাদানকারীদের জন্য ফেরেশতা, আকাশ ও যমীনের অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি এমনকি পিপিলীকা এবং মাছও দু'আ করে।

عَنْ اَبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى اَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দুজন লোকের কথা বলা হলো তাদের একজন আলেম আর অপরজন আবিদ (ইবাদাতকারী), রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আবিদের ওপর আলিমের মর্যাদা এমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের কোনো একজন সাধারণ লোকের ওপর। এরপর তিনি আরো বললেন: নিশ্চয়ই যারা মানুষকে সুশিক্ষা দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ স্বীয় রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি এমনকি গর্তের পিপিলীকা এবং সমুদ্রের মাছও তার জন্য কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে।" (তিরমিযী: ২৬৮৫)

১৭. কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত কাউকে শিখানো পৃথিবীর বড় বড় নিয়ামত থেকে অধিক মূল্যবান:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى بُطْحَانَ، اَوْ اِلَى الْعَقِيْقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ نُحِبُّ ذٰلِكَ، قَالَ: «اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، اَوْ يَقْرَاُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَرْبَعٍ، وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ»

অর্থ: "উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা সুফফায় বসেছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং বললেন: তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, প্রতিদিন সকালে বাতহান বা আকীক (মদ্বীনার দু'টি

বাজারের নাম) যাবে এবং ওখান থেকে উঁচু কুজবিশিষ্ট দুটি উট বিনা অন্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং কোনো পাপে লিপ্ত না হয়ে নিয়ে আসবে? আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এটা তো আমরা সবাই চাই, তিনি বললেন: তাহলে মসজিদে যাও এবং কাউকে কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত শিখিয়ে দাও বা নিজেই তিলাওয়াত কর, তাহলে তা ঐ উট থেকে উত্তম হবে, এভাবে তিন আয়াত তিন উট থেকে উত্তম হবে চার আয়াত চার উট থেকে উত্তম হবে, এভাবে যতো বৃদ্ধি করতে তত উট থেকে তা উত্তম হবে। (মুসলিম: ১৯০৯)

১৮. কুরআনের জ্ঞান শিক্ষাদানকারী শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের সৎ আমলেও ভাগ পান।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْعَامِلِ

অর্থ: সাহল বিন মুয়ায বিন আনাস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কাউকে জ্ঞান শিক্ষা দেয় সে ততটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকু সাওয়াব পাবে সে অনুযায়ী আমলকারী, আর তাদের উভয়ের সাওয়াবের মাঝে কোনো কমতি হবে না।" (ইবনে মাজাহ: ২৪০)

১৯. কুরআন মাজীদের জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর সাওয়াব ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন তার ছাত্ররা ঐ জ্ঞান বিস্তার করতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ، اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের মৃত্যুর পর তার আমল এবং তার সাওয়াবের মধ্য থেকে যে বিষয়গুলো তার উপকারে আসবে তাহলো ঐ জ্ঞান যা সে অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং বিস্তার করেছে, সৎ সন্তান যাদেরকে সে তার পেছনে রেখে গেছে, কাউকে

কুরআনের জ্ঞানের ওয়ারিস করেছে, মসজিদ নির্মাণ করেছে, মুসাফিরদের জন্য আবাসস্থল নির্মাণ করেছে, মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছে, নিজের সম্পদ থেকে নিজের সুস্থাবস্থায় দান করে গেছে, এ সমস্ত বিষয় মানুষের মৃত্যুর পর তার উপকারে আসবে।" (ইবনে মাজাহ: ২৪২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমলের সাওয়াব সে পেতে থাকে। সাদাকা জারিয়া (যে দান থেকে তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হতে থাকে), যে জ্ঞান থেকে অন্যরা উপকৃত হচ্ছে, সৎ সন্তান যারা তাদের পিতামাতার জন্য দু'আ করে।" (মুসলিম ৪৩১০)

২০. নিজের সন্তানদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষাদানকারী পিতামাতাকে কিয়ামাতের দিন এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মুকাবিলায় পৃথিবী এবং তার মাঝে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ মনে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِيْ كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لَا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، فَيَقُوْلَانِ: يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا: بِتَعْلِيْمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ، وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তিলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিন? আমিই সে যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে, আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কুরআন তিলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে, আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তিএবং সম্মানের তাজ। আর তার পিতামাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতামাতা আবেদন করবে হে আমার রব এ সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমাকে কুরআন শিখানোর কারণে। কুরআন তিলাওয়াতকারীকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে এভাবে তিলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তিলাওয়াত করা বন্ধ করবে।" (তাবারানী, আলবানী সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮২৯)

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ» . قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " تَعَلَّمُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ [ص:42]، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُوْلُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ،

وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هٰذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا. فَهُوَ فِي صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذًّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيْلًا"

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসেছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি বললেন: সূরা বাকারা শিখ। কেননা তা শিখার মধ্যে বরকত রয়েছে, আর তা না শিখা আফসোসের কারণ, যাদুকররা এতে কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন: সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান শিখ, কিয়ামতের দিন এ উভয় সূরা তার পাঠকারীর ওপর উজ্জ্বল ছায়া হয়ে ঘিরে থাকবে, বাদল বা ছাতির ন্যায়, বা সারিবদ্ধ পাখির ঝাঁকের ন্যায়। কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীর কবর বিদীর্ণ করা হবে তখন কুরআন মাজীদ তার সাথে হালকা পাতলা লোকের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চিন? কুরআন তিলাওয়াতকারী বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, কুরআন বলবে: আমি তোমার সাথী কুরআন, যে গরমের সময়ে তোমাকে পিপাসিত রেখেছে, রাত জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসা করে আর আজ তুমি অন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী, তাই তার ডান হাতে বাদশাহী এবং বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতী হওয়ার নির্দেশনামা দেয়া হবে, আর তার মাথায় সম্মান এবং শান্তির তাজ পরিধান করানো হবে, আর তার পিতা-মাতাকে দু'টি মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মুকাবিলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ মনে হবে। কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা বলবে: এ পোশাক আমাদেরকে কোন আমলের কারণে দেয়া হলো? তাদেরকে বলা হবে, তোমার সন্তানদেরকে কুরআন শিখানোর কারণে, এরপর কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে যে, কুরআন তিলাওয়াত কর এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাজনক স্থানে আরোহণ কর, যতক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করতে থাকবে ততক্ষণ সে ওপরে উঠতে থাকবে চাই দ্রুত তিলাওয়াত করুক আর আস্তে আস্তে।" (আহমাদ : ২২৯৫০)

কুরআন হিফ্য করার ফযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ: اِقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا"

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কুরআন মুখস্থকারীকে বলা হবে: তিলাওয়াত কর এবং আরোহণ কর, যেমন তুমি পৃথিবীতে তিলাওয়াত করতে, তোমার স্থান ওখানে যেখানে গিয়ে তুমি সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করবে।" (আবু দাউদ: ১৪৬৬)

কুরআন মুখস্থ করার পর তা মুখস্থ রাখার গুরুত্ব

১. কুরআন মুখস্থ করার পর তা মুখস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করা জরুরি।

عَنْ اَبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِي عُقُلِهَا»

অর্থ: "আবু মূসা বিন উকবা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কুরআন মুখস্থ রাখ, ঐ সত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! কুরআন উটের চেয়ে দ্রুত তার বাঁধন ছেড়ে চলে যায়।" (মুসলিম: ১৮৮০)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا، وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»

অর্থ: " ইবনু উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কুরআন মুখস্থকারীর উদাহরণ হলো বেঁধে রাখা উটের ন্যায়, যদি তা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে তাহলে তা থাকবে আর যদি সংরক্ষণ না করে তাহলে তা চলে যাবে।" (মুসলিম ১৮৭৫)

২. কুরআন মাজীদ মুখস্থ রাখার জন্য বারবার কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ فَقَرَاَهُ بِاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَاِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ»

অর্থ: "ইবনু উমার (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কুরআন মুখস্থকারী রাতে উঠে এবং দিনরাত কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তা তার মুখস্থ থাকবে, আর যদি না উঠে এবং রাতদিন তিলাওয়াত না করে তাহলে মুখস্থ থাকবে না।" (মুসলিম: ১৮৭৬)

নোট: রাতদিন তিলাওয়াত করার অর্থ রাত এবং দিনের মধ্যে একটি সময় নির্ধারণ করে নিয়ে নির্ধারিত পরিমাণে প্রতিদিন তিলাওয়াত করা। (অনুবাদক)

৩. যদি কেউ কোনো আয়াত ভুলে যায় তাহলে তার একথা বলা উচিত যে, আমাকে অমুক আয়াত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে:

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، اَوْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

অর্থ: " ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য একথা বলা খুবই অন্যায় যে, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তার বলা উচিত অমুক আয়াত আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম: ১৮৭৯)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন, তিনি বললেন: আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।" (মুসলিম: ১৮৭৪)

নোট: যদি বলা হয় যে, 'আমি এ আয়াত ভুলে গেছি' তাহলে এর অর্থ হবে তার অলসতা এবং তিলাওয়াত না করার কারণে ভুলে গেছে, তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. অলসতার কারণে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ার শাস্তি ।

عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا، قَالَ: «اَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْاٰنَ، فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ»

অর্থ: "সামুরা বিন জুনদাব (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বপ্ন দেখার হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করার পর তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় এবং ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হচ্ছে।" (বুখারী: ১১৪৩)

কুরআম মাজীদ শুনা এবং শুনানোর ফযীলাত

১. একাগ্রতা এবং চুপ থেকে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শ্রবণকারীর ওপর আল্লাহ দয়া করেন।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: "যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আরাফ: ২০৪)

২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শুনার জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতারা অবতরণ করে।

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।"[১] (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৭৮)

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا،

قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟» . قَالَ: لاَ. قَالَ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ»

অর্থ: "উসাইদ বিন হুযাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন, তার ঘোড়াও পাশেই বাধা ছিল, হঠাৎ তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করল যখন উসাইদ থেমে গেল তখন তার ঘোড়াও থেমে গেল, তখন উসাইদ (রা) আবার তিলাওয়াত করতে লাগল তখন ঘোড়াও আবার লাফাতে শুরু করল। উসাইদ (রা) এর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশেই ছিল, সে ভয় করতে লাগলো যে, তার না আবার কোনো ক্ষতি হয়, তখন ছেলেকে নিজের পাশে বসাল। উসাইদ (রা) উপরের দিকে তাকাল, তখন একটি ছায়া দেখতে পেলো, উসাইদ (রা) সেদিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। সকালে উসাইদ (রা) এ ঘটনাটি নবী ﷺ কে শুনাল, তিনি বললেন: হে হুযাইরের ছেলে তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক। উসাইদ (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, ঘোড়া ইয়াহইয়ার কোনো ক্ষতি করবে, সে ঘোড়ার একেবারে নিকটেই বসেছিল, তাই আমি মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম এবং তাকে আমার নিকটে এনে ওপরের দিকে তাকালাম তখন আমি এ ছায়া দেখতে পেলাম যেখানে বাতির ন্যায় কিছু আলো জ্বলছিল। আমি ঘর থেকে বের হলাম যেন ভালোভাবে তা দেখতে পারি, কিন্তু তা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কি জান এটা কী ছিল? উসাইদ (রা) বললো: না! তিনি ﷺ বললেন: এটা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল, যারা তোমার সুন্দর কণ্ঠ শুনে কাছে চলে এসেছিল, যদি তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে সকালে অন্যরাও তা দেখতে পেত, আর তারা তখন মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হত না।" (বুখারী: ৪৭৩০)

৩. আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন উবাই বিন কাব (রা) কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনান, আর সে যেন তা শুনে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى.

অর্থ: "আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই বিন কা'ব (রা) কে বললেন: আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে সূরা আল বায়্যিনা তিলাওয়াত করে শুনাই, উবাই বিন কা'ব (রা) বললো: আল্লাহ আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করে বার্তা পাঠিয়েছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হ্যাঁ। উবাই বিন কা'ব একথা শুনে আনন্দে কাঁদতে লাগলো।" (মুসলিম: ৬৪৯৭)

নোট: উল্লেখ্য: উবাই বিন কা'ব বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারীদের উস্তাদ ছিলেন, উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তাঁকে তারাবীর জামাআতের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন।

৪. অপরের কাছ থেকে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনা রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِقْرَأْ عَلَيَّ» ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا} ، قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও, আমি বললাম: আমি আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাব অথচ কুরআন আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: আমি অপরের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। আমি তাঁকে সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শুনাতে লাগলাম আর যখন এ আয়াতে পৌঁছলাম 'অনন্তর তখন কী দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?' (সূরা নিসা:৪১)

তখন তিনি বললেন: থাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে গেছে।" (বুখারী: ৫০৫০)

৫. সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় ভালো কুরআন তিলাওয়াতকারী সাহাবীগণের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَسْتَطِيْعُ هَؤُلاَءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَءُوْا كَمَا تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ

لَوْ شِئْتَ اَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: اَجَلْ. قَالَ: اِقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ. اَخُوْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: اَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَاَ وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا؟ قَالَ: اَمَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ؟ فَقَرَأْتُ خَمْسِيْنَ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ اَحْسَنَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا اَقْرَاُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ

অর্থ: "আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় খাব্বাব বিন আরাত (রা) এসে বলতে লাগলো! হে আবু আবদুর রহমান (রা)! (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর উপাধি) এ যুবকেরা অর্থাৎ আপনার ছাত্ররাও কি আপনার মতো কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে? আব্দুল্লাহ (রা) বললো: হ্যাঁ, যদি তুমি বল তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলব যে, সে তোমাকে কুরআন শুনাবে, খাব্বাব (রা) বললো: হ্যাঁ বলো। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেন, হে আলকামা (রা)! পড়ো,....................... আলকামা (রা) সূরা মারইয়ামের পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাল, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) খাব্বাব (রা) কে জিজ্ঞেস করল বলো পড়া কেমন? খাব্বাব (রা) বললো: খুব সুন্দর। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: আমি যেভাবে তিলাওয়াত করি আলকামাও ঐভাবেই তিলাওয়াত করে।" (বুখারী: ৪৩৯১)

৬. আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালেম (রা)-এর সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতের কথা বললো, তখন তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে সালেম (রা)-এর তিলাওয়াত শুনলেন।

عَنْ عَائِشَةَ. زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: اَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ. ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «اَيْنَ كُنْتِ؟» قُلْتُ: كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ. قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ: «هٰذَا سَالِمٌ مَوْلَى اَبِيْ حُذَيْفَةَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اُمَّتِي مِثْلَ هٰذَا»

অর্থ: "নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে ইশার পরে আমি দেরি করে ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত কারো থেকে শুনিনি। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে সেই ব্যক্তির তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমার উম্মাতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন।" (সুনান ইবনু মাজাহ: ১৩৩৮)

৭. একজন সাহাবীর তিলাওয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর শুনতে শুনতে তিনি তাঁর ভুলে যাওয়া একটি আয়াত স্মরণ করতে পারলেন তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، اَوْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য একথা বলা খুবই অন্যায় যে, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তার বলা উচিত অমুক আয়াত আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম: ১৮৭৯)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন, তিনি বললেন: আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।" (মুসলিম: ১৮৭৮)

নোট: যদি বলা হয় যে, 'আমি এ আয়াত ভুলে গেছি' তাহলে এর অর্থ হবে তার অলসতা এবং তিলাওয়াত না করার কারণে ভুলে গেছে, তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআনের কিছু সূরার বিশেষ ফযীলাত

১. সূরা ফাতিহার ফযীলাত

১. সূরা ফাতিহার ন্যায় ফযীলাতপূর্ণ সূরা উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বে অন্য কোনো উম্মাতকে দেয়া হয় নাই। সূরা ফাতিহার অপর নাম আল কুরআনুল আযীমু।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُعْطِيْتُهُ.

অর্থ: "উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। সূরা ফাতিহার ন্যায় সূরা না তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে না ইঞ্জিলে, না যাবুরে, এ হলো আস-সাবউল মাসানী বা বার বার তিলাওয়াতকৃত সাত আয়াত, আর এটাই কুরআনে আযীম (মহান কুরআন) যা আমি প্রদত্ত হয়েছি।" (তিরমিযী: ২৮৭৫)

নোট: সূরা ফাতিহার বিভিন্ন নাম রয়েছে যা কুরআন মাজীদ এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. উম্মুল কুরআন;
২. সাবউল মাসানী (মাসানী বলা হয় এজন্য যে, তা নামাযে বারবার প্রত্যেক রাকআতে তিলাওয়াত করা হয়);
৩. কুরআনুন আযীমু;
৪. সূরাতুল হামদ,
৫. সূরাতুশ শুকর;
৬. সূরাতুদ দু'আ;
৭. সূরা আশ শাফিয়া।

এ সূরার আরো আনেক নাম বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। নামের এ আধিক্য এ সূরার ফযীলাত এবং বড়ত্বের কথা প্রমাণ করে।

২. সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআন মাজীদের সারমর্ম।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أُمُّ الْقُرْاٰنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উম্মুল কুরআন (কুরআনের সারমর্ম) উহা আস-সাবউল মাসানী (বারবার তিলাওয়াতকৃত সাত আয়াত) এবং কুরআনুন আযীমুন।" (বুখারী: ৪৭০৪)

৩. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাওয়া হবে আল্লাহ তা দেন।

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে তিলাওয়াত করতে হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَاَلَ، فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَاِذَا قَالَ: {اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَاِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ} ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَيَّ عَبْدِي فَاِذَا قَالَ: {اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} قَالَ: هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَاَلَ، فَاِذَا قَالَ: {اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَاَلَ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হয়, বান্দা যখন বলে: 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, আর যখন বান্দা বলে 'আর রাহমানির রাহীম' তখন আল্লাহ বলেন: বান্দা আমার গুণগান করেছে, আর

বান্দা যখন বলে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দা আমার মাহাত্ম বর্ণনা করেছে, তিনি এও বলেছেন: বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার ওপর সোপর্দ করেছে, আর বান্দা যখন বলে: 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন' তখন আল্লাহ বলেন: এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝের বিষয়, আমার বান্দা যা চায় তাকে তাই দেয়া হবে। আর যখন বান্দা বলেন: 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, ওয়ালাদ দ্বল্লীন' এটা আমার বান্দার জন্য আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হবে।" (মুসলিম : ৯০৪)

৪. শরীরের সমস্ত অসুস্থতার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ হবে।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيْرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: اِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ، وَاِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ. فَرَقَاهُ فَبَرَأَ. فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِيْنَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا. فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: اَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً اَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ: لاَ. مَا رَقَيْتُ اِلَّا بِاُمِّ الْكِتَابِ. قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوْا شَيْئًا حَتّٰى نَأْتِيَ اَوْ نَسْاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ اَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي بِسَهْمٍ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সফররত অবস্থায় আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম, একটি মেয়ে এসে বললো: ঐ বংশের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে, আমাদের ছেলেরা অনুপস্থিত, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে, তাকে ঝাড়ফুঁক করবে? একজন তার সাথে চলে গেল অথচ আমরা কখনো জানতাম না যে, সে ঝাড়ফুঁক করে, কিন্তু সে ঝাড়ফুঁক করল এবং সর্দার সুস্থ হলো। সর্দার ঝাড়ফুঁককারীকে ত্রিশটি বকরি উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল, আমাদের দুধও পান করাল। যখন ঝাড়ফুঁককারী ফিরে আসল তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ভালো করে ঝাড়ফুঁক করতে জান? বা বলা হলো যে, তুমি কি ঝাড়ফুঁক কর? সে বললো: না, আমি তো শুধু সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করেছি আর ঝাড়ফুঁক করেছি। বকরীর ব্যাপারে আমরা

সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখন আমরা কিছু করব না যতক্ষণ না আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করছি। যখন মদ্বীনায় পৌছলাম তখন আমরা নবী ﷺ কে জানালাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কী করে জানলে যে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? ঐ বকরিগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন কর এবং আমাকে একটি অংশ দাও। (বুখারী: ৫০০৭)

নোট: দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে যে সাহাবাগণ সাত বার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

৫. জাদু, জিনের আছর, মৃগী রোগে সকাল-সন্ধ্যা তিন বার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উপকারী।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ»

অর্থ: "খারিজা বিন সুলত (রা) তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সফররত অবস্থায় এক অঞ্চলের অধিবাসীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা তার নিকট এসে বললো: তোমরা ঐ লোকের কাছ থেকে, মুহাম্মাদ ﷺ- এর কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছ তাই আমাদের এ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক কর। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসল, যে পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং রশি দিয়ে বাধা অবস্থায় ছিল। সাহাবাগণ তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা ঐ ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করল। সাহাবীগণ যখন সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করত তখন সামান্য থুথু মুখে জমা করে তার শরীরে ফেলত। তিনদিন পর ঐ ব্যক্তি স্বাভাবিক হয়ে গেল যেন সে বন্দী থেকে মুক্তি পেল। তারা সাহাবাগণকে কিছু উপহার দিল তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: খেয়ে নাও, আমার হায়াত যার হাতে তাঁর কসম! কিছু লোক মিথ্যা ঝাড়ফুঁক করে পয়সা নেয়, আর তোমরা সত্য ঝাড়ফুঁক করে উপহার নিয়েছ।" (আবু দাউদ: ৩৪২২)

৬. সূরা ফাতিহা আল্লাহর নাযিলকৃত নূর।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ "

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় সে ওপর থেকে জোরে দরজা খোলার আওয়ায শুনতে পেল, সে উপরের দিকে মাথা উঠাল এবং নবী ﷺ কে বললো: এটা আকাশের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা, যা ইতোপূর্বে আর কখনো খোলা হয় নাই। আর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করবে, যে ইতঃপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে নাই। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম দিয়েছে এবং বলছে আপনার জন্য দুটি বরকতময় নূরের সুসংবাদ, আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এ নূর দেয়া হয় নাই, আর তা হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, যে ব্যক্তি এ দু আয়াত পাঠ করবে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে। (মুসলিম: ১৯১৩)

* সূরাহ্ ফাতিহার ফযিলাত সংক্রান্ত দূর্বল ও জাল হাদীসসমূহ

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরা ফাতিহা সকল রোগের নিরাময়।

দুর্বল : দারিমী, দায়লামী, বায়হাক্বী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/ ৩৯৫৪, ৩৯৫৫।

(২) উম্মুল কুরআন অন্য সকল সূরাহ্র স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কিন্তু অন্যান্য সূরাহ উম্মুল কুরআনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

সানাদ দুর্বল : হাকিম, দারাকুতনী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/ ১২৪৭। বর্ণনাটি মুরসাল।

সূরাহ ফাতিহার ফযিলাত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'নেয়ামুল কোরআন' নামক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) সূরা ফাতিহা লিখিয়া ও ইহার 'মালিকি ইয়াওমিদ দ্বীন' আয়াতটি ৭ বার লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করত : যে ফলের গাছে ফল ধরে না, তাহাতে ঐ পানি ছিটাইয়া দিলে ফল ধরিবে।

(২) ইহা প্রত্যহ শেষ রাতে ৫১ বার পড়িলে সংসার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে ও সকল কাজ সহজ হইবে।

(৩) প্রত্যহ ফরয নামাযের পর বিসমিল্লাহসহ ৭ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন এবং ১০০ বার পড়িলে অতি সত্বর বাসনা পূর্ণ হইবে।

(৪) প্রত্যহ ৩১৩ বার পড়িলে যেকোন কঠিন মতলব হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।

(৫) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ইহা ১২৫ বার পড়িবে, নিঃসন্দেহে তাহার মতলব পূর্ণ হইবে।

(৬) কারারুদ্ধ ব্যক্তি ১২১ বার পড়িয়া হাতকড়া ও পায়ের বেড়ির ওপর ফুঁক দিলে শীঘ্রই তাহার মুক্তির ব্যবস্থা হইবে।

(৭) যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহসহ ফজরের নামাযের পর ৩০ বার, যোহরের নামাযের পর ২৫ বার, আসরের নামাযের পর ২০ বার, মাগরেবের পর ২৫ বার ও এশার নামাযের পর ১০ বার পড়িবে আল্লাহ তাহার রুযী বেশি করিয়া দিবেন, তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, মতলব পূর্ণ হইবে ও দোয়া কবুল হইবে। ইত্যাদি।

সূরাহ ফাতিহা সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক মনগড়া ফাযীলাত ও তদবীর উক্ত কিতাবে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সূরা বাকারার ফযীলাত

১. যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ. اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ. وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَاُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত কর না, আর যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না।" (তিরমিযী ২৮৭৭)

২. সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা জাদুর উত্তম চিকিৎসা। কোনো যাদুকর সূরা বাকারার ওপর সফল হতে পারবে না।

সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলে ঘরে কল্যাণ এবং বরকত থাকে।

সূরা বাকারার তিলাওয়াত বাদ দিলে ঘর কল্যাণ এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা তার তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ، اِقْرَءُوْا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَاِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، اَوْ كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا، اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ»

অর্থ: "আবু উমামা আল বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কুরআন তিলাওয়াত কর, তা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে, দুটি আলোকময় সূরা তিলাওয়াত কর, সূরাতুল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান। কিয়ামতের দিন এ উভয় সূরা বাদলের ন্যায় বা ছায়ার ন্যায় আসবে, অথবা তা উড়ন্ত দুই ঝাঁক পাখির ন্যায় আসবে। সূরাদ্বয়ের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করবে, সূরা বাকারা অবশ্যই তিলাওয়াত করবে তা তিলাওয়াত করার বরকত লাভের কারণ, আর তা তিলাওয়াত না করা কষ্টের কারণ, কোনা যাদুকর তার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না।" (মুসলিম: ১৯১০)

৩. সূরা বাকারা কুরআন মাজীদের চূড়া।

যে ঘরের মধ্যে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَاُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ»

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রতিটি জিনিসেরই চূড়া আছে আর কুরআনের চূড়া হলো সূরা আল বাকারা। যখন শয়তান সূরা বাকারার তিলাওয়াত শুনে তখন ঐ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায় যেই সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।" (হাকেমঃ ৫৮৮)

নোটঃ সূরা বাকারার শেষ দু আয়াতের ফযীলাত কুরআনের আয়াতের ফযীলাত নামক অধ্যায় দ্রঃ

সূরা বাকারাহ সংক্রান্ত নিম্নের হাদীসটি দূর্বলঃ

যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নিজ ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করে শয়তান তিন রাত সে ঘরে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় নিজ ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করে শয়তান তিন দিন সে ঘরে প্রবেশ করবে না।

হাদীস দুর্বল : ইবনু হিব্বান, আবূ ইয়ালা, 'উক্বায়লী 'যুআফা'। এর সানাদে খালিদ ইবনু সাঈদ দুর্বল। ইবনু কাত্তান তাকে অজ্ঞাত বলেছেন। উক্বায়লী বলেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৩. সূরা আলে ইমরানের ফযীলাত

কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান কুরআন মাজীদের নেতৃত্ব দিবে এবং তার তিলাওয়াতকারীদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে ঝগড়া করবে।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ» ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ

بَعْدُ، قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا»

অর্থ: "নাওয়াস বিন সামআন আল কিলাবি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কিয়ামাতের দিন কুরআন মাজীদ আনা হবে, আর যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকেও আনা হবে। সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান আগে আগে থাকবে। এরপর নবী ﷺ এ দুটি সূরার ৩টি উদাহরণ দিয়েছেন যা আমি আজও ভুলি নাই।

১. এ উভয় সূরা বাদলের দুটি টুকরার ন্যায় হবে।
২. দু'টি কাল রং এর ছাতি থাকবে যা আলোকোজ্জ্বল থাকবে।
৩. পাখিদের দু'টি ঝাঁক হবে আর তারা তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবে। (মুসলিম: ৮০৫)

*** সূরাহ্ আলে-ইমরানের ফাযীলাত সংক্রান্ত বানায়োট হাদীস**

যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে সূরাহ আলে-'ইমরান পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রহমাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৪. **বানোয়াট হাদীস** : ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/ ৪১৫।

৪. সূরা হূদের ফযীলাত

সূরা হূদ, ওয়াকেয়া, আলমুরসালাত, নাবা, তাকবীরে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলি পরকালের চিন্তার খোরাক জোগায়।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, আল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন, ইযাশ্শামসু কুওয়িরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" (তিরমিযী: ৩২৯৭)

সূরা হূদ সংক্রান্ত দুর্বল হাদীস

اِقْرَؤُوا سُوْرَةَ هُوْدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

অর্থ: "জুমুআর দিন তোমরা সূরা হূদ তিলাওয়াত কর।"

নোট: এ হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল জামি আসসাগীর, হাদীস নং ১১৬৮।

৫. সূরা বনী ইসরাঈলের ফযীলাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার আগে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে বিছানায় শুইতেন না। (তিরমিযী: ২৯২০)

৬. সূরা কাহ্‌ফের ফযীলাত

১. সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ»

অর্থ: "আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের ১ম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি পাবে।" (মুসলিম ৮০৯)

নোট: উল্লেখ্য, আসহাবে কাহফ সে সময়ের যালিম বাদশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সূরা কাহ্‌ফের ৯নং আয়াতে আসহাবে কাহফের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর ১০নং আয়াতে গুহায় আশ্রয় নেয়ার সময় তারা আল্লাহর নিকট যে দু'আ করেছিল তার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেছেন এবং যালিম বাদশার যুলুম থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। দাজ্জালের ফেতনা বড় ফেতনা হবে। আসহাবে কাহ্‌ফের লোকদের আমলকৃত এ দু'আ যারা আমল করবে তাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। কোনো কোনো আলিম যে কোনো যালিম এবং

অত্যাচারী বাদশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এ দু'আটি উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

২. সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াতকারী দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ قَرَاَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرُّهُ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য তার অবস্থানস্থল থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত হবে, আর যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে দাজ্জালের ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করবে না।" (তাবারানী ২৬৫১)

নোট: মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে প্রথম দশ আয়াতের কথা, আর তাবারানীর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে শেষ দশ আয়াত, যার অর্থ হলো প্রথম অথবা শেষ যেকোনো দশটি আয়াত পড়বে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ইনশা আল্লাহ (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

৩. জুমআর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াতকারীর জন্য দুই জুমআর মাঝে একটি আলো প্রজ্জলিত হয়।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য আল্লাহ কিয়ামাতের দিন দু জুমুআর মাঝে একটি আলো প্রজ্জ্বলিত করবেন।" (হাকিম এবং বাইহাকী: ৩৩৯২)

নোট: আলো বলতে বুঝায়, পথ প্রদর্শন, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াতকারী দ্বীন এবং দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আল্লাহতাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করবেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।

* সূরাহ্ কাহ্ফ - এর ফযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল হাদীসসমূহ

(১) আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সূরাহ্র সংবাদ দিব না, যার মাহাত্ম আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে এবং তার পাঠকের জন্যও রয়েছে অনুরূপ পুরস্কার? যে তা পাঠ করবে তার এক জুমু'আহ হতে আরেক জুমু'আহর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া গুনাহ ক্ষমা করা হবে, ওপরন্ত অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তারা বললো, হ্যাঁ আপনি বলুন! তিনি বললেন, তা হলো সূরাহ কাহাফ।

খুবই দুর্বল : দায়লামী। সিলসিলাহ যঈফাহ হা/ ১৩৩৬

(২) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন সূরাহ কাহাফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক এমন ফিত্নাহ হতে নিরাপদ থাকবে যা সামনে ঘটবে। এতে যদি দাজ্জাল আবির্ভূত হয় সে তার থেকেও নিরাপদ থাকবে।

খুবই দুর্বল : জিয়া 'আল-মুখতার'। এর সনদে রয়েছে ইবরাহীম মুখায়রামী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। সে বিশ্বস্তদের সূত্রে বাতিল হাদীস বর্ণনা করে। দেখুন সিলসিলাহ যঈফা হা/১৩৩৬

(৩) যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিত্না থেকে নিরাপদ থাকবে।

খুবই দুর্বল : তিরমিযী। আলবানী বলেন, উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি শায কিন্তু ভিন্ন শব্দে হাদীসটি সহীহ। এতে তিন আয়াত কথাটি ভুল। সঠিক হলো দশ আয়াত। দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/ ১৩৩৬।

* সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহ

(১) আনাস হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত :

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا . وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يٰسٓ . مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

প্রত্যেক বস্তুরই একটি অন্তর রয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্তর হলো সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরাহ ইয়াসীন (একবার) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশবার কুরআন খতমের নেকী দিবেন।

বানোয়াট হাদীস : তিরমিযী, দারিমী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/ ১৬৯। হাদীসটি আবূ বাক্‌র এবং আবূ হুরাইরাহ হতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের সানাদও খুবই দুর্বল। সামনে তাদের বর্ণনা আসছে।

(২)

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (يٰسٓ) فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ وَمَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الدُّخَانِ غُفِرَ لَهُ

যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত নিষ্পাপ অবস্থায় সকালে জাগরিত হয় এবং যে ব্যক্তি সূরা দুখান পাঠ করে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

খুবই দুর্বল : আবূ ইয়ালা। ইবনুল জাওয়ারী 'মাওযু'আত' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : এ হাদীসের সবগুলো সূত্রই বাতিল। হাদীসটির কোনই ভিত্তি নেই। যুবাইদী বলেন, বায়হাক্বী এটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এর সানাদ খুবই দুর্বল।

(৩)

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ يَتِمُّ حَوَائِجُهُ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হবে।"

নোট: এ হাদীসটি মুরসাল হওয়ার করণে দুর্বল, আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ২১৭৭।

مَا مِنْ مَيِّتٍ فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُوْرَةَ يٰسٓ اِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: "মৃতব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ তার ওপর মৃত যন্ত্রণাকে হালকা করেন।"

নোট: আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউজুয়া দ্রঃ পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ (৫)

তোমার মৃত্যু পথযাত্রীর ওপর সূরাহ ইয়াসীন পড়ো।

নোট: এ হাদীসটি দুর্বল, আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, হাদীস নং- ১১৭০।

দুর্বল : আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম, বায়হাক্বী, ত্বায়ালিসি, ইবনু আবূ শায়বাহ। হাদীসটি আলবানী ইওয়াউল গালীল গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি দুর্বল। এর তিনটি দোষ রয়েছে : (১) আবূ 'উসমানের জাহালাত। (২) তার পিতার জাহালাত। (৩) ইযতিরাব বা উলটপালট। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সানাদ দুর্বল এবং মতন অজ্ঞাত। দেখুন, ইরওয়া হা/ ৬৮৮। আলবানী লিখিত যয়ীফুল জামি আসসাগীর দ্রঃ, হাদীস নং ১১৭০)

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالىٰ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَؤُهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ . (৬)

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, এ সূরা তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিদের নিকট তিলাওয়াত কর।"

নোট: আলবানী লিখিত যয়ীফুল জামি আসসাগীর, হাদীস নং-৫৭৯৭।

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.(৭)

অর্থ: "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করল সে যেন ১০ বার কুরআন তিলাওয়াত করল।"

নোট: এ হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত যয়ফুল জামে আসসাগীর। খ. ৬, হাদীস নং ৫৭৯৮।

مَنْ كَتَبَ يٰسٓ ثُمَّ شَرِبَهَا دَخَلَ جَوْفَهُ أَلْفُ نُوْرٍ وَأَلْفُ بَرَكَةٍ وَأَلْفُ دَوَاءٍ أَخْرَجَ مِنْهُ أَلْفَ دَاءٍ. ৮)

অর্থ: "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন লিখল, অতঃপর তা পান করল তার পেটে এক হাজার নূর প্রবেশ করল, এক হাজার রহমত প্রবেশ করল, এক হাজার বরকত প্রবেশ করল, এক হাজার ওষুধ প্রবেশ করল বা এক হাজার রোগ বের হলো।"

নোট: আলবানী লিখিত আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়, খণ্ড:৭, হাদীস নং ৩২৯৩।

(৯) সূরা ইয়াসীন হলো কুরআনের দিল বা অন্তর। যে ব্যক্তি এটাকে আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতের আশায় পাঠ করে

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা এ সূরাহটি ঐ ব্যক্তির সামনে পাঠ করো যে মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটপট করছে।

সানাদ দুর্বল : আহমাদ।

(১০) নাবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের প্রত্যেকেই এ সূরাহটি মুখস্থ করুক এটা আমি কামনা করি।

সানাদ দুর্বল : বাযযার। এর সানাদে ইবরাহীম ইবনুল হাকাম দুর্বল।

(১১) মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ তা আসান করে দেন।

দুর্বল : হাদীসটি কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হতে মুত্তাসিল ও মারফূভাবেও বর্ণিত হয়েছে এ শব্দে : তোমরা যখন পাঠ করবে....। কিন্তু এটি যঈফ মাক্বতূ'। কতিপয় মাতরূক ও সন্দেহভাজন বর্ণনাকারীও হাদীসটিকে মুত্তাসিলভাবে বর্ণনা করেছেন এ শব্দে : "কোন মৃত্যুপথযাত্রীর নিকটে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন।" এটি বর্ণনা করেছেন আবূ নু'আইম 'তারীখে আসবাহান' গ্রন্থে মারওয়ান ইবনু সালিম হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু 'আমর হতে, তিনি শুরাইহ হতে, তিনি আবূ দারদা হতে মারফূ'ভাবে। সানাদের এ মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি বিশ্বস্ত নন। ইমাম সাজী ও আবূ 'আরুবাহ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। তারই সূত্রে হাদীসটি দায়লামী বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, আবূ দারদা ও আবূ যার বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন। যেমনটি আত-তালখীস গ্রন্থে রয়েছে।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) বলেন : সূরাহ ইয়াসীনের বিশেষ ফযীলাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নাবী ﷺ-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। অথচ সুয়ূতীর অনুকরণ করতে গিয়ে শাওকানী ধারণা করেছেন যে, সূরাহ ইয়াসীনের ফযীলাত সম্পর্কিত কতিপয় বর্ণনা সহীহর শর্তে রয়েছে। তাই তাদের দু'জনের বিরোধীতা করে শায়খ 'আবদুর রহমান মুআল্লিমী ইমানী (র) বলেন : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় হাসানের ওপর। তিনি আবূ হুরায়রাহ হতে হাদীসটি শুনেননি। সুতরাং খবরটি মুনকাতি। শুধু তাই নয়, বরং হাসান পর্যন্ত হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে সমালোচনাও রয়েছে। তার একটি সানাদে আবূ বাদর শুজা' ইবনু ওয়ালিদ রয়েছেন। তিনি সত্যবাদী কিন্তু সংশয় রয়েছে। বুখারী তার কেবল একটি হাদীস এনেছেন। যাতে তার শায়খ তার মুতাবাআত করেছেন। অনুরূপ মুসলিম তার মুতাবাআত বর্ণনা এনেছেন মাত্র। তার একটি সানাদে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া। তিনি হাদীস জালকারী এবং আগলাব ইবনু তামীম ও জাসরাহ বিন ফারক্বাদ। আর এ সমস্ত সানাদাবলি আবূ বাদরের। যার সম্পর্কে সুয়ূতী ধারণা

করেছিলেন যে, তা সহীহ্‌র শর্তে রয়েছে। আর আপনারা তো এইমাত্র অবহিত হলেন যে, সানাদটির কি (বাজে) অবস্থা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

সূরাহ ইয়াসীনের ফযীলাত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা'সহ কতক পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) বুযুর্গ লোকগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদে ও রোগের সময় এ সূরা পাঠ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, নিশ্চয়ই সে রোগ মুক্তি পাবে ও বিপদ মুক্ত হবে।

(২) কোন কঠিন কাজের সময় সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ্ তা সহজ করে দেন।

(৩) এই সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় কিংবা বিপদগ্রস্ত লোকের গলায় মাদুলিতে ভরে বেঁধে দিলে খুবই উপকার হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

৭. সূরা সাজদার ফযীলাত

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবারে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الٓمٓ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ"

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন, আর জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ২০৬১)

নোট: সূরা দাহরের অপর নাম সূরা ইনসান বা আবরার।

৮. সূরা যুমারের ফযীলাত

রাতে শোয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যুমার তিলাওয়াত করে শুতেন।

عَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ»

অর্থ: "আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে বিছানায় শুইতেন না। (তিরমিযী: ২৬২০)

৯. সূরা ফাত্‌হ-এর ফযীলাত

সূরা আল ফাতহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম:

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيْرُ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيْبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَخَشِيْتُ اَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ، فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ، وَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ، لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَاَ: {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا}

অর্থ: "যায়েদ বিন আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সফর করেছিলেন, উমার (রা)ও তাঁর সাথে ছিল। উমার (রা) তাঁর নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল, তখনো তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল কখনো তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। উমার (রা) মনে মনে বলতে লাগল তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি তিন বার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করেছ কিন্তু তিনবারই কোনো উত্তর তুমি পাও নাই। উমার (রা) বলেন: আমি আমার উট দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং লোকদেরকে ছেড়ে সামনে চলে আসলাম। কিন্তু এ আশঙ্কা করছিলাম না জানি আমার এ আচরণের

কারণে কুরআন অবতীর্ণ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে এক আহ্বানকারী উচ্চকণ্ঠে আমার নাম নিয়ে ডাকতে লাগল, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমার ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা হয়তো সত্য হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন: আজ রাতে আমার ওপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট প্রত্যেক ঐ বস্তু থেকে প্রিয় যার ওপর সূর্য উদিত হয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয় (সূরা ফাতহ)।" (বুখারী: ৪১৭৭)

নোট: উল্লেখ্য: ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছেন, কোনো কোনো সাহাবী ঐ সন্ধির চুক্তিসমূহ মেনে নিতে পারেন নাই। সন্ধির পর আল্লাহতা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, এ সন্ধিকে আল্লাহ স্পষ্ট বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেন এতে সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হয়ে যান।

সূরা দুখান সংক্রান্ত দুর্বল হাদীস

مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি রাতে সূরা হা-মীম-দুখান তিলাওয়াত করবে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওবা পাঠ করবে।"

নোট: এ হাদীসটি মাওযু, তাহক্বীক আলবানী , তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৮৮।

مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهٗ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন রাতে সূরা হা-মীম-দুখান তিলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।"

নোট: এ হাদীসটি দুর্বল, তাহক্বীক আলবানী, সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৮৯।

* সূরাহ আর-রহমান-এর ফযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহ

لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ وَعَرُوْسُ الْقُرْآنِ اَلرَّحْمٰنُ

প্রত্যেক জিনিসেরই একটি শোভা আছে। কুরআনের শোভা হলো, সূরাহ আর-রহমান।

মুনকার হাদীস : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, অনুরূপ মিশকাত হা/২১৮০। এর সানাদের আহমাদ ইবনুল হাসান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন,

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। খাত্বীব 'তারীখ' গ্রন্থে বলেন, তিনি অস্বীকৃত। ইমাম যাহাবী তাকে 'যু' আফা ওয়াল মাতরুকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । সুতরাং মানাবী যদিও তাইসির গ্রন্থে একে হাসান বলে নিজেরই পরিপন্থি কাজ করেছেন কিন্তু বর্ণনাটি আসলে মুনকার।

সূরাহ্ আর-রহ্মান এর ফাযীলাত সম্পর্কে 'পাঞ্জে সূরাহ্ ও অজিফা'সহ্ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরাহ পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরাহ তিনদিন দৈনিক তিনবার পড়ে চোখের ওপর দম করলে চক্ষু রোগ ভাল হয়।

(২) ঘুমের মধ্যে এ সূরাহ পাঠ করতে দেখতে হাজ্জ করার সৌভাগ্য হবে।

(৩) অন্তরের সাথে খাস নিয়তে এ সূরাহ পাঠ করলে তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়।

(৪) সাদা রংয়ের বরতনে সূরাহটি লিখে বিধৌত পানি পান করালে প্লীহাগ্রস্থ রোগী আরোগ্য হয়।

(৫) সূরাহটি ১১ বার পাঠ করলে যেকোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৬) ফাবিআইয়্যি আলায়ি রব্বি কুমা তুকাযযিবান' পড়ে নীল সুতায় ৩১টি গিরা দিয়ে সূতা গর্ভবতীর গলায় দিলে নিরাপদ থাকে ও সহজে ভূমিষ্ঠ হয়।

(৭) ফাবিআইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাযযিবান' আয়াতটি তিনবার পাঠ করে কোন মজলিসে বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে সম্মান ও উত্তম ব্যবহার লাভ হবে।

১০. সূরা ওয়াকিয়ার ফযীলাত

সূরা ওয়াকিয়াতে বর্ণনাকৃত কিয়ামতের দিন ভয়াবহতাপূর্ণ ঘটনাবলি পরকালের চিন্তায় মগ্ন করে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন:

সূরা হূদ, ওয়াকেয়া, আল মুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন, ইযাশ্‌শামসু কুওয়িয়িরাত, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" (তিরমিযী: ৩২৯৭)

* সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ -এর ফযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহ

(১)

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

"যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব অনটন গ্রাস করবে না।"

নোট: এ হাদীসটি যয়ীফ, আলবানী লিখিত আল আহাদীস আযযয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, হাদীস নং ১/২৮৯)।

(২)

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ وَتَعَلَّمَهُ لَنْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِيْنَ كَلَّمْ يَفْتَقِرُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

"যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ির সদস্যরা অভাবে পতিত হবে না।"

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯১।

সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ এর ফাযীলাত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা অজিফা'সহ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) এ সূরাহ নিয়ম করে দৈনিক পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে ব্যবসায়ে লোকসান হবে না বরং লাভ হবে।

(২) ফজর ও এশার নামাজান্তে দৈনিক পাঠ করলে তাহার জীবনের অভাব অনটন দূর হয়ে সচ্ছলতা ফিরে আসবে।

(৩) এই সূরা লিখে তাবিজ বানাইয়া গর্ভবতীর প্রসব বেদনার সময় কোমরে বাঁধিয়া দিলে অতি সহজে প্রসব হয়।

(৪) ধনী হতে ইচ্ছা করলে এই সূরা নিম্নলিখিত নিয়মে আমল করতে হবে, জুমুআর দিন হতে সাত দিন পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাজান্তে ২৫ বার এ সূরা পাঠ করবে, ..।

(৫) দৈনিক এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে বিবাহ কার্য ও মামলা মোকদ্দমা এবং যাবতীয় সমস্যার সম্মানজনক ফল লাভ করবে।

(৬) 'ফাছাব্বিহ বিছমি রাব্বিকাল আযীম' ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে মনের আশা আল্লাহ পূর্ণ করেন।

*** সূরাহ হাশরের শেষের তিন আয়াতের ফযীলাতের হাদীস দুর্বল**

নবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলবে 'আউযু বিল্লাহিস্ সামি'ইল 'আলীমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম, অতঃপর সূরাহ হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকবেন। ঐ দিন সে মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পাঠ করবে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে।

হাদীস দুর্বল : তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি সংকলন করে হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববীও উক্ত হাদীসের দূর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। আলবানী বলেন : যঈফ।

১১. সূরা জুমু'আর ফযীলাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন, আর জুমুআর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ৮৭৯)

নোট: সূরা দাহরের অপর নাম সূরা ইনসান বা আবরার।

১২. সূরা মুনাফিকুন ফযীলাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন, আর জুমুআর সালাতে সূরা জুমুআ এবং সূরা মুনাফেকুন তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিমঃ ৮৭৯)

*** সূরাহ তাগাবুন এর সংক্রান্ত মুনকার হাদীস**

(২২৫) যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তার মাথার জোড়ে সূরাহ তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিখিত থাকে।

মুনকার হাদীসঃ ত্বাবারানী-ইবনু 'উমার হতে মারফু'ভাবে।

১৩. সূরা মুলকের ফযীলাত

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ শোয়ার আগে সূরা মুলক তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ جَابِرٍ «اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ الٓمٓ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ»

অর্থ: "জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সূরা আলিফ, লাম মীম এবং মুলক তিলাওয়াত না করে শুতেন না। (তিরমিযীঃ ২৮৯২)

২. সূরা মুলক প্রতিদিন তিলাওয়াত করলে কবরের আযাব থেকে রক্ষাপাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِىَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সূরা মূলক কবরের আযাব থেকে বাধা দানকারী।" (হাকিম ও যাহাবী বলেন হাদীসটি সহীহ। কানযুল উম্মাল: ২৬৪৯, সহীহ আল জামি' :৩৬৪৩)

৩. সূরা মুলক কিয়ামতের দিন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে এবং তার সুপারিশে তাকে ক্ষমা করা হবে, আর সে সূরাটি হলো 'সূরা তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক (সূরা মুলক)।" (তিরমিযীঃ ২৮৯)

৪. সূরা মূলক তার তিলাওয়াতকারীর মাগফিরাতের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে এবং তাকে জান্নাত দেয়া হবে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ، تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ»

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর মাগফিরাতের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঝগড়া করতে থাকবে এমনকি এর ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আর সে সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযি (সূরা মূলক)।" (সুনানুত তিরমিযী হা-২৮৯১, আবু দাউদ হা-১৪০০, ইবনু মাজাহ হা-৩৭৮৬, সহীহুত তারগীব হা- ১৪৭৪, হাদীসটি হাসান।)

৫. সূরা মুলক নিজে তিলাওয়াত করা উচিত, এমনকি নিজের স্ত্রী- এবং প্রতিবেশিদেরকেও তা শিখানো উচিত।

عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ، اَنَّه قَالَ لِرَجُلٍ: اَلَا اُطْرِفُكَ بِحَدِيْثٍ تَفْرَحُ بِهِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. قَالَ: اِقْرَأْ: " {تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَاحْفَظْهَا وَعَلِّمْهَا اَهْلَكَ وَجَمِيْعَ وَلَدِكَ وَصِبْيَانَ بَيْتِكَ وَجِيْرَانَكَ؛ فَاِنَّهَا الْمُنْجِيَّةُ. وَهِيَ

الْمُجَادِلَةُ تُجَادِلُ، وَتُخَاصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئِهَا، وَتَطْلُبُ لَهُ إِلَى رَبِّهَا أَنْ يُنَجِّيَهُ مِنَ النَّارِ إِذَا كَانَتْ فِي جَوْفِهِ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهَا صَاحِبَهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস উপহার দিব না যার ফলে তুমি খুশি হয়ে যাবে? ঐ ব্যক্তি বললো: কেন নয়? অবশ্যই। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বললো: সূরা তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মূলক (সূরা মুলক) নিজে তিলাওয়াত কর, নিজের পরিবার এবং সমস্তদেরকে শিক্ষা দাও, নিজের প্রতিবেশীদেরকেও শিক্ষা দাও এজন্য যে, কিয়ামতের দিন তা আযাব থেকে মুক্তিদাতা, ঝগড়াকারী। কিয়ামাতের দিন তার তিলাওয়াতকারীর ক্ষমার জন্য তার রবের নিকট ঝগড়া করবে, তার জন্য জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চাইবে, এমনকি সূরা মুলক তার তিলাওয়াতকারীকে কবরের আযাব থেকেও বাঁচাবে।" (ইবনু কাসীর: ৪র্থ খণ্ড: সূরা মুলকের তাফসীর.)

* সূরাহ মূলক এর ফাযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল ও জাল হাদীস

ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَفِي سَنَدِ هٰذَا الْحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَرَمَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْكَذِبِ.

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী একটি ক্ববরের ওপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি ক্ববর। তিনি হঠাৎ অনুভব করেন যে,

ক্ববরে একটি লোক সূরাহ আল-মুলক তিলাওয়াত করছে। সে তা পাঠ করে শেষ করলো। অতঃপর ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি ক্ববরের ওপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা একটি ক্ববর। হঠাৎ অনুভব করি, এক ব্যক্তি সূরা আল-মুলক পড়ছে এবং তা শেষ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সূরাটি প্রতিরোধকারী, মুক্তিদানকারী। এটা ক্ববরের আযাব থেকে পাঠককে মুক্তি দান করে।

দুর্বলঃ তিরমিযী, ইবনু নাসর, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা'- ইয়াহইয়া বিন 'আমার বিন মালিক হতে...। আলবানী বলেন : এর সানাদে 'আমর বিন মালিক সন্দেহভাজন এবং ইয়াহইয়া দুর্বল। আহমাদ ইবনু হাম্বল তাকে বলেছেন 'সে কিছুই না' , ইবনু মুঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। হাম্মাদ বিন যায়িদ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে এবং মীযান গ্রন্থে তার কতগুলো মুনকার হাদীস তুলে ধরা হয়েছে, যার অন্যতম এ হাদীসটি।

সূরাহ মূলক এর ফাযীলাত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'পাঞ্জে সূরা ও অজিফা' ও 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা' প্রভৃতি পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া উক্তি :

(১) যে ব্যক্তি সূরাহ মূলক ৪১ বার পাঠ করবে তাতে তার বিপদ দূর হয় এবং দেনা পরিশোধ হয়।

(২) নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরাহ পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরাহ তিনদিন দৈনিক তিনবার পাঠ করে চোখের ওপর দম করলে চক্ষু রোগ ভাল হয়, ইত্যাদি।

(৩) এ সূরা ৪১ বার খালেস নিয়তে পাঠ করলে আল্লাহ তাকে সব ধরনের বালামুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

(৪) ক্ববরস্থান যিয়ারতের সময় এ সূরা পাঠ করলে মুর্দার কবরের আযাব থেমে যায়।

(৫) জাফরানের কালি দিয়া এ সূরা লিখে তাবিজ আকারে গলায় পরিধান করলে যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ইত্যাদি।

সূরা ক্বিয়ামাহ -এর সংক্রান্ত জাল হাদীস

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে 'লা উকসিমু বি ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ' পাঠ করবে, সে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯০।

১৪. সূরা দাহরের ফযীলাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন ফযরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর তিলাওয়াত করতেন, আর জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ৮৭৯)

নোট: সূরা দাহরের অপর সূরার নাম ইনসান বা আবরার।

১৫. মুসাব্বিহাতের ফযীলাত

রাসূল ﷺ মুসাব্বিহাত তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَاُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ، وَقَالَ: «اِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ آيَةٍ»

অর্থ: "ইরবায বিন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ শোয়ার আগে মুসাব্বিহাত তিলাওয়াত করতেন আর বলতেন নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যা এক হাজার আয়াত থেকে উত্তম।" (আবু দাউদ: ৫০৫৭)

নোট:

১. মুসাব্বিহাত ঐ সমস্ত সূরাসমূহকে বলা হয় যা 'সুবহানা' বা সাব্বাহা, বা ইয়ুসাব্বিহু দিয়ে শুরু হয়েছে, নিচের সূরাসমূহ মুসাব্বিহাতের অন্তর্ভুক্ত ।

ক. বনী ইসরাঈল; খ. হাদীদ; গ. হাশর; ঘ. আসসাফ; ঙ. জুমুআ; চ. তাগাবুন; ছ. আল 'আলা।

২. এ মুসাব্বিহাত সূরাসমূহের মধ্যে ঐ আয়াত কোন্টি যা এক হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম? আলিমগণের মতে ঐ আয়াতটি এমনভাবে গোপন করা হয়েছে যেমন লাইলাতুল কদর কোন্ রাতে তা গোপন রাখা হয়েছে, যেন লোকেরা অধিক

সাওয়াবের আশায় বেশি বেশি আমল করে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

১৬. সূরা মুরসালাতের ফযীলাত

সূরা মুরসালাতে বর্ণিত ঘটনাবলী পরকালের চিন্তা জোগায়।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, আলমুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন, ইযাশ্‌শামসু কুওয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" (তিরমিযী: ৩২৯৭)

১৭. সূরা নাবার ফযীলাত

সূরা নাবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: আবু বকর (রা) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন: সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, আলমুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন, ইযাশ্‌শামসু কুওয়্যিরাত, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" (তিরমিযী: ৩২৯৭)

১৮. সূরা তাকবীরের ফযীলাত

সূরা তাকভীর তিলাওয়াতকারী খোলা চোখে কিয়ামতের দৃশ্যসমূহ দেখে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ» فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ"

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে, স্বচোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে।" (তিরমিযী: ৩৩৩৩)

১৯. সূরা ইনফিতারের ফযীলাত

কিয়ামতের দিন স্মরণ জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনফিতার তিলাওয়াত করা উচিত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ» فَلْيَقْرَأْ: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ"

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে, স্বচোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে।" (তিরমিযি: ৩৩৩৩)

২০. সূরা ইনশিকাকের ফযীলাত

পরকালের চিন্তা জাগ্রত করার জন্য সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করা উচিত।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ» ، قَالَ: «وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ»

অর্থ: "নুমান বিন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদের নামায এবং জুমুআর নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল 'আলা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন: যখন ঈদ এবং জুমুআর নামায একই দিনে হতো তখনো এ উভয় নামাযে এ উভয় সূরা তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ২০৬৫)

২১. সূরা আ'লার ফযীলাত

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদের নামায এবং জুমুআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা 'আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» ، قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ»

অর্থ: নোমান বিন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদের নামায এবং জুমুআর নামাযে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল 'আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' তিলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন: যখন ঈদ এবং জুমুআর নামায একই দিনে হতো তখনো এ উভয় নামাযে এ উভয় সূরা তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ২০৬৫)

২. বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা 'আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ: "মুয়ায বিন আনাস আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ শেষ পর্যন্ত দশবার তিলাওয়াত করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবে।" (আহমাদ: ১৫৬১০)

২২. সূরা গাশিয়ার ফযীলাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু ঈদের নামায এবং জুমুআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ» . قَالَ: «وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا اَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ»

অর্থ: "নুমান বিন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদের নামায এবং জুমুআর নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন, বর্ণনাকারী বলেন: যখন ঈদ এবং জুমুআর নামায একই দিনে হতো তখনো এ উভয় নামাযে এ উভয় সূরা তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম: ২০৬৫)

*** সূরাহ যিলযাল -এর ফাযীলাত সংক্রান্ত দুর্বল হাদীস**

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরাহ যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান।

মুনকার হাদীস : তিরমিযী, হাকিম ও উক্বায়লীর যু'আফা। হাদীসের একটি সানাদে ইয়ামান রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম হাকিম এটির সানাদকে সহীহ বলায় তার বিরোধিতা করে ইমাম যাহাবী বলেন, বরং সনাদের ইয়ামানকে হাদীস বলায় তার বিরোধিতা করে ইমাম যাহাবী বলেন, বরং সানাদের ইয়ামানকে হাদীস বিশারদ ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। হাদীসের আরেকটি সানাদে রয়েছে হাসান বিন সালাম। উক্বায়লী বলেন, তিনি অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, হাসানের বর্ণনাটি মুনকার।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরাহ যিলযাল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

দুর্বল : তিরমিযী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

২৩. সূরা কাফিরূনের ফযীলাত

১. একবার সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করার ফযীলাত হলো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করার ন্যায়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ»

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইযা যুলযিলা কুরআনের অর্ধেকের সমান এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান আর কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান।" (তিরমিযী: ২৮৯৪)

নোট: উল্লিখিত হাদীসে সূরা যিলযালার ফযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত অংশটি দুর্বল, আর বাকিটুকু সহীহ (বিশুদ্ধ)।

২. সূরা কাফিরূন মু'মিন ব্যক্তিকে শির্ক থেকে মুক্ত করার সূরা।

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِي، قَالَ: "اِقْرَأْ: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ"

অর্থ: "ফারওয়া বিন নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: আমাকে এমন কিছু শিখান যা আমি বিছানায় শোয়ার সময় পাঠ করব, তিনি বললেন: কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ কর, কেননা তা শির্ক থেকে মুক্তকারী সূরা।" (তিরমিযী: ৩৪০৩)

৩. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে সূরা ইখলাস এবং সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَاُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম দুটি সূরা যা ফজরের নামাযের ফরযের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযে

পাঠ করা হয়। কুল হুয়াল্লা হু আহাদ, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন।" (ইবনে খুযাইমা: ১৪৮০)

৪. সূরা কাফিরূন এবং সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের উত্তম চিকিৎসা।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ، لَا يَدَعُ مُصَلِّيًا، وَلَا غَيْرَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

অর্থ: "আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নামাযরত অবস্থায় নবী ﷺ কে বিচ্ছু দংশন করল, যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন বললেন: আল্লাহর লানত বিচ্ছুর ওপর, কেননা সে নামাযী এবং বেনামাযী কাউকেই ছাড়ে না, এরপর তিনি পানি এবং লবণ চেয়ে নিয়ে তা একসাথে মিশিয়ে ক্ষত স্থানে মালিশ করলেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফিরূন, সূরা নাস, সূরা ফালাক তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলেন।" (মুজামুল আওসাত: ৫৮৮৯)

নোট: ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় সূরা কাফিরূন ব্যতীত সূরা ইখলাস এবং সূরা নাস ও ফালাকের বর্ণনা এসেছে, হতে পারে কোনো একসময় সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন, আবার অন্য এক সময় সূরা কাফিরূন পাঠ করেছেন, আর এটাও স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁক দিতেন যতক্ষণ না তিনি সুস্থতা বোধ করতেন।

৫. কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফের পর দু'রাকআত নামায আদায়ের সময় প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَيِ الْاِخْلَاصِ: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ"

অর্থ: "জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফের দু রাকআত নামাযে ইখলাসের দু'টি সূরা (কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) তিলাওয়াত করেছেন।" (তিরমিযী: ৮৬৯)

৬. তিন রাকআত বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন তৃতীয় রাকআতে ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

অর্থ: "উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বিতির নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন আর তৃতীয় রাকআতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করে শেষ রাক'আতে সালাম ফিরাতেন। (নাসায়ীঃ ১৭০১)

২৪. সূরা ইখলাসের ফযীলাত

১. সূরা ইখলাস তিলাওয়াতকারীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা মুহাব্বাত রাখেন।

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ. فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فَلَمَّا رَجَعُوْا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوْهُ. فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির পরিচালনায় একটি সেনাদল পাঠালেন, ঐ ব্যক্তি নামায পড়ানোর সময় প্রতি রাক'আতে সূরা শেষ করে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করত। যখন সেনাদল ফিরে আসল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লোকেরা তা বললো। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো: এ সূরায় আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে, তাই আমি তা তিলাওয়াত করতে ভালোবাসি। এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।" (মুসলিমঃ ১৯২৬)

২. একবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করার ফযীলাত হল কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন রাতে শোয়ার পূর্বে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ؟» قَالُوْا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ»

অর্থ: "আবু দারদা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের জন্য কি সম্ভব নয় যে, তোমরা প্রতিদিন রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করবে? সাহাবাগণ বললো: কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ আমরা কীভাবে তিলাওয়াত করব? তিনি বললেন: কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।" (মুসলিম: ১৯২২)

৩. সূরা ইখলাসের সাথে অধিক মুহাব্বত এবং তা বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَاُ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ». قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «اَلْجَنَّةُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ তিলাওয়াত করতে শুনলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন: জান্নাত।" (তিরমিযী: ২৮৯৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَاُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَاُ بِهَا. افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَاُ بِسُوْرَةٍ اُخْرَى مَعَهَا. وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَكَلَّمَهُ اَصْحَابُهُ، فَقَالُوْا: اِنَّكَ تَقْرَاُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى اَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتّٰى تَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرَى، فَاِمَّا اَنْ تَقْرَاَ بِهَا، وَاِمَّا اَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرَى، قَالَ: مَا اَنَا بِتَارِكِهَا، اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ اَؤُمَّكُمْ بِهَا

فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ. فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি কুবা মসজিদে ইমামতি করত। সে যখনই নামাযে কোনো সূরা তিলাওয়াত করত তখনই প্রথমে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করত। প্রত্যেক রাকআতে সে এরূপ করত। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি প্রথমে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত কর। এরপর মনে কর যে নামাযের জন্য শুধু এ সূরাটিই যথেষ্ট নয় তখন আরও একটি সূরা তিলাওয়াত কর। তোমার উচিত শুধু সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করা বা তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো একটি সূরা তিলাওয়াত করা। সে বললো: আমি সূরা ইখলাস ত্যাগ করতে পারব না যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের ইমামতি করব। আর যদি না চাও তাহলে আমি ইমামতি ছেড়ে দিব। লোকেরা তাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মভিরু মনে করত, তাই তারা অন্য কাউকে ইমাম নির্ধারণ করা পছন্দ করছিল না। যখন তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো তখন তাকে এ বিষয়ে অবগত করাল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার সাথীদের কথা কেন শুনলে না? আর প্রত্যেক রাকআতে কেন সূরা ইখলাস তিলাওয়াত কর? সে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি এ সূরাটি মুহাব্বাত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এর মুহাব্বাত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" (তিরমিযী: ২৯০১)

৪. দশবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ "

অর্থ: "মুয়ায বিন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ শেষ পর্যন্ত দশবার তিলাওয়াত করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (আহমাদ ১৫৬১০)

৫. শয়তানের কু-প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইখলাস পাঠ করে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলতে হবে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " يُوشِكُ النَّاسُ اَنْ يَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ: هٰذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا: {اَللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا} اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: এমন একটি সময় আসবে যে লোকেরা একে অপরকে অনেক প্রশ্ন করবে। এমনকি একজন বলে উঠবে যে, আচ্ছা সৃষ্টি জীবকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন মানুষ এ রকম কথা বলবে তখন বলো: আল্লাহ একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো নেই এবং তিনিও কারোর নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এরপর তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।" (নাসাঈল কিবরী-১০৪৯৭)

৬. বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর দু রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، "اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ فِي رَكْعَتَي الطَّوَافِ بِسُوْرَتَي الْاِخْلَاصِ: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ"

অর্থ: "জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফের দু রাকআত নামাযে ইখলাসের দু'টি সূরা (কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) তিলাওয়াত করেছেন।" (তিরমিযী: ৮৬৯)

৭. ফজরের প্রথম রাকআতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, দ্বিতীয় রাক'আতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম দুটি সূরা যা ফজরের নামাযের ফরযের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযে পাঠ করা হয়। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ।" (ইবনে খুযাইমা: ১৪৮০)

* সূরাহ্ ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস

(১) এ সূরাহ পাঠ করলে প্রত্যেক জিনিস হতে রক্ষা করা হবে। (নাসায়ী, হাদীস দুর্বল)

(২) যে ব্যক্তি এ কালেমা দশবার পড়বে সে জান্নাতে যাবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহিদান হামাদান সমাদান লাম ইয়াত্তাখিয সহিবাতান ওয়ালা ওয়ারাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ"। (আহমাদ-দুর্বল হাদীস)

(৩) সূরাহ ইখলাস একবার পাঠ করলে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়। (আহমাদ, দুর্বল হাদীস)

(৪) সূরা ইখলাস ৫০ বার পড়লে ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে ২০০ কিংবা ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, আরেক বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে আল্লাহ তার জন্য ১৫০০ নেকী লিখেন যদি সে দেনাদার না হয়। (সবগুলোই দুর্বল)

(৫) ঘরে প্রবেশের সময় সূরাহ ইখলাস পড়লে আল্লাহ ঘরের বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের অভাবমুক্ত করেন। (ত্বাবারানী-দুর্বল হাদীস)

(৬) প্রত্যেক ফরয সলাতের পর সূরাহ ইখলাস ১০ বার পড়লে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে এবং যে কোন হুরের সাথে ইচ্ছা বিবাহিত হবে। (আবূ ইয়ালা-দুর্বল হাদীস)

(৭) দিন রাত সব সময় চলাফেরা ও উঠা বসায় সূরাহ ইখলাস পাঠ করার কারণে মু'আবিয়াহ ইবনু মু'আবিয়ার জানাযায় জিবরীলসহ সত্তর হাজার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেন এবং তার মৃত্যুর দিন আকাশের সূর্য খুবই উজ্জ্লভাবে উদিত হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনাবলীও দুর্বল।

সূরাহ ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন'সহ কতক 'ওজিফা' গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) এই সূরাহ ফজর ও মাগরিবের সময় পড়িলে শেরেকী গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়, ঈমানের দুর্বলতা নষ্ট হয় এবং বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কিংবা অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করার জন্য বিসমিল্লাহসহ এক হাজার বার লিখিতে হয়। (ইহা বহু পরিক্ষীত)

(৩) যে ব্যক্তি সর্বদা প্রাতে এ সূরাহ পড়িবে তাহার মঙ্গল হইতে থাকিবে, আল্লাহ তার নেগাহবান থাকিবেন, ইহা প্রত্যেক বালার দাওয়া।

(৪) এ সূরাহ মাটির বাসনে ৭ বার বিসমিল্লাহ সহ লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

(৫) ইহা বিসমিল্লাহ সহ ৩১৩ বার লিখিলে মতলব পূর্ণ হয়।

(৬) এশার নামাযের পর দাঁড়াইয়া ১০১ বার পড়িলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়।

(৭) আল্লাহর গযব বন্ধ করার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

(৮) যে ব্যক্তি ক্ববরস্থানে যাইয়া সূরাহ ইখলাস ১১ বার পাঠ করিয়া মৃত ব্যক্তিগণের রূহের ওপর বশখাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি ক্ববরস্থানের সকল ক্ববরবাসীগণের সম-সংখ্যক নেকী লাভ করে।

২৫. সূরা ফালাকের ফযীলাত

সূরা ফালাক আল্লাহর অধিক পছন্দ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ. فَقُلْتُ: اَقْرِئْنِي سُوْرَةَ هُوْدٍ. اَقْرِئْنِي سُوْرَةَ يُوسُفَ فَقَالَ: «لَنْ تَقْرَاَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»

অর্থ: "উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি উটের ওপর আরোহী ছিলেন। আমি আমার হাত তার পায়ের ওপর রাখলাম এবং বললাম: আমাকে সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ পড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এমন কোনো সূরা তুমি পড় নাই, যা আল্লাহর নিকট সূরা ফালাকের চেয়ে ব্যাপক।" (নাসায়ী: ৫৪৩৯)

২৬. মুয়াওভেজাতাইন (সূরা নাস এবং ফালাকের) ফযীলাত

১. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরা নাস এবং ফালাকের চেয়ে উত্তম কোনো সূরা নেই।

সূরা নাস এবং ফালাক আসমানী মুসিবত যেমন তুফান, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি থেকেও হিফাযত করে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ، وَالْاَبْوَاءِ، اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ، وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَيَقُوْلُ: «يَا عُقْبَةُ، تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا»

অর্থ: "উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জুহফা এবং আবওয়া নামক স্থানের মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে রাতে পথ অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ করে অন্ধকার এবং প্রবল বাতাস আমাদেরকে ঢেকে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে উকবা এ উভয় সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এ উভয় সূরার অনুরূপ কোনো কিছু দিয়ে কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় করতে পারে না।" (আবু দাউদ: ১৪৬৫)

عَنْ اِبْنِ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا اِبْنَ عَابِسٍ اَلَا اَدُلُّكَ اَوْ قَالَ: اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ»

অর্থ: "ইবনে আবিস আল জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাকে বলেছেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি উত্তম বিষয় জানাব না, যা দিয়ে কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা করে? সে বললো: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি বলেন: সূরা নাস এবং সূরা ফালাক এ উভয় সূরা।" (নাসায়ী: ৫৪৪৭)

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ؟» فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْصِيَةً، فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً، وَنَزَلْتُ، وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ؟» فَأَقْرَأَنِي قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ مَرَّ بِي، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ؟ اِقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ»

অর্থ: “উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি কি তোমাকে দু'টি উত্তম সূরা শিখাব না, যা ঐ সমস্ত সূরাসমূহ থেকে উত্তম, যা লোকেরা তিলাওয়াত করে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শিখালেন, ইতোমধ্যে নামায শুরু হয়ে গেল। তিনি সামনে গিয়ে নামায পড়াতে শুরু করলেন এবং নামাযে এ উভয় সূরা তিলাওয়াত করলেন, অতঃপর তিনি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন: হে উকবা এ সূরাদ্বয়ের গুরুত্ব বুঝেছ? অতঃপর তিনি বললেন: যখন শুবে তখনও এ উভয় সূরা তিলাওয়াত করবে।” (নাসায়ী ৫৪৫২)

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»

অর্থ: “উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করি। (আবু দাউদ: ১৫২৫)

৪. মানুষের বদ নযর, জ্বিন শয়তানের আছর, যাদু, কুপ্রবঞ্চনা, হিংসা, শয়তানী খেয়াল ইত্যাদি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রেও সূরা নাস এবং ফালাক থেকে ফলদায়ক কোনো দু'আ নেই।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বিন এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আশ্রয় চাইতেন। এরপর যখন এ উভয় সূরা অবতীর্ণ হলো তখন এ উভয় সূরা পাঠ করতেন এবং এ সূরা ব্যতীত অন্য দু'আ বাদ দিয়েছিলে।" (তিরমিযী-২০৫৮)

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওপর যাদু করা হলো তখন জিবরাঈল (আ) তাঁকে সূরা নাস এবং সূরা ফালাক তিলাওয়াত করার পরামর্শ দিলেন, যা তিলাওয়াত করার পর তিনি যাদুর আছর থেকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ. قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ فِي بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ. فَاَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُوْدَانِهِ. فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ. فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اَتَدْرِيْ مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَاَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ الْاَنْصَارِيِّ. فَلَوْ اُرْسِلَ رَجُلٌ، وَاَخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ ". قَالَ: «فَبَعَثَ رَجُلًا فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فَبَرَاَ. جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْمَعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ: اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ وَالسَّحْرُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا وَفِيْ اُخْرى فَبَعَثَ عَلِيًّا (رضـ) فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَ فَاَخَذَ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعَقْرَاُ اَيَةً يَقْرَاُ وَيَحِلُّ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعَقْدَ وَيَقْرَاُ اَيَةً فَجَعَلَ يَقْرَاُ وَيَحِلُّ فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عَقْدَهُ وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً فَبَرَاَ وَ فِي الطَّرِيْقِ الْاُخْرى فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عُقَالٍ وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَالِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ حَتَّى مَاتَ.

অর্থ: "যায়েদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসা যাওয়া করত, যাকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন। সে তাঁকে যাদু করল, এরপর তা আনসারদের এক কূপে নিক্ষেপকরল। ঐ যাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পাচ্ছিলেন,

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত এ কষ্ট করেছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য দু'জন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর মাথার নিকট বসল আর অপর জন তাঁর পায়ের নিকট বসল। একজন ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি জান যে, তাঁর কি জন্য কষ্ট হচ্ছে? অপর জন উত্তরে বললো: অমুক ব্যক্তি যে আপনার নিকট আসা যাওয়া করত সে আপনার ওপর যাদু করেছে এবং অমুক আনসারীর কূপে তা নিক্ষেপ করেছে। যদি আপনি কোনো ব্যক্তিকে পাঠান, যে নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে দেখতে পাবেন যে যাদুর প্রভাবে ঐ কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে।

এরপর জিবরীল (আ) আসলো এবং তাঁকে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিলো আর বললো: ইহুদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে অমুক কূপে তা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী (রা)-কে পাঠালেন, আলী (রা) দেখতে পেল যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে, সে নিক্ষিপ্ত সূতা নিয়ে আসল, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললো: সূতার গিরাসমূহ খুলতে এবং সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করতে, তিনি আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন আর গিরাসমূহ খুলছিলেন এভাবে সমস্ত গিরা তিনি খুলে ফেললেন এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করায় তিনি বাঁধন মুক্ত হয়ে গেলেন, এ ঘটনার পরও ঐ ইহুদি লোকটি তার নিকট আসা যাওয়া করত কিন্তু এ বিষয়টি তিনি কখনো তাকে বলেননি, এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধও নেন নাই।" (তাবারানী: ২৭৬১)

৬. মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হবে ইনশা আল্লাহ।

عَنْ عَائِشَةَ: «اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اِشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَاَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ হতেন তখন নিজের শরীরে সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে ফুঁক দিতেন। আর যখন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তখন আমি তা তিলাওয়াত করে বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে মুছতাম।" (মুসলিম: ২১৯২)

৭. সূরা নাস এবং ফালাক ফযীলাত এবং সওয়াবের দিক থেকে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

অর্থ: "উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা কি জান যে, আজ রাতে আমার ওপর এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এমন আয়াত ইতঃপূর্বে আর কখনো আমি দেখি নাই, তার তা হলো সূরা নাস এবং ফালাক।" (মুসলিম: ১৯২৭)

২৭. সূরা ইখলাস, ফালাক এবং সূরা নাসের ফযীলাত

১. তাওরাত, যবুর ইঞ্জিল, এমনকি কুরআনেও সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের মতো ফযীলাতপূর্ণ কোনো সূরা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামগণকে প্রতিদিন শোয়ার সময় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَاَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ

ظَلَمَكَ " قَالَ: ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، اَمْلِكْ لِسَانَكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ " قَالَ: ثُمَّ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، اَلَا اُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا اُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ، لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ اِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيْهَا: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

অর্থ: "উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন: হে উকবা! যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর। যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। উকবা বিন আমির (রা) বলেন: আমি দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি বলেন: হে উকবা! তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ, নিজের পাপসমূহের জন্য অশ্রু ঝরাও এবং নিজের ঘরে বসে থাক। উকবা বিন আমির বলেন: আমি আবার তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন: হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাব না, যার অনুরূপ একটি সূরা তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয় নাই। শুনে রাখ তোমার যেন এমন কোনো রাত অতিবাহিত না হয় যেখানে তুমি এ সূরাসমূহ তিলাওয়াত কর নাই, আর তা হলো: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।" (আহমাদ: ১৭৪৫২)

২. সকাল সন্ধ্যা তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করা সমস্ত অসুস্থতা, পেরেশানী এবং কষ্ট মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ، وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ، نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَاَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: اَصَلَّيْتُمْ؟ فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ» فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَلَمْ اَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا

أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»

অর্থ: "খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মুষলধারে বৃষ্টি এবং অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খোঁজতে বের হলাম, যেন তিনি আমাদেরকে নামায পড়ান। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নামায পড়ে নিয়েছ? আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখন তিনি বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও, আমি উত্তর দিলাম না, তিনি আবার বললেন: উত্তর দাও। আমি তখন বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কী বলবো: তিনি বললেন: সূরা ইখলাস, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে তিলাওয়াত করবে আর তা তোমার সবকিছু থেকে যথেষ্ট হবে।" (আবু দাউদ: ৫০৮৪)

৩. রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক এবং ইখলাস তিলাওয়াত করা এবং উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত শরীরে মোছা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন তখন নিজের উভয় হাতের তালু একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করে শরীরের যতটুকু সম্ভব ততটুকু হাত দিয়ে মুছতেন, আর তিনি তা তিনবার করে করতেন।" (বুখারী ৫০১৭)

৪. সর্বপ্রকার শয়তান চক্রান্ত এবং ফিতনা, ধোঁকা অন্যান্য মুসিবত ও ব্যাথা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস থেকে উত্তম কোনো কিছু নেই।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ إِذْ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ، قُلْ فَاسْتَمَعْتُ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ، قُلْ فَاسْتَمَعْتُ» ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُوْلُ؟، فَقَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» فَقَرَأَ السُّوْرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ: «قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ «قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ

অর্থ: "উকবা বিন আমির আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সওয়ারীর পিঠে আরোহী ছিলাম। তিনি বললেন: হে উকবা বল: আমি তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলাম তখন তিনি আবার বললেন: হে উকবা বলো: আমি পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতি মনোযোগী হলাম। তিনি তৃতীয়বারে বললেন হে উকবা বলো: আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি কী বলবো: তিনি বললেন, সূরা ইখলাস এবং শেষ পর্যন্ত এ সূরা তিলাওয়াত করলেন এরপর সূরা ফালাক তিলাওয়াত করলেন এবং আমিও তাঁর সাথে তিলাওয়াত করলাম, এরপর তিনি সূরা নাস তিলাওয়াত করলেন, আমিও তার সাথে তিলাওয়াত করলাম, এমনকি তা শেষ করলাম, এরপর তিনি বললেন: কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জন্য এ তিন সূরা থেকে উত্তম কেনো সূরা নেই, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়।" (নাসায়ী: ৫৪৪৫)

কুরআনের কিছু সুরার মনগড়া ফযীলাত

সূরা নাস-এর ফযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া উক্তি :

(১) এই সূরাহ লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকারের বেদনা, যাদু ও বদ নযর দূর হয়। কাগজে লিখিয়া ছোট শিশুর গলায় বাধিয়া দিলে বদ নযর লাগিতে পারে না। হাকিমের নিকট যাইবার সময় পড়িলে তার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) জুময়ার নামাযের পর উপরোক্ত প্রত্যেকটি সূরাহ ৭ বার পড়িলে পরবর্তী জুময়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকা যায়।

(৩) সূরাহ নাস ও ফালাক ৪১ বার পড়িয়া যাদুগ্রস্ত লোকের ওপর কিংবা যে কোন রোগীর ওপর ৭ বার ফুঁক দিলে আরোগ্য লাভ হয়।

(৪) এই সূরাহ ১০০ কিংবা ১০০০ বার পড়িলে শয়তানি খেয়াল দূর হয়।

সূরা ফালাক্বের ফযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন'সহ কতক 'ওজীফা' গ্রন্থে মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) বালক-বালিকা, দাস-দাসী ও গরু-ঘোড়ার কানে এই সূরাহ পড়িয়া ফুঁক দিলে তাহাদের অবাধ্যতা ও অসৎ স্বভাব দূর হয়।

সূরা নাস্‌র সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' কিতাবে কতিপয় মনগড়া উক্তি ঃ

(১) এ সূরাহ আঙ্গের মধ্যে খোদাই করে জালের সাথে বেঁধে দিলে জালে অত্যধিক মাছ ধৃত হয়।

(২) এ সূরাহ কাঠের মধ্যে খোদাই করে দোকানে লটকাইয়া রাখলে গ্রাহক সংগ্রহ হয়।

সূরা কাওসার-এর ফযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) জুময়ার রাত্রে এই সূরাহ এক হাজার বার ও দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িলে স্বপ্নে রাসূল ﷺ -এর যিয়ারত লাভ হয়।

(২) নির্জন স্থানে বসিয়া ৩০০ বার পড়িলে শত্রু দমন হয় এবং শত্রুর ওপর জয় লাভ হয়।

(৩) রুযী বৃদ্ধি ও মান-ইজ্জত লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং জেল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক হাজার বার পড়িবে।

(৪) গোলাপ পানির ওপর পড়িয়া প্রত্যহ ঐ পানি চোখে দিলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

সূরা মাউন - এর ফযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) ব্যবহার্য দ্রব্যের ওপর এ সূরাহ পড়িয়া ফুঁ দিলে জিনিসপত্র নিরাপদ থাকে।

(২) যে ব্যক্তি যোহরের নামাযের পর এই সূরাহ ৪১ বার পড়িবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রুযী-রোযগার বৃদ্ধি করিবেন।

সূরা কুরাইশ-এর ফযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) দুশমনের ওপর জয় লাভের জন্য ফজরের নামাযের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া এক হাজার বার এই সূরা পড়িবে এবং পুনরায় একশত বার দরূদ

শরীফ পড়িবে ও শত্রুর ওপর জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। এই নিয়মে ৭ দিন পড়িবে।

(২) খাদ্যের ওপর এই সূরাহ পড়িয়া ফুঁক দিয়া খাইলে খাদ্যে কোন অজ্ঞাত খারাপ বস্তু থাকিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।

সূরা ফীল-এর ফযীলাত সম্পর্কে মন গড়া উক্তি :

(১) শত্রুর সম্মুখে এই সূরাহ পড়িলে শত্রুর ওপর জয় লাভ করা যায়।

সূরা ক্বদর-এর ফযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) কোন কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে এই সূরাহ পড়িয়া গেলে ঐ কাজে আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয়ও ফল শুভ হইয়া থাকে।

(২) এই সূরার আমল দ্বারা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

(৩) এক মুষ্ঠি আমন ধানের চালের ওপর ২১ বার এই সূরাহ পড়িয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের সামনে ছড়াইয়া রাখিবে। মোরগ ঘরে যাইবার সময় ঐ চাউল খাইতে থাকিবে। রাতকানা রোগী ঐ চাউল খাইবে। আল্লাহর ফযলে রাতকানা দোষ ভাল হইবে।

(৪) কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে প্রত্যত ফজরের সময় এই সূরাহ ৩ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ এই রোগে আক্রান্ত হইবে না।

(৫) সর্বদা এই সূরাহ পাঠ করিলে বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

(৬) যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই সূরাহ পড়িবে শত্রু ও বন্ধু সকলেই তাকে সম্মান করিবে।

(৭) নদীর তীরে বসিয়া এই সূরাহ পড়িতে থাকিলে নদী পার হওয়ার উপায় জুটিয়া যায়।

সূরা মুজ্জাম্মিল -এর ফযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) এই সূরা দৈনিক পাঠকারী রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখবে। কোন সময় পাপ কাজ করতে মন চাবে না। এই সূরা লিখে তাবীজ গলায় পড়লে কঠিন রোগ আরোগ্য হয়। কঠিন কার্যসমূহ সহজে সম্পন্ন হয়। যে কোন বিপদের সময় এই সূরা পড়লে বিপদ দূর হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) কোন লোক এই সূরা স্বপ্নে পাঠ করতে দেখলে তাহার মনোবাসনা পুরা হবে এবং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করবে। ইত্যাদি।

উল্লেখিত উক্তিগুলো দলীল প্রমাণহীন। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিহীন এসব মনগড়া ও মিথ্যা ফাযীলাত বর্জনীয়।

কুরআনের কিছু আয়াতের ফযীলাত

১. বিস্‌মিল্লাহ্‌র ফযীলাত

১. যে খাবার বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া হয় তাতে বরকত হয়।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ: "কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!" (সূরা রহমান: ৭৮)

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ، وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»

অর্থ: "ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা খাবার খাই কিন্তু তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন: সম্ভবত তোমরা আলাদা আলাদা হয়ে খাবার খাও, তারা বললো: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: তোমরা একত্রিত হয়ে খাবার খাও এবং খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে খাও, তিনি তোমাদের খাবারে বরকত দিবেন।" (ইবনে মাজাহ ৩১৬৬)

২. যে খাবার খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয় না, ঐ খাবারে শয়তান অংশ নেয় এবং তার বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে খাবারে বিসমিল্লাহ বলা হয় না ঐ খাবারে শয়তান অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।" (আবু দাউদ: ৩৭৬৮)

৩. রাতে শোয়ার আগে দরজা বন্ধ করার আগে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলে শয়তান ঐ দরজা খুলতে পারে না। যেখানে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা হয় শয়তান ওখানে হাত লাগাতে পারে না।

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا»

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা দরজাসমূহ বন্ধ রাখ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ কর, কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।" (বুখারী: ৩৩০৪)

৪. যে কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করা হয় সে কাজ শয়তান এবং জ্বিনদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকে।

শোয়ার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করার পূর্বে লাইট বন্ধ করার আগে এবং পাতিল ঢাকার আগে বিসমিল্লাহ্ বলা মোস্তাহাব।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْهُمْ ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا "

অর্থ: "জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন রাতে অন্ধকার হয়ে যায় তখন নিজের বাচ্চাদেরকে ঘরে আটকিয়ে রাখ। কেননা ঐ সময়ে শয়তান এবং জ্বিনেরা বিস্তার লাভ করে ইশার কিছুক্ষণ পর বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দাও, ঘরের দরজা বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ কর, লাইট বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ কর, পানির পাত্র বিসমিল্লাহ বলে ঢেকে রাখ, অন্যান্য পাত্রসমূহও বিসমিল্লাহ বলে ঢাক, আর পাত্র ঢাকার জন্য কোনো ঢাকনা না পেলে কোনো কিছু দিয়ে আড়াল করে রাখ।" (বুখারী: ৩২৮১)

৫. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে বের হলে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে বের হলে শয়তান দূরে সরে যায় এবং মানুষ তখন শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ حِيْنَئِذٍ: هُدِيْتَ، وَكُفِيْتَ، وَوُقِيْتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟ "

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয় এবং বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ (আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই।" তখন তার ব্যাপারে বলা হয় সকল বিষয়ে তুমি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমাকে হিফাযত করা হয়েছে। শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে তোমরা তার ওপর কীভাবে বিজয় হবে, যাকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, যাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।" (আবু দাউদ: ৫০৯৭)

৬. বিসমিল্লাহ্ বললে জ্বিন শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে না।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ، اَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ "

অর্থ: "আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বিসমিল্লাহ বললে জিনদের দৃষ্টি এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা পড়ে যায়, যখন তাদের কেউ পায়খানা পেশাবখানায় যায়।" (তিরমিযী: ৬০৬)

৭. বিসমিল্লাহ্ পাঠ করার কারণে মানুষ শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَاِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ

الشَّيْطَانُ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ "

অর্থ: "জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে আজ এখানে রাত্রি যাপন করা যাবে না, খাবারও খাওয়া যাবে না। আর যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান বলে আজ এখানে রাত্রি যাপন করা যাবে, আর খাবারের সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তখন বলে এখানে আজ রাত্রি যাপন করা যাবে এবং খাবারও খাওয়া যাবে।" (মুসলিম: ৫৩৮১)

৮. স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠকারী স্বামী-স্ত্রীর আল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন যেন বলে: আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ। যদি তাদের উভয়ের এ মিলনের মাধ্যমে কোনো সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে ঐ সন্তানকে কখনো শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারী: ৭৩৯৬)

৯. বিসমিল্লাহ বললে শয়তান লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়।

عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ، فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ

ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُوْلُ: بِقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ "

অর্থ: "একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর পেছনে সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করেছিলেন। হঠাৎ করে গাধাটি হোঁচট খেল তখন আমি বললাম: শয়তান ধ্বংস হোক, তিনি বললেন: এমন করে বল না যে, শয়তান ধ্বংস হোক, এতে শয়তান মর্যাদা পাবে এবং আনন্দে ঘরের সামনে উঁচু হবে, আর সে মনে করবে যে আমি তাকে ফেলে দেয়ার শক্তি রাখি, বরং বিসমিল্লাহ বললে তখন শয়তান লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হবে এমনকি মাছির সমান হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ: ৪৯৮৪)

১০. হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিসমিল্লাহ বললে আল্লাহ তখন আরাম দেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «أَنْتَ فَقَاتَلَ» ، حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ: «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، قَالَ: «كَمَا أَنْتَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنْتَ فَقَاتَلَ» ، حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَلِكَ، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ، حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ، حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ، فَقَالَ: حَسِّ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ»

অর্থ: "জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন, লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারো জন আনসারীর সাথে একাকী হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা) ছিলেন, মুশরিকরা তাদের ঘিরে নিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন কে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে? তালহা (রা) বললো: আমি তখন সে একাই এগারো জনের সমমানের যুদ্ধ করল এমনকি মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর এমনভাবে তরবারি চালাল যে তা ফিরাতে গিয়ে তালহা (রা)-এর আঙ্গুল কেটে গেল তখন সে ব্যথায় উহ! বললো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি (এর পরিবর্তে) বিসমিল্লাহ বলতে তাহলে তোমাকে ফেরেশতারা ওপরে তুলে নিত আর লোকেরাও তা দেখতে পেত। এরপর আল্লাহ মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন।" (নাসায়ী: ৩১৪৯)

২.ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলার ফযীলাত

বিপদাপদ এবং দুশ্চিন্তার সময় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বললে আল্লাহ স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

অর্থ: "এবং সেসব ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ প্রদান কর যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে:

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, এদের ওপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তিও করুণা হবে এবং এরাই সুপথগামী।" (সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ، فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ} اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ".

অর্থ: "উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যখন কোনো মুসলমানের ওপর কোনো মুসবিত আসে আর তখন সে আল্লাহর নির্দেশিত এ বাণী (আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব)। হে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার এ বিপদের বিনিময়ে আমাকে সাওয়াব দাও এবং এর চেয়ে উত্তম কিছু তার বিনিময়ে আমাকে দাও তখন আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেন।" (মুসলিমঃ ২১৬৫)

৩. তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য এ আয়াত বলার ফযীলাত

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: "এবং তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহা করুণাময় পরম দয়ালু।" এ আয়াত পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা কবুল করা হবে।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اِسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ} [اَلْبَقَرَةُ: 163] . وَفَاتِحَةِ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: {الٓمٓ اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} .

অর্থ: "আসমা বিনতু ইয়াযিদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণণা করেন, তিনি বলেনঃ আল্লাহর ইসমে আযম এ দু'টি আয়াতে রয়েছে, সূরা বাকারা ১৬৩ নং আয়াত

{وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ}

এবং সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু'আয়াতে

.{الٓمٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ}

(আবু দাউদ: ১৪৯৮)

৪. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন............" বলা এবং এ দু'আর ফযীলাত

সূরা বাকারার এ আয়াতের মাধ্যমে বেশি বেশি করে দু'আ করলে ইহকাল এবং পরকালে কল্যাণ লাভ হয়।

عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিকাংশ দু'আ ছিল হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা বাকারা ২০১, বুখারী ৬৩৮৯)

৫. আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত

১. আয়াতুল কুরসী কুরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের চেয়ে ফযীলাতপূর্ণ।

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا اَبَا الْمُنْذِرِ، اَتَدْرِي اَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ اَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: «يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِي اَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ اَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: {اَللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} [الْبَقَرَةُ: 255]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ»

অর্থ: "উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে আবুল মুনযির তুমি জান আল্লাহর কিতাব (কুরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন্ আয়াতটি অধিক ফযীলাত পূর্ণ? বর্ণনাকারী বললেন: আমি বললাম, আল্লাহএবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বললেন: হে আবুল মুনযির! তুমি জান আল্লাহর কিতাব (কুরআনের) মধ্য থেকে তোমার নিকট কোন আয়াতটি অধিক ফযীলাতপূর্ণ? বর্ণনাকারী বললেন: আমি বললাম, আয়াতুল

কুরসী, তিনি আমাকে সাবাস জানিয়ে আমার বুকে হাত রাখলেন এবং বললেন: হে আবুল মুনযির তোমার জ্ঞানে বরকত হোক।" (মুসলিম: ১৯২১)

عَنْ ابْنِ الْاَسْقَعِ، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِي صُفَّةِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَاَلَهُ اِنْسَانٌ: اَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}

অর্থ: "ইবনে আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: তিনি মুহাজিরগণের মধ্যে সুফ্ফাবাসীদের অবস্থানস্থলে আসলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলাতপূর্ণ আয়াত কোনটি? তিনি বললেন: আয়াতুল কুরসী। (আবু দাউদ: ৪০০৫)

২. শোয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয় যে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর দিক থেকে তাকে সংরক্ষণ করতে থাকে এমনকি শয়তানের খারাপ চক্রান্ত যেমন: কুপ্রবঞ্চনা, যাদু, ভয় ইত্যাদি থেকেও সংরক্ষণ করে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَاَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَاَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: «اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُوْدُ» . فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ سَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَاَخَذْتُهُ،

فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [اَلْبَقَرَةُ: 255]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ الْقَيُّوْمُ} [اَلْبَقَرَةُ: 255]، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের ফিতরা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি এসে

মুষ্ঠিভরে ভরে ফিতরার মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে আটকিয়ে বললাম: আমি যে কোনোভাবে তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব, সে বললো: আমি গরিব মানুষ, স্ত্রী আছে আমি অভাবের মধ্যে আছি তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তাতে ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন আবু হুরাইরা গত রাতে তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তার অভাবের কথা এবং স্ত্রী সন্তানের কথা বলেছিল তাই আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি নিশ্চিত হলাম যে আবার আসবে, তাই আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম, সে আসল এবং ফিতরার মাল থেকে মুষ্ঠি ভরে ভরে নিতে লাগল আমি আবার তাকে আটক করলাম এবং বললাম: এখন আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব, সে বললো: আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী আমার পরিবার পরিজন আছে, ভবিষ্যতে আর আসব না, আমি দয়া করে তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবু হুরাইরা তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সে তার মারাত্মক অভাবের কথা বললো, তার পরিবার-পরিজনের চাহিদার কথা বললো, আমি দয়ার বশবর্তী হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন: সতর্ক থাক, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে, তাই আমি তৃতীয়বার তার আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম, সে আসল এবং আবার ফিতরার মাল মুষ্ঠি ভরে নিতে লাগল, আমি তাকে আটক করলাম এবং বললাম: আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব, এটা তিনবারের শেষবার। প্রত্যেক বার তুমি ওয়াদা কর যে, আসবে না। কিন্তু তুমি আবার চলে আস, সে বললো: আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন, কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ কথাগুলো কী? সে বললো: যখন তুমি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাহলে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসবে না। একথা শুনে আমি তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গতরাতে তোমার বন্দীর কী করলে? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে বললো: যে আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঐ কথাগুলো কী? আমি বললাম: সে বলেছে যে, যখন তুমি রাতে বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা রাতব্যাপী তোমাকে

সংরক্ষণ করবে, আর শয়তান তোমার নিকট আসবে না। সাহাবাগণ যেহেতু ভালো এবং কল্যাণের কাজে উৎসাহী ছিলেন, তাই তিনি আবু হুরাইরা (রা) কে কিছু বললেন না, বরং বললেন: সে তোমাকে সত্য কথা শিখিয়েছে কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক। তুমি কি জান গত তিন রাত ধরে তোমার নিকট কে আসত? আবু হুরাইরা (রা) বললো: না, তিনি বললেন: সে হলো শয়তান।" (বুখারী: ২৩১১)

৩. আয়াতুল কুরসী শয়তানের নিকৃষ্ট ফিতনা থেকে রক্ষার মাধ্যম।

عَنِ ابْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ اَبِيْهِ , اَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ فِيهِ تَمْرٌ فَكَانَ أُبَيٌّ يَتَعَاهَدُهُ فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا دَابَّةٌ شِبْهُ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ قَالَ: فَسَلَّمْتُ , فَرَدَّ السَّلَامَ , فَقُلْتُ: مَنْ اَنْتَ اَجِنٌّ اَمْ اِنْسٌ؟ قَالَ: لَا , بَلْ جِنٌّ , قُلْتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ , قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ. قَالَ لَهُ أُبَيٌّ: اَهَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ اَشَدُّ مِنِّي , قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا اَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. فَاَحْبَبْنَا اَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: مَا الَّذِي يُحَرِّزُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ , فَغَدَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبِيثُ»

অর্থ: "উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তার একটি খেজুরের গুদাম ছিল, একদা তিনি খেজুরের মধ্যে কিছুটা কমতি অনুভব করলেন, তাই রাতে তিনি তা পাহারা দিতে বসে গেলেন, হঠাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের ন্যায় একটি ছেলে এসে সালাম দিল, উবাই (রা) সালামের উত্তর দিল এবং জিজ্ঞেস করলো তুমি জ্বিন না মানুষ? সে উত্তরে বললো: আমি জিন। উবাই বিন কা'ব (রা) বললো: তোমার হাত দেখাও? তিনি হাতের দিকে তাকালেন তখন দেখলেন যে তার হাত কুকুরের হাতের ন্যায়, কুকুরের ন্যায় শরীরে পশমও ছিল। উবাই বিন কা'ব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনেরা কি এ আকৃতিরই? সে উত্তরে বললো: হ্যাঁ। আর জিনেরা জানে যে, তাদের মধ্যে আমার মতো শক্তিধর আর কেউ নেই। উবাই (রা) জিজ্ঞেস করল এখানে কী জন্য এসেছ? জ্বিন উত্তরে বললো: আমরা জেনেছি যে, তুমি দান করা পছন্দ কর। তাই তোমার খাদ্যে আমাদের অংশ নিতে এসেছি।

উবাই বিন কা'ব জিজ্ঞেস করল আমাদেরকে অর্থাৎ মানুষকে কোন জিনিস তোমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে সে বললো: সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতে পার? উবাই (রা) বললো: হ্যাঁ পড়তে পারি। জ্বিন বললো: যখন তুমি সকালে তা পাঠ করবে? তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে এবং সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত আমাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে উবাই বিন কা'ব (রা) বলেন: সকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি খুলে বললাম, তিনি তা শুনে বললেন: খবিস (শয়তান) সত্য বলেছে।" (হাকিম ২০৬৪)

৪. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করা জান্নাত লাভের কারণ।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ»

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে দূরত্ব থাকে শুধু মৃত্যু।" (নাসায়ী: ৯৯২৮)

* আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত সংক্রান্ত দূর্বল ও জাল হাদীস

১. আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনু 'ইমরানের নিকট ওয়াহী করেন যে, তুমি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। যে ব্যক্তি এটা করবে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর ও যিক্‌রকারী জিহবা দান করবো এবং তাকে নবীদের পূন্য ও সিদ্দীকদের আমল প্রদান করবো...।

খুবই মুনকার : তাফসীরে ইবনু মারদুবিয়া, ইবনু কাসীর।

২. একদা একটি জ্বিন 'উমার (রা)-এর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'উমার (রা)- কে বললো, যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বাড়ি থেকে শয়তান গাধার মত চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়।

দুর্বল : কিতাবুল গারীব, এর সানাদ মুনকাতি, বিচ্ছিন্ন।

৩. আয়াতুল কুরসী হলো, কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

হাদীস দুর্বল : আহমাদ, যঈফ আল-জামি'। শায়খ আলবানী, হায়সামী ও হাফিয (রহ) এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন।

৪. আয়াতুল কুরসী হলো, সমস্ত আয়াতের প্রধান (নেতা)।

হাদীস দুর্বল : হাকিম, তিরমিযী, যঈফ আল-জামি' হা/ ৪৭২৫। ইমাম তিরমিযী, শায়খ আলবানী ও অন্যরা একে দুর্বল বলেছেন

৫. যে ব্যক্তি সূরাহ হা-মীম আল-মু'মিন 'ইলাইহিল মাসীর' পর্যন্ত (১-৩ আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকলে পাঠ করবে, সে এর উসিলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।

দুর্বল হাদীস : তিরমিযী হা/২৮৭৯। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৬. যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে এবং যাফরান রংয়ের দ্বারা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে লিখে জিহবা দিয়ে চাটবে সে কখনো ভুলবে না।

বানোয়াট।

৭. যে ব্যক্তি উযুসহ চল্লিশবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ৪০ বছরের সওয়াব দান করবেন এবং ৪০ টি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং ৪০ জন হুরের সাথে তার বিবাহ দিবেন।

বানোয়াট : হাদীসের সানাদে মাকাতি ইবনু সুলাইমান মিথ্যুক।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত সম্পর্কে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) দৈনিক ফজরের আগে একবার পাঠ করলে তার রোজগারে বরকত ও রুজী বৃদ্ধি হবে। এ আয়াত যে কোন নিয়তে বাইরে যাবার পূর্বে পাঠ করে বের হলে তার উদ্দেশ্য পূরা হবে।

(২) এক গ্লাস বৃষ্টির পানিতে ইহা পঞ্চাশ বার পাঠ করে প্রতিবারে ফুঁক দিয়ে পান করলে মেধা শক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা পুস্তকে এসব মিথ্যা ফাযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ মিন জালিকা।

৬. সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াতের ফযীলাত

১. রাতে শোয়ার সময় সূরা বাকারার সর্বশেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াতকারী সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَاَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

অর্থ: "আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার আগে সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" (বুখারী: ৫০৪০)

২. সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত যাদুর আসরকে দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর।

যে ঘরে একাধারে তিনরাত সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করা হবে শয়তান ঐ ঘরের কাছেও আসতে পারবে না।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَاَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ" قَالَ عَفَّانُ: "فَلَا تُقْرَأَنَّ"

অর্থ: "নুমান বিন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা আকাশ এবং যমীন সৃষ্টি করার দু হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছেন, তার মধ্য থেকে দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে সূরা বাকারা শেষ হয়েছে। যদি এ আয়াত কোনো ঘরে একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হয় তাহলে কোনো শয়তান ঐ ঘরের পাশেও আসবে না।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৮৪১৪)

৩. সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত পাঠ করে আল্লাহর নিকট যে প্রয়োজনের কথা পেশ করা হয় তা তিনি পূর্ণ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ

فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَسَلَّمَ ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ "

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় সে ওপর থেকে জোরে দরজা খোলার আওয়ায শুনতে পেল, সে ওপরের দিকে মাথা উঠাল এবং নবী ﷺ কে বললো: এটা আকাশের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা, যা ইতঃপূর্বে আর কখনো খোলা হয় নাই। আর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করবে, যে ইতঃপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে নাই। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম দিয়েছে এবং বলছে আপনার জন্য দু'টি বরকতময় নূরের সুসংবাদ, আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এ নূর দেয়া হয় নাই, আর তা হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত, যে ব্যক্তি এ দু আয়াত পাঠ করবে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে। (মুসলিম: ১৯২৩)

*** বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াতের ফযীলাত সংক্রান্ত দূর্বল হাদীস**

কুরআনের এমন দুটি আয়াত রয়েছে যে আয়াত দুটি (ক্বিয়ামাতে) শাফাআত করবে এবং সেই আয়াত দুটি আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়। তা হলো, সূরাহ বাক্বারাহ্‌র শেষের দুই আয়াত।

অত্যন্ত দুর্বল : দায়লামী। হাফিয ইবনু হাজার ও শায়খ আলবানী এর সানাদকে খুবই দুর্বল বলেছেন।

৭. সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াতের ফযীলাত

তাহাজ্জুদের জন্য উঠার পর ওযু করার পূর্বে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ،

اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একরাতে তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মাইমুনা (রা)-এর বাড়িতে ছিলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমি বিছানার প্রস্থে শুয়েছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী বিছানার দৈর্ঘ্যে শুয়েছিলেন, প্রায় অর্ধরাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বসে বসে স্বীয় হাত দিয়ে চেহারায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এরপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, এরপর দাঁড়িয়ে পানির ঝুলানো পাত্রের নিকট গেলেন, ভালো করে অযু করলেন, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমিও উঠলাম এবং সবকিছু শেষ করলাম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন।" (বুখারী: ১৮৩)

৮. 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হা কা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালিমীন' বলার ফযীলাত

'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোলেমীন' বলে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ"

অর্থ: "সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মাছওয়ালা (ইউনুস আ.) যখন মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দু'আ করল যে 'আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই (উদ্ধারকারী নেই), আপনি পবিত্র, মহান, আমি তো যালিম- সীমালজ্ঘনকারী।' (সূরা আম্বীয়া: ৮৭)

এ আয়াত পাঠ করে যখনই কোনো মুসলমান দু'আ করবে তখন আল্লাহ তার দু'আ কুবল করবেন।" (তিরমিযী: ৩৫০৫)

৯. সূরা হাদীদের ৩নং আয়াতের ফযীলাত

যদি শয়তান মনের মধ্যে কোনো কুপ্রবঞ্চনা সৃষ্টি করে বা কোনো ব্যক্তির ওপর শয়তান জ্বিন আছর করে তাহলে সূরা হাদীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উচিত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি তোমার মনের মধ্যে কোনো খটকা লাগে তাহলে তুমি পড় তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা হাদীদ: ৩, আবু দাউদ: ৫১১২)

কুরআনের কিছু বাক্যের ফযীলাত

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফযীলাত

১. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার ফযীলাত ।

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَآ اِلَٰهَ اِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)-এর অর্থের প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখে সে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম: ১৪৫)

৫. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এ স্বীকৃতি কিয়ামাতের দিন সুপারিশ লাভের কারণ হবে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَآ اِلَٰهَ اِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، اَوْ نَفْسِهِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ পাওয়ার সর্বাধিক সৌভাগ্যবান সে, যে ব্যক্তি তার মন বা প্রাণ থেকে একনিষ্ঠভাবে বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই)।" (বুখারী: ৯৯)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتّٰى تُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কখনো কোনা বান্দা তার অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই) একথা বললে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আর সে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।" (তিরমিযী: ৩৫৯০)

৬. **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোত্তম যিকর।**

عَنْ جَابِرٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম যিকর হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই) একথা বলা এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো (আলহামদু লিল্লাহ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথা বলা।" (ইবনে হিব্বান: ১৪৯৭)

৭. **একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।**

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ، وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ "

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মিরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ আপনার উম্মাতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিয় সুমিষ্ট, তবে তার ফাঁকা ময়দানের বৃক্ষ হলো সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" (তিরমিযী: ৩৪৬২)

৫. মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে।" (আবু দাউদ: ৩১১৮)

২. সুবহানাল্লাহ বলার ফযীলাত

১. একশত বার সুবহানাল্লাহ বললে এক হাজার নেকী হাসিল হবে এবং এক হাজার পাপ মোচন হবে।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ»

অর্থ: "মুসআব বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা। তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম, তিনি বললেন: তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী হাসিল করতে অপারগ? উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কোনো একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের কেউ কীভাবে একহাজার নেকী হাসিল করবে? তিনি

বললেন: একশতবার সুবহানাল্লাহ বলবে, তখন তার জন্য এক হাজার নেকী লিখা হবে এবং একহাজার পাপ মোচন করা হবে।" (মুসলিম: ৭০৭২)

২. সুবহানাল্লাহ পাঠের সামান্য একটি আমল অন্যদীর্ঘ আমলের সাওয়াবের তুলনায় অনেক বেশি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ"

অর্থ: "জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন তখন জুয়াইরিয়া তার নামাযের স্থানে বসে ছিল, এরপর তিনি চাশতের সময় যখন ফিরে আসলেন তখনো জুয়াইরিয়া নামাযের স্থানে বসে বসে তাসবিহ পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর চারটি কথা তিনবার বলেছি, যদি ঐ কথাগুলো তোমার আজকের সারাদিনের তাসবীর সাথে ওযন করা যায় তাহলে ঐ চারটি কথার ওযনই বেশি হবে। আর ঐ কথাগুলো হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালকিহি (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টি জিনিসসমূহের সংখ্যার সমান), ওয়া রিদা নাফসিহি, (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর নিজের সন্তুষ্টি সমান), ওয়া যিনাতা আরশিহি, (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর আরশের ওযনের সমান), ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ)।" (মুসলিম: ৭০৮৮)

৩. আলহামদুলিল্লাহর সাথে সুবহানাল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের সবকিছুকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

অর্থ: "আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ, আর একবার আলহামদু লিল্লাহ বলা পাল্লাকে নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদু লিল্লাহ বলা আকাশ ও যমিনের মাঝের স্থানকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায নূর (আলো), সাদকা দলিল, ধৈর্য আলো, কুরআন মাজীদ কিয়ামতের দিন হয় তোমার পক্ষে, অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তার জান বন্ধক থেকে যায়, কেউ নেক আমলের মাধ্যমে তা মুক্ত করে, আবার কেউ পাপাচারের মাধ্যমে তা ধ্বংস করে।" (মুসলিম: ৫৫৬)

৩. আলহামদু লিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ বলার ফযীলাত

১. একবার সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং একবার আল হামদু লিল্লাহ নেকী দিয়ে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ، وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ "

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মিরাজের রাতের সফরে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ আপনার উম্মাতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানিয় সুমিষ্ট, তবে তার ফাঁকা ময়দান এর বৃক্ষ হলো সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" (তিরমিযী: ৩৪৬২

২. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সর্বোত্তম কথা হলো আলহামদুলিল্লাহ বলা।

عَنْ جَابِرٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সর্বোত্তম যিকর হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই। একথা বলা এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো (আলহামদু লিল্লাহ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথা বলা।" (ইবনে হিব্বান: ১৪৯৭)

৩. নাবালিগ সন্তানের মৃত্যুতে আলহামদু লিল্লাহ বললে একটি ঘর নির্মিত হয়।

عَنْ اَبِي مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ "

অর্থ: "আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন মু'মিন ব্যক্তির কোনো সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করেছ? তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতাগণ বলেন: সে আলহামদু লিল্লাহ বলেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর আর তার নাম রাখ বাইতুল হামদ (প্রশংসার ঘর)।" (তিরমিযী: ১০২১)

৪. যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলার ফযীলাত

দু'আর শুরু তে যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলা দু'আ কবুলের কারণ।

عَنْ اَنَسٍ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "

অর্থ: "আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, দু'আ করার সময় 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' এ বাক্যটি অবশ্যই বলবে।" (তিরমিযী: ৮১৪)

৫. হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল বলার ফযীলাত

দুশ্চিন্তা এবং বিপদাপদের সময় এ দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা দূর করেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، «قَالَهَا اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» حِيْنَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}

অর্থ: " আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম যিম্মাদার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন লোকেরা বলেছিল যে, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে যে সব লোকেরা সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর, এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তখন তিনি এ দু'আ করেছিলেন।" (বুখারী: ৪৫৬৩)

নোট: উহুদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, আগামী বছর তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে, কিন্তু ঐ বছর মক্কায় অভাব অনটন ছিল, তাই আবু সুফিয়ান যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য গোপন চক্রান্ত চালাল, এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাল যে, লোকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল যে, কুরাইশরা মক্কায় বিরাট জনবল একত্রিত করেছে, যার মুকাবিলা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিল তখন পূর্বে উল্লিখিত প্রচারণার কারণে দুর্বলতা প্রকাশ করল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হওয়ার ব্যাপারে অনড় থাকলে মুসলমানরা শক্তি পেল এবং সাহাবাগণকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন কিন্তু আবু সুফিয়ান মুকাবিলা করার সাহস না পেয়ে দু হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল।"

পবিত্র কুরআনের দ্বারা আরোগ্য (শিফা) লাভ ও তদবীর

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে নিম্নোক্ত তিনটি স্থানে আরোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষথেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭)

وَاٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اِسْرَائِيْلَ اَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِي وَكِيْلاً.

"আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তা বনি ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছি। যেন তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কোনো কর্মবিধায়ক না বানাও।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ.

"বল, এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৪১:৪৪)

কুরআন মাজীদ মানবজাতির অন্তরের সমস্ত রোগ, যেমন: শিরক, কুফর, মুনাফিকী, লৌকিকতা, হিংসা, রাগ, ঘৃণা, শত্রুতা ইত্যাদির জন্য বিরাট আরোগ্য, যেমন সূরা ইউনুসের আয়াতটিতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সূরা বনি ইসরাঈল এবং সূরা হা-মীম সাজদার আয়াতে কুরআন মাজীদকে সার্বিক আরোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় যে কুরআন মাজীদ শারীরিক রোগসমূহের জন্যও আরোগ্য। অনেক হাদীস থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অন্তরের রোগসমূহের আরোগ্যের কথাতো বিগত পৃষ্ঠাসমূহে আলোচনা হয়েছে যে, "কুরআন মাজীদ সরাসরি পথ প্রদর্শক" এ শিরোনামে আলোচনা হয়েছে, এখন আমরা শারীরিক রোগসমূহের আরোগ্য এ ব্যাপারে আলোচনা করব।

যদিও আলিমগণ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতকে অসংখ্য রোগের চিকিৎসা হিসেবে

বর্ণনা করেছেন, যার আমি প্রতিবাদ করছি না, আবার সমর্থনও করছি না, অবশ্য আমি এখানে শুধু এমন রোগের কথা আলোচনা করব যার চিকিৎসা সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

১. অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসাঃ দ্রুত হৃদকম্পন দূর করার জন্য কুরআন মাজীদ বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করা উচিত, আল্লাহর বাণীঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরা রাআদ ১৩:২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কুরআন তিলাওয়াতকারীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি অবতীর্ণ হয়।" (মুসলিম)

তাই কুরআন মাজীদ বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করা অন্তরের সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য।

২. কুরআন মাজীদ বেশি বেশি তিলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মুনাফিকী, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, কৃপণতা, সন্দেহ, কুপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি থেকে আরোগ্য।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থঃ "হে মানবজাতি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত।" (সূরা ইউনুসঃ ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلاَّ خَسَاراً.

অর্থঃ "আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মু'মিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ.

অর্থঃ "বলঃ মু'মিনদের জন্যে এটা পথ নির্দেশ এবং ব্যধির প্রতিকার।" (সূরা সাজদা ৪১:৪৪)

৩. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা এবং শ্রবণ করা মনের দুশ্চিন্তা, খটকা, ভয়-ভীতি পেরেশানী ইত্যাদির আরোগ্য।

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ: "আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রাদ: ২৮)

৪. সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে জাদুর প্রভাব দূর হয়:

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ فِي بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُوْدَانِهِ، فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَاَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ الْاَنْصَارِيِّ، فَلَوْ اُرْسِلَ رَجُلٌ، وَاَخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ "، قَالَ: «فَبَعَثَ رَجُلًا فَاَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فَبَرَاَ. جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ الَّلَامُ نَنْزَلَ عَلَيْهِ الْمَعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ : اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ وَالسَّحْرُ فِيْ بِئْرِ فُلَانٍ قَالَ : فَبَعَثَ رَجُلًا وَفِيْ اُخْرى فَبَعَثَ عَلِيًّا (رض) فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدْ اَصْفَرَ فَاَخَذَ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعَقْرَاُ اٰيَةً يَقْرَاُ وَيَحِلُّ الْعَقْدَ فَجَاءَ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَحِلَّ الْعَقْدَ وَيَقْرَاُ اٰيَةً فَجَعَلَ يَقْرَاُ وَيَحِلُّ فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عَقْدَهُ وَجَدَ ذَالِكَ خِفَّةً فَبَرَاَ وَ فِي الطَّرِيْقِ الْاُخْرٰى فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عُقَالٍ وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَالِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ حَتّٰى مَاتَ.

অর্থ: "যায়েদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসা যাওয়া করত, যাকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন।

সে তাঁকে যাদু করল, এরপর তা আনসারদের এক কূপে নিক্ষেপ করল। ঐ যাদুর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পাচ্ছিলেন, আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত এ কষ্ট করেছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য দু'জন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর মাথার নিকট বসল আর অপর জন তাঁর পায়ের নিকট বসল। একজন ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করল যে, অমুক ব্যক্তি যে আপনার নিকট আসা যাওয়া করত সে আপনার ওপর যাদু করেছে এবং অমুক আনসারীর কূপে তা নিক্ষেপ করেছে। যদি আপনি কোনো ব্যক্তিকে পাঠান, যে নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে দেখতে পাবেন যে যাদুর প্রভাবে ঐ কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে।

এরপর জিবরীল (আ) আসলো এবং তাঁকে সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিলো আর বললো: যে ইহুদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে অমুক কূপে তা আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, অন্য এক বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী (রা) কে পাঠালেন, আলী (রা) দেখতে পেলো যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে, তিনি নিক্ষিপ্ত সূতা নিয়ে আসলো, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললো: সূতার গিরা খুলতে এবং সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করতে, তিনি আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন এবং গিরাসমূহ খুলছিলেন এভাবে সমস্ত গিরাসমূহ তিনি খুলে ফেললেন এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করায় তিনি বাঁধন মুক্ত হয়ে গেলেন, এ ঘটনার পরও ঐ ইহুদি লোকটি তার নিকট আসা যাওয়া করত কিন্তু এ বিষয়টি তিনি কখনো তাকে বলেননি, এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধও নেন নাই।" (তাবারানী: ২৭৬১)

৫. খারাপ স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত পাঠ করা উচিত।

عَنْ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: «اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَاَى رُؤْيَا فَكَرِهَ

مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً، فَلْيُبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ»

অর্থ: "আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যেটা তার নিকট খারাপ মনে হয় তখন জাগ্রত হওয়ার পর বাম দিকে থুথু ফেলবে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না, আর এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না। আর যদি কেউ কোনো ভালো স্বপ্ন দেখে তাহলে তার খুশি হওয়া উচিত এবং নিজের কল্যাণকামী ব্যতীত অন্য কাউকে তা না বলা উচিত।" (মুসলিমঃ ৬০৩৯)

খারাপ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে বাঁচার চিকিৎসাঃ যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিন বার বাম দিকে থুথু ফেলবে, এরপর নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পাঠ করবেঃ রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শাইয়াত্বিন ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আই ইয়াহদুরুন। (সূরা মু'মিনুনঃ ৯৭-৯৮)

বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম। (মুসলিম)

উল্লিখিত দু'আ পাঠকারী ব্যক্তি খারাপ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে ইনশা আল্লাহ।

৫. কুরআন মাজীদের নিচের আয়াতগুলো আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُوْنِ

"হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং হে আমার পালনকর্তা। আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:৯৭-৯৮)

এতদ্ব্যতীত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

৬. বিষাক্ত জন্তুর দংশনের চিকিৎসাঃ বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (বুখারী ৫০০৭)

এবং সূরা কাফিরূন, নাস, ফালাক তিলাওয়াত করে ততক্ষণ ঝাড়ফুঁক করা যতক্ষণ না সুস্থতা অনুভব করবে। (ত্বাবারানী)

৭. পাগল, মৃগী, ভূত ইত্যাদির চিকিৎসাঃ পাগল, মৃগী ভূত ইত্যাদির জন্য সকাল সন্ধ্যা তিন বার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (আবু দাউদ ৩৪২২)

৮. সমস্ত রোগের চিকিৎসাঃ যেকোনো রোগে সূরা ফাতিহা বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তা তিনি দেন। (মুসলিম)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতও এ ধরনের উপকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে যা কিছু চাওয়া হয় আল্লাহ তা দেন। (মুসলিম)

সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে সূরা ইখলাস, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করা উচিত। (আবু দাউদ)

৯. মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট লাঘবের আমলঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে যিয়ারতকারীদের উচিত সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে তাকে ঝাড়ফুঁক করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর সময় আয়েশা (রা) সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন। (বুখারী)

১০. চোখ লাগা থেকে রক্ষার আমলঃ চোখ লাগা থেকে সুস্থতার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক তিলাওয়াত করে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করা। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দু'আ পাঠ করে দুষ্টু জ্বিন এবং মানবের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতেন, কিন্তু যখন সূরা নাস এবং ফালাক অবতীর্ণ হলো তখন তিনি অন্যান্য দু'আসমূহ বাদ দিলেন এবং এ উভয় সূরা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ বিভিন্ন অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার দু'আসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো সূরা নাস এবং ফালাক। (আবু দাউদ)

১১. শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার চিকিৎসাঃ শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ গুরুত্বের সাথে আমল করা উচিত।

১. বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। (আবু দাউদ)

২. আয়াতুল কুরসী। (বুখারী)

৩. রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শাইয়াত্বিনি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম।

৪. সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে স্বীয় ডান পার্শ্বে তিন বার থুথু ফেলবে। (আবু দাউদ)

৫. সূরা নাস এবং ফালাক। (তিরমিযী)

৬. হুয়াল আউয়্যালু ওয়াল আখিরু ওয়াযযাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়াহুয়া বিকুল্লি শায়য়িন আলীম। (আবু দাউদ)[১]

১২. যাদুর চিকিৎসা : যাদু করা এবং যাদু করানো কুফরী, এরপরও ইদানিং তা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এটা যে কুফরী কাজ সেদিকে মানুষের মোটেও কোনো দৃষ্টি নেই। পাপের আধিক্য, পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ইত্যাদি তার মূল কারণ। যাদুর মূল সম্পর্ক হয় দুষ্ট জ্বিনদের সাথে, তাই যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করার আগে আমি দুষ্ট জ্বিনদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জ্বিনদেরকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে কোমলময় সৃষ্টি, যাদের দেখা যায় না, তাদেরকে অনুভব হয়, মানুষের মতো জ্বিনেরাও ঈমান আনতে নির্দেশিত হয়েছে, তাই পরকালে তাদের শান্তি এবং শাস্তি হবে। তাদের মধ্যে ঈমানদাররাও আছে যারা বিনা কারণে মানুষকে কষ্ট দেয় না, বরং কিছু সৎ এবং ভালো জ্বিন মানুষের কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে থাকে এবং মানুষের ভুলসমূহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা ফাসিক ফাজির জ্বিন তারা মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। এ সমস্ত ফাসিক ফাজির জ্বিনদেরকে সাধারণত শয়তান বলা হয়, যাদুকর তার নিকৃষ্ট ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য ঐ সমস্ত শয়তান জ্বিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে।

সাধারণত: জ্বিনেরা অনাবাদী এলাকায় জীবন যাপন করে। উন্মুক্ত ভূমি, মরুভূমি, জঙ্গল, পাহাড়ে তারা জীবন যাপন করে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় মানব অধ্যুষিত অঞ্চলের আবর্জনাময় স্থান যেমন পায়খানা ইত্যাদিতেও জ্বিনেরা থাকে, এমন স্থান যেখানে আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, নামায, মাসনুন দু'আ আদায় না করা হয়, যেখানে গান বাজনা বা যেখানে বেপর্দা নারী, উলঙ্গ বা অর্ধালুঙ্গ ছবি থাকে সেখানে দুষ্ট জ্বিনেরা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। বে-হায়াপনা এবং অশ্লীলতা পূর্ণ স্থানেও দুষ্ট জ্বিনেরা আশ্রয় নেয়, জ্বিনদের মধ্যে মানুষের ন্যায় নারী-পুরুষ আছে, মানুষের ন্যায় তাদের মাঝেও বিয়ে-শাদী হয়ে থাকে এবং প্রসবের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। মানুষের ন্যায় তারাও মৃত্যুবরণ করে থাকে।

দুষ্ট জ্বিনদের নিকট কিছু প্রিয় বিষয় এবং প্রিয় কাজ নিম্নরূপ:

১. কুফর ও শিরকের কেন্দ্রসমূহ। যেমন: মাজার এবং খানকা।

২. গান-বাজনা এবং নাচগানের কেন্দ্রসমূহ।

৩. নারীদের একা একা ঘর থেকে বের হওয়া।

৪. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে একাকীত্ব হওয়া।

৫. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে সংমিশ্রিত বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।

উল্লেখ্য: যাদুর চিকিৎসাকারী আলিমগণের মতে, নারীদের খোলা চুল, লাল ঠোঁট, লম্বা নখ দুষ্ট জ্বিনদের নারীদের নিকট দ্রুত উৎসাহিত হওয়ার কারণ।

৬. ঝগড়া, মারামারি, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া।

৭. মানুষকে হারাম সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করা।

৮. মানুষকে কুফরী, শিরক এবং অন্যান্য অন্যায় কাজে লিপ্ত করে।

৯. বিসমিল্লাহ না বলে খাবার গ্রহণ শুরু করলে তাদের খাবারে অংশ নেয়া।

১০. নাপাক জিনিস যেমন: হায়িয-নিফাসের রক্ত, নাপাক স্থান। যেমন: পায়খানা।

১১. নবজাতক শিশুকে কষ্ট দেয়া।

১২. গর্ভধারণকারী নারীকে কষ্ট দেয়া।

১৩. স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় অংশ নেয়া (সুন্নাতী দু'আ পাঠ না করার কারণে)।

উল্লেখ্য: আল্লাহ জ্বিনদেরকে কিছু অস্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন। যেমন: নিজের ইচ্ছামত বিচরণ করা, উন্মুক্ত স্থানে উড়া, বিভিন্ন রকম আকৃতি ধারণ করা, মানব শরীরে রক্তের ন্যায় প্রবেশ করা, মানুষের চিন্তা ও চেতনায় কুপ্রবঞ্চনা দেয়া, মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জ্বিনদেরকে মানুষের তুলনায় বেশি শক্তি এবং ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু এর সাথে সাথে মানুষকেও আল্লাহ তাদের ওপর এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তারা যখন যেখানে চায় সেখানে আল্লাহর নিকট শয়তানের কুকামনা থেকে আশ্রয় এবং সাহায্য চাইতে পারে। সাহায্য এবং আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে আল্লাহ সাহায্য এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন। যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করা মূলতঃ শয়তান জ্বিনদেরকে পরাভূত করা, যা আল্লাহর সাহায্য এবং আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য নিম্নোক্ত সূরা এবং আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে আল্লাহর সাহায্য এবং আশ্রয় চাওয়া উচিত।[১]

১. আউযু বিল্লাহ পাঠ করা। (আবু দাউদ)
২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করা। (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)
৩. সূরা ফাতিহা পাঠ করা। (আবু দাউদ)
৪. সূরা বাকারা পাঠ করা। (মুসলিম, তিরমিযী)
৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা। (বুখারী)
৬. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। (বুখারী)
৭. সূরা ইখলাস পাঠ করা। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)
৮. সূরা নাস এবং ফালাক পাঠ করা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ত্বাবারানী)

প্রিয় পাঠক! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মিক এবং শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে উল্লিখিত সূরা এবং আয়াতসমূহে যে উপকারের কথা বর্ণনা করেছেন, এটা এতোটাই সত্য যেমন মৃত্যু সত্য। ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা এটা একটি জায়িয (বৈধ) মাধ্যম মাত্র, মূল কথাতো এ যে, সুস্থতা আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই এটা লক্ষ্য করেছে যে, দু'একজন রোগী সুস্থ হচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয় বার ঐ ওষুধ ঐ রোগীকে ঐ রোগের জন্য দিলে তা কাজ করছে না, যার অর্থ হচ্ছে যে, যখন আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী হয় তখন তিনি সুস্থ করে দেন আর যখন তাঁর ফায়সালা অনুযায়ী না হয় তখন তিনি সুস্থ করেন না। তাই মূলকথা হলো এ বিশ্বাসঃ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

অর্থ: "আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনি আমাকে আরোগ্য করেন।" (সূরা শুআরা ২৬:৮০)

আজ প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির সবচেয়ে বড় অসুস্থতা মানসিক অস্থিরতা, অশান্তিও দুশ্চিন্তা। কেউ কেউ এ বিষয়গুলোর চিকিৎসা স্বপ্ন এবং ওষুধের মাধ্যমে পেতে চায়, আবার কেউ কেউ গান-বাজনার মাধ্যমে পেতে চায়, আবার কেউ কেউ মদ এবং যৌবনের উন্মাদনায় পেতে চায়, অথচ এটা এমন রোগ যে, পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের নিকট নেই, আত্মার শান্তি ঐ নিয়ামাত শুধু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তা অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র কারণ কুরআন মাজীদ। আমরা কি দেখছি না যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং আত্মতৃপ্তি নিয়ে জীবন যাপন করছে ঐ সমস্ত বয়স্ক এবং গরিব লোকেরা, যারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছে এবং তিলাওয়াত শিখাচ্ছে, যারা তাদের জীবনে পৃথিবীর আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবান করেছে? আর

যারা পৃথিবীতে আত্মতৃপ্তি, শান্তি, অল্পে তুষ্টি, সচ্ছলতা, ভালো অবস্থা এবং বাস্তব আনন্দময় জীবন যাপন করতে চায় তাদের উচিত তারা যেন তাদের ঘরসমূহে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত, শ্রবণ ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে। পিতা-মাতা নিজেরা সকালে উঠে ফজরের নামায আদায় করে, এরপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে, ঘরে ভালো ক্বারীগণের ক্যাসেট নিয়মিত শ্রবণ করে, কোনো কোনো সময় নিজে শুনে এবং সন্তানদেরকে শুনায়। কুরআন মাজীদের সাথে আপনার সম্পর্ক যত গভীর হবে আপনি ঐ পরিমাণ আত্মিক ও মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। অনুভবহীনভাবে অন্যান্য আত্মিক, মানবিক রোগসমূহ থেকে আরোগ্য লাভ করবেন। ইনশা আল্লাহ!

আল কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ

১. তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কান্নার কারণে তাঁর বুকের ভিতর থেকে চাক্কি ঘুরানোর আওয়াযের ন্যায় আওয়ায আসত।

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: "رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهٖ اَزِيزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ "

অর্থ: "মুতাররিফি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নামায আদায় করতে দেখেছি আর তখন তাঁর বুকের ভিতর থেকে চাক্কির আওয়াযের ন্যায় কান্নার আওয়ায আসত।" (আবু দাউদ: ৯০৪)

২. হিজরতের সময় সূরাকা বিন মালিক জুসুম যখন তাঁর পিছু পিছু আসছিল তখনো তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ: قَلَتْ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتّٰى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَاَهْوَيْتُ يَدِي اِلٰى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا اَلْاَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: اَضُرُّهُمْ اَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي اَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الْاَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتّٰى اِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَاَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে একটি লম্বা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (হিজরতের সময় সূরাকা বিন মালিক জুসুম যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছে পিছে আসছিল। সে সময় সম্পর্কে সূরাকা বলছেন) আমি এসে ঘোড়ার ওপর আরোহণ করলাম এবং ঘোড়া দৌড়াতে লাগল। আমি আবু বকর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম আমার ঘোড়া হোঁচট খেল, এতে আমি পড়ে গেলাম, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ্য পরীক্ষা নিরূপণের তীর বের করে ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য করলাম যে, আমি তাদেরকে ক্ষতি করতে পারব কিনা? কিন্তু আমার অপছন্দ তাই প্রকাশ পেল, তবুও আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। পরিস্থিতি আমার নিকট ভাল হচ্ছিল না। তাই আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে চলতে লাগলাম এবং তাদের এতো নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত করার আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এদিক সেদিক দেখছিলেন না, আবু বকর অনেক বেশি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন।" (বুখারী ৩৬৯৩)

৩. সফরের অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ، وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ কে উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় সূরা ফাতহ অথবা ফাতহের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি কোমল কণ্ঠে তিলাওয়াত করছিলেন এবং তিনি স্পন্দন সৃষ্টি করে ছন্দময় করে তিলাওয়াত করছিলেন।" (বুখারী: ৫০৪৭)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর রমাযান মাসে জিবরীল (আ) কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন আর যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন ঐ বছর রমাযানে দু'বার তিনি জিবরীল (আ)-কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْاٰنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রতি বছর (জিবরীল আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একবার কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাত আর যে বছর তিনি মারা গেলেন ঐ বছর দুবার কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, এমনিভাবে প্রতি বছর তিনি দশ দিন ই'তিকাফ করতেন কিন্তু যে বছর তিনি মারা গেলেন ঐ বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।" (বুখারী: ৪৯৯৮)

৫. তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা মায়িদার একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতেন।

اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: " قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ، وَالْاٰيَةُ {اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ}

অর্থ: "আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে সকাল করে দিলেন, আর আয়াতটি ছিল আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় (সূরা মায়িদা: ১১৮)।" (নাসায়ী: ১০০৯)

৬. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর কাছ থেকে কুরআন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ অশ্রুসজল হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ، قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ: {فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا} قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ، فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও, আমি বললাম: আমি আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাব অথচ কুরআন আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: আমি অপরের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে

পছন্দ করি। আমি তাঁকে সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শুনাতে লাগলাম আর যখন এ আয়াতে পৌঁছল "অনন্তর তখন কী দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?" (সূরা নিসা :৪১)

তখন তিনি বললেন: থাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে গেছে।" (বুখারী: ৫০৫০)

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِـالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ

অর্থ: "বারা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে ইশার নামাযে সূরা ত্বীন তিলাওয়াত করতে শুনেছি, তার সুন্দর কণ্ঠের চেয়ে অধিক সুমধুর আর কারো কণ্ঠ শুনি নাই।" (মুসলিম : ১৯৬৭)

৮. সাহাবায়ে কিরামগণের সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে তিনি খুশি হতেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: اَبْطَأْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «اَيْنَ كُنْتِ؟» قُلْتُ: كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ: «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اُمَّتِي مِثْلَ هَذَا»

অর্থ: "নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে ইশার পরে আমি দেরী করে ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত কারো থেকে শুনিনি। অত:পর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে সেই ব্যক্তির তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে

শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমার উম্মাতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন।" (ইবনু মাজাহ : ১৩৩৮)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

অর্থ: "আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: হে আবু মূসা (রা) নিশ্চয়ই তুমি দাউদ (আ)-এর সুমধুর স্বরসমূহের একটি স্বর পেয়েছে।" (তিরমিযী : ৩৮৫৫)

৯. তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কিরাত পাঠ করতেন এমনকি তাঁর পা ফুলে যেত।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»

অর্থ: "মুগীরা বিন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন ফলে তাঁর পা ফুলে গেল, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন এতো কষ্ট করেন, আল্লাহতো আপনার আগের এবং পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তিনি বললেন: আমি কি আমার রবের কৃতজ্ঞ বান্দা হব না।" (মুসলিম: ৭৩০২)

১০. তাহাজ্জুদ নামাযের এক রাকাআতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা বাকারা, সূরা নিসা এবং সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করেছেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর সাথে এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছিলাম, তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু

করলেন, আমি মনে করলাম হয়তো শততম আয়াত পূর্ণ করে রুকূ করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, আমি চিন্তা করলাম হয়তো তিনি দু রাকাআতে সূরাটি পূর্ণ করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, আমি ভাবলাম হয়তো তিনি সূরাটি পূর্ণ করে রুকূ করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন, তিনি আলে ইমরান পড়তে লাগলেন এরপর সূরা নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং তা শেষ করে তিনি রুকূ করলেন।" (মুসলিম: ১৮৫০)

১১. তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘায়িত কিরাআত এবং সাহাবাগণের ক্লান্ত হয়ে যাওয়া।

عَنْ اَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَطَالَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ» ، قَالَ: قِيْلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: «هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ»

অর্থ: "আবু ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সাথে নামায আদায় করেছি, তিনি কিরআত এতো লম্বা করলেন, ফলে আমি একটি খারাপ চিন্তা করে নিয়েছিলাম, আবু ওয়ায়িল জিজ্ঞেস করল, আব্দুল্লাহ (রা) কী করতে চেয়েছিল? আব্দুল্লাহ (রা) উত্তরে বললো: আমি চেয়েছিলাম যে আমি বসে যাব এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করা ছেড়ে দিব।" (মুসলিম: ১৮৫১)

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন আবুল আস (রা)-কে কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও শুধু এজন্যই তায়েফের গভর্নর করেছিলেন যে, আগত দলের লোকদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশি কুরআন মাজীদ মুখস্থ ছিল।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ قَالَ: " اسْتَعْمَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَصْغَرُ السِّتَّةِ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَيْهِ مِنْ ثَقِيْفٍ؛ لِاَنِّي كُنْتُ قَرَأْتُ السُّوْرَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ الْقُرْاٰنَ يَتَفَلَّتُ مِنِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِي وَقَالَ: «يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ» قَالَ: فَمَا نَسِيْتُ بَعْدُ شَيْئًا اُرِيْدُ حِفْظَهُ "

অর্থ: "উসমান বিন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন অথচ আমি উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলাম, আর তার কারণ ছিল এ যে, তখন আমার সূরা বাকারা মুখস্থ ছিল, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি কুরআন ভুলে যাই, তিনি আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন: হে শয়তান! উসমানের বুক থেকে তুমি বের হয়ে যাও, এরপর থেকে আমি কোনো কিছু মুখস্থ করলে আর ভুলতাম না।" (বাইহাকী)

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়েমেনের উভয় পার্শ্বের গভর্নর এমন ব্যক্তিবর্গকে করলেন যারা কুরআন মাজীদ অধিক তিলাওয়াত করতে পারত।

عَنْ اَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا مُوسَى، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفٍ، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ، ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا» ، فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِذَا سَارَ فِي اَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي اَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى اِلَيْهِ، وَاِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ اِلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ اَيُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ، قَالَ: لاَ اَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: اِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ، قَالَ: مَا اَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَاَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ: اَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَاُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ، فَاَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَاَقْرَاُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي، فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِي

অর্থ: "আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা আশআরী এবং মুয়ায (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠালেন, ইয়ামেনের দু'টি অংশ, তাদের উভয়কে এক এক অংশের গভর্নর হিসেবে পাঠালেন, আর উপদেশ দিলেন যে, তোমরা উভয়ে লোকদের নিকট ইসলাম সহজভাবে পেশ করবে কঠোরভাবে নয়, লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, তাদেরকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করবে না, তাদের উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিল। একদা সাক্ষাতে মুয়ায বিন জাবাল (রা) আব্দুল্লাহ (আবু মূসা আশআরী রা.)-কে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর? সে উত্তরে বললো: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে, আমার যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায় আমি একটু একটু করে কুরআন তিলাওয়াত করি। এরপর আবু মূসা আশআরী (রা) মুয়ায (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর? মুয়ায (রা) উত্তরে বললো: আমি রাতের প্রথম অংশে শুয়ে যাই এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে কুরআন ততটুকু তিলাওয়াত করি যতটুকু তিলাওয়াত করার তাওফিক আল্লাহ আমাকে দেন। আমি সাওয়াবের নিয়তে শুয়ে যাই, আবার সাওয়াবের নিয়তে উঠে যাই।" (বুখারী ৪৩৪১)

নোট: আবু মূসা আশআরী (রা) এবং মুয়ায আব্দুল্লাহ বিন জাবাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়েমেনের দুই অংশের গভর্নর করে পাঠালেন, সে সময়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনকালে তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয় এবং এ আলাপ হয়।

কুরআন করীম এবং সাহাবা (রা)-গণ

১. আবু বকর (রা) এতো সুললিত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন যে, মক্কার মুশরিকদের মহিলারা তার কণ্ঠে কুরআন শুনার জন্য ভিড় করে থাকত। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে গিয়ে আবু বকর (রা) এর নিজের অজান্তেই নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে যেত। কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ লাভের জন্য আবু বকর (রা) কাফিরদের দেয়া নিরাপত্তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ. فَقَالَ: اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: اَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَاُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ. اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ. وَتَحْمِلُ

الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ. فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ. فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا: لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلاَنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى

اَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ. فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ. وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيَّ ذِمَّتِي. فَاِنِّي لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّي اُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ: فَاِنِّي اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ. وَاَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরিকদের পক্ষথেকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন আবু বকর (রা) হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলো, যখন বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌছলো তখন কাররা বংশের সরদার ইবনু দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন সে জিজ্ঞেস করল আবু বকর তুমি কোথায় যাবে? আবু বকর (রা) বললো: আমার জাতি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছি, যেন আমি আমার রবের ইবাদত করতে পারি। ইবনু দাগিনা বললো: আবু বকর তোমার মতো লোককে না বের করা যায়, আর না সে নিজে বের হয়ে যায়। তুমি অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে থাক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অপরের দুঃখ নিজের ওপর চাপিয়ে নাও, মেহমানের সম্মান কর, ঝগড়া-ঝাটিতে সত্যের সাহায্য কর। তাই আমি তোমাকে আমার নিরাপত্তায় নিয়ে নিলাম। ফিরে চল আর নিজের শহরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদাত কর, আবু বকর (রা) ইবনে দাগিনার কথায় মক্কায় ফিরে আসলো। সন্ধ্যার সময় ইবনে দাগিনা আবু বকরকে সাথে নিয়ে কুরাইশ সরদারদের নিকট গেল এবং বললো: আবু বকরের মতো লোককে কখনো তাড়ানো যায় না এবং না সে নিজে ইচ্ছা করে বের হতে পারে।

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে বের করে দিতে চাও, যে অসহায়কে আশ্রয় দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে, মতবিরোধের সময় সত্যের পক্ষে থাকে? কোরাইশরা ইবনে দাগিনার দেয়া নিরাপত্তাকে তো ফিরিয়ে দিলই না বরং বললো: আবু বকরকে ভালোভাবে জানিয়ে দাও যে, সে যেন তার ঘরে থেকে যতটা পারে ততটা স্বীয় রবের ইবাদত করে, নামায আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে, আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে যেন এ সমস্ত কাজ না করে। সে এ সমস্ত কাজ প্রকাশ্যে করলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাদের স্ত্রী ফিতনায় পড়ে যাবে।

ইবনে দাগিনা এ সমস্ত বিষয় আবু বকর (রা)-কে জানিয়ে দিল। আবু বকর (রা) এ শর্তে মক্কায় থেকে গেলেন যে, তিনি তার ঘরের মধ্যে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদত করবেন, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন না, স্বীয় ঘরের বাহিরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন না, এরপর হঠাৎ আবু বকর (রা) তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানালেন সেখানে তিনি নামায পড়লে এবং কুরআন তিলাওয়াত করলে মুশরিকদের স্ত্রী একত্রিত হয়ে যেত, আবু বকর (রা)-এর তিলাওয়াত শুনে পেরেশান হয়ে যেত এবং বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর (রা) আল্লাহর ভয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেন, যখন তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি তার নয়নাশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না, অবস্থা দেখে কুরাইশরা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসল তখন কুরাইশ সরদাররা তার নিকট অভিযোগ করল যে, আমরা আবু বকরের জন্য তোমার দেয়া নিরাপত্তা শুধু এজন্য মেনে নিয়েছিলাম যে, সে তার ঘরে বসেই স্বীয় রবের ইবাদত করবে, কিন্তু আবু বকর (রা) এ শর্ত ভঙ্গ করেছে, তার ঘরের আঙ্গিনায় মসজিদ বানিয়েছে এবং ওখানে প্রকাশ্যে নামায আদায় করছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই তুমি আবু বকরকে নিষেধ কর, যদি সে চায় তাহলে স্বীয় ঘরে থেকে স্বীয় রবের ইবাদত করুক, আর যদি সে তা না মানে এবং প্রকাশ্যে ইবাদত করতে অনড় হয়, তাহলে তাকে দেয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে চাই না।

কিন্তু আবু বকরের প্রকাশ্য ইবাদত কোনোভাবেই আমাদের নিকট সহনীয় নয়। তাই ইবনে দাগীনা আবু বকর (রা)-এর নিকট এসে বললোঃ আবু বকর আমি তোমার ব্যাপারে কুরাইশ সরদারদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তুমি জান, তাই হয় তুমি ঐ শর্তের ওপর অটল থাক, অন্যথায় আমার দেয়া নিরাপত্তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি চাই না যে আরবদের নিকট থেকে একথা শুনি যে, আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে তা ভঙ্গ করেছে। আবু বকর (রা) উত্তরে বললোঃ আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।" (বুখারীঃ ৩৯০৫)

২. উসাইদ আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাইর (রা)-এর সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শোনার জন্য ফেরেশতা আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসত।

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ. وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ. إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَتْ. فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ.

فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لاَ أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟» . قَالَ: لاَ، قَالَ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ»

অর্থ: উসাইদ আব্দুল্লাহ বিন হুযাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন, তার ঘোড়াও পাশেই বাধা ছিল, হঠাৎ তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করলে উসাইদ থেমে গেল তখন তার ঘোড়াও থেমে গেল, যখন উসাইদ (রা) আবার তিলাওয়াত করতে লাগলো তখন ঘোড়াও আবার লাফাতে শুরু করল। উসাইদ (রা) এর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশেই ছিল, সে ভয় করতে লাগল যে, তার না আবার কোনো ক্ষতি হয়, তখন ছেলেকে নিজের পাশে বসালো। উসাইদ (রা) ওপরের দিকে তাকালে একটি ছায়া দেখতে পেল, উসাইদ (রা) সেদিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে উসাইদ (রা) এ ঘটনাটি নবী ﷺ কে শুনাল, তিনি বললেন: হে হুযাইরের ছেলে তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক। উসাইদ (রা) বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, ঘোড়া ইয়াহইয়ার কোনো ক্ষতি করবে, সে ঘোড়ার একেবারে নিকটেই বসে ছিল, তাই আমি মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম এবং তাকে আমার নিকটে এনে ওপরের দিকে তাকালাম তখন আমি এ ছায়া দেখতে পেলাম যেখানে বাতির ন্যায় কিছু আলো জ্বলছিল। আমি ঘর থেকে বের হলাম যেন ভালোভাবে তা দেখতে পারি, কিন্তু তা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কি জান এটা কী ছিল? উসাইদ বললো: না! তিনি বললেন: এটা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল, যারা তোমার সুন্দর কণ্ঠ শুনে কাছে চলে এসেছিল, যদি তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতে তাহলে সকালে অন্যরাও

তা দেখতে পেত, আর তারা তখন মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতো না।" (বুখারী: ৪৭৩০)

৩. আবু মূসা আশআরী (রা) সবসময়ই কিছু কিছু করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আর মুয়ায (রা) রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়তেন আবার শেষ রাতে উঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ اَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا مُوسَى، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلاَفٍ، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ، ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا» ، فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلَىٰ عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِذَا سَارَ فِي اَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي اَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيْرُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ حَتَّى اِنْتَهَى اِلَيْهِ، وَاِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ اِلَىٰ عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَيُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ، قَالَ: لاَ اَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: اِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ، قَالَ: مَا اَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَاَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ، كَيْفَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ: اَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَاُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ، فَاَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَاَقْرَاُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِي، فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِي

অর্থ: "আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা আশআরী এবং মুয়ায (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠালেন, ইয়ামেনের দুটি অংশ, তাদের উভয়কে এক এক অংশের গভর্নর হিসেবে পাঠালেন, আর উপদেশ দিলেন যে, তোমরা উভয়ে লোকদের নিকট ইসলাম সহজভাবে পেশ করবে কঠোরভাবে নয়, লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, তাদেরকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করবে না,

তাদের উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিল। একদা সাক্ষাতে মুয়ায আব্দুল্লাহ বিন জাবাল (রা) আব্দুল্লাহ (আবু মূসা আশআরী রা.)-কে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর? সে উত্তরে বললো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে, আমার যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায় আমি একটু একটু করে কুরআন তিলাওয়াত করি। এরপর আবু মূসা আশআরী (রা) মুয়ায (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর? মুয়ায (রা) উত্তরে বললোঃ আমি রাতের প্রথম অংশে শুয়ে যাই এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে কুরআন ততটুকু তিলাওয়াত করি যতটুকু তিলাওয়াত করার তাওফিক আল্লাহ আমাকে দেন। আমি সাওয়াবের নিয়তে শুয়ে যাই, আবার সাওয়াবের নিয়তে উঠে যাই।" (বুখারীঃ ৪৩৪১)

৪. আবু মূসা আশআরী (রা) সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উৎসাহিত করলেন।

عَنْ اَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا اَبَا مُوسَى لَقَدْ اُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ»

অর্থঃ "আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ হে আবু মূসা (রা) নিশ্চয়ই তুমি দাউদ (রা)-এর সুমধুর স্বরসমূহের একটি স্বর পেয়েছে।" (তিরমিযীঃ ৩৮৫৫)

৫. উমার (রা) এর মজলিসে শূরার সমস্ত সদস্য কুরআন মাজীদের আলিম ছিল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রা) এর সাথে রাষ্ট্রীয় পরামর্শে অংশগ্রহণকারীরা ছিল কুরআনের ক্বারীগণ (কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ), চাই তারা বয়সে বৃদ্ধ হোক আর যুবক।" (বুখারীঃ ৭২৮৬)

৬. সাহাবাগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা একজন অপরজনকে কুরআন শুনানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَيَسْتَطِيْعُ هَؤُلاَءِ الشَّبَابُ اَنْ يَقْرَءُوْا كَمَا تَقْرَاُ؟ قَالَ: اَمَا

اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ اَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: اَجَلْ، قَالَ: اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ، اَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: اَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا؟ قَالَ: اَمَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ؟ فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ اَحْسَنَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا اَقْرَأُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ

অর্থ: "আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসেছিলাম। এমতাবস্থায় খাব্বাব আব্দুল্লাহ বিন আরাত (রা) এসে বলতে লাগলো! হে আবু আবদুর রহমান! (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর উপাধি) তারা অর্থাৎ আপনার ছাত্ররাও কি আপনার মতো কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে? আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: হ্যাঁ, যদি তুমি বল তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলব যে, সে তোমাকে কুরআন শুনাবে। খাব্বাব (রা) বললো: হ্যাঁ বল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) আলকামা (রা)-কে বললো: পড়, আলকামা (রা) সূরা মারইয়ামের পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালো, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) খাব্বাব (রা) কে জিজ্ঞেস করলো বল, পড়া কেমন? খাব্বাব (রা) বললো: খুব সুন্দর। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: আমি যেভাবে তিলাওয়াত করি আলকামাও ঐভাবেই তিলাওয়াত করে।" (বুখারী: ৪৩৯১)

৭. সাহাবাগণের কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ততা।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَنِي لَحْيَانَ، اِسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَدُوٍّ، فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الاَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রি'ল, যাকওয়ান, আসিয়া এবং লাহিয়ান বংশ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর নিকট সাহায্য চাইল, তিনি তখন সত্তর

জন আনসার সাহাবীকে পাঠালেন, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা ঐ সত্তার জন্য সাহাবীকে তখনো ক্বারী (কুরআন তিলাওয়াতকারী) বলতাম, তারা দিনের বেলায় কাঠ সংগ্রহ করত (যেন তা বিক্রি করে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে) আর রাতে নামায আদায় করত। (নফল নামাযে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করত।" (বুখারী: ৪০৯০)

৮. আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (রা)-এর তিলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উৎসাহিত করলেন।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقِيْلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ اُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কে? সাহাবাগণ বললো: এটা আব্দুল্লাহ বিন কাইস, তিনি বললেন: সে এ স্বর দাউদ (আ) থেকে প্রাপ্ত হয়েছে।" (ইবনু মাজাহ: ১৩৪১)

৯. সালিম (রা)-এর তিলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণগান করলেন:

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: اَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «اَيْنَ كُنْتِ؟» قُلْتُ: كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ: «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اُمَّتِي مِثْلَ هَذَا»

অর্থ: "নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকাবস্থায় এক রাতে ইশার পরে আমি দেরী করে ঘরে ফিরলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? আমি বললাম: আপনার সাহাবীগণের

মধ্যে এক ব্যক্তির তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, আমি অনুরূপ সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত কারো থেকে শুনিনি। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে সে ব্যক্তির তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: এটা আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমার উম্মাতের মাঝে এ ধরনের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করার মতো লোক সৃষ্টি করেছেন।" (ইবনু মাজাহ: ১৩৩৮)

১০. যুবক সাহাবাগণের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত এবং তা মুখস্থ করার আগ্রহ।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ، فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ". قُلْتُ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: " اقْرَأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ ". قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي،

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন আমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করলাম এবং রাতভর তা খতম করতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের বয়স বৃদ্ধি পেলে তখন তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে, তাই একমাসে খতম কর, আমি বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবনকাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ঠিক আছে তাহলে দশ দিনে খতম কর, আমি আবার বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবনকাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাহলে সাত দিনে খতম কর, আমি তৃতীয়বার বললাম: আমাকে আমার শক্তি এবং যৌবনকাল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ: ১৩৪৬)

১১. সাহাবীগণের কুরআন খতম করা

عَنْ أَوْسٍ : قَالَ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوْا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ، وَخَمْسَ سُوَرٍ، وَسَبْعَ سُوَرٍ،

وَتِسْعَ سُوَرٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُوْرَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُوْرَةً، وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافٍ حَتَّى يُخْتَمَ

অর্থ: "আউস (রা) বলেন: আমি সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কীভাবে কুরআন খতম করেন? তারা উত্তরে বললো: প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগার সূরা, ৬ষ্ঠ দিন তের সূরা, সপ্তদিন শেষ মনযিল।" অর্থাৎ সাত দিনে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করত। (ইবনে মাজাহ: ১৩৪৫)

১২. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) জিবরীল (আ)-এর মতো কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর এবং উমার (রা) আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ এভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে তিলাওয়াত করতে চায় তাহলে তার উচিত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর ন্যায় তিলাওয়াত করা।" (ইবনে মাজাহ: ১৩৮)

১৩. সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে তা মুখস্থ করে নিয়েছিল।

عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمُ اقْتُلُوْهَا» قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، قَالَ: فَقَالَ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা মিনার একটি গুহায় ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সূরা মুরসালাত নাযিল হলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনে মুখস্থ করে নিলাম, তিনি সূরা মুরসালাত তিলাওয়াত করছিলেন, এমতাবস্থায় একটি সাপ বের হলো তিনি বললেন: সাপটিকে মেরে ফেল। আমরা সাপটিকে মারতে গেলে সাপটি গর্তে ঢুকে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সাপটি তোমাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল আর তোমরাও সাপের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলে।"(বুখারী: ৪৯৩১)

১৪. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালিম, মুয়ায বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব (রা) তাদের জীবনকে কুরআন শিখা এবং শিখানোর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: তোমরা চার জনের কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, সালিম, মুয়ায বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব (রা)। (বুখারী: ৩৮০৮)

১৫. উমার (রা)-এর আযাব সম্পর্কিত আয়াতের তিলাওয়াত।

قَرَءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سُوْرَةَ الطُّوْرِ حَتّٰى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتّٰى مَرِضَ وَعَادُوْهُ.

অর্থ: "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূরা তূরের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন যে, 'যখন তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (তুর: ৭) তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে গেলেন, আর লোকেরা তখন তাকে দেখতে গেল।"

১৬. সূরা মারইয়ামের একটি আয়াত স্মরণ হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বে-হুশ হয়ে গেলেন।

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ فَبَكَى فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ. فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ

تَبْكِي فَبَكَيْتُ، قَالَ: اِنِّي ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا} [مَرْيَمُ: 71] فَلَا اَدْرِي اَنَنْجُو مِنْهَا اَمْ لَا

অর্থ: "কাইস বিন আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) তার স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদছিলো, তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল, তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কেন কাঁদছ? সে বললো: তোমাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতেছি। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বললো: আল্লাহর এ বাণী আমার মনে পড়ে গেল যে, 'তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে, তা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না।' (সূরা মারইয়াম: ৭১) আমি জানি না যে, আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কি পাব না।" (ইবনে কাসীর: ৭৭১; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৩)

১৭. নারীদের কুরআন শ্রবণের আগ্রহ।

عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلَى عَرِيْشِي»

অর্থ: "উম্মু হানী বিনতু আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাতে আমার ঘরের ছাদে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতাম।" (ইবনে মাজাহ: ১৩৪৯, নাসাঈ: ১০১৩, হাসান সহীহ)

১৮. উম্মু হিশাম (রা) জুমুআর খুতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে সূরা কাফ শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিল।

عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ اَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا اَخَذْتُ ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، اِذَا خَطَبَ النَّاسَ»

অর্থ: "হিশাম বিনতু হারিসা বিন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন মিম্বরে উঠে মানুষের মাঝে খুতবা দেয়ার সময় তাঁর মুখ থেকে সূরা কাফ শুনে শুনে তা মুখস্থ করে নিয়েছি।" (মুসলিম ২০৫২)

১৯. কুরআন মুখস্থ এবং তিলাওয়াত করার প্রতি নারীদের আগ্রহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ. اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

অর্থ: " ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (তার মা) উম্মু ফযল বিনতু হারিসা (রা) তাকে সূরা মুরসালাত তিলাওয়াত করতে শুনতে পেয়ে বললো: হে আমার বৎস! তুমি এ সূরাটি ক্বিরাত করে তিলাওয়াত করে আমাকে আমার ভুলে যাওয়া সূরাটি স্মরণ করালে, এটি ঐ সূরা, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সর্বশেষ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।" (মুসলিম: ১০৬১, ৪৬২)

২০. উম্মু অরাকা বিনতু নাওফাল কুরআন মাজীদের হাফিয ছিলেন।

عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْاَنْصَارِيَّةِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً، قَالَ: «قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَاِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ» ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةُ، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَاَتِ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَاَذِنَ لَهَا

অর্থ: "উম্মু অরাকা বিনতু নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন বদরের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি অসুস্থদের সেবা করব, হয়তো এ ওসিলায় আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন। তিনি বললেন: তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর, তোমাকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন, বর্ণনাকারী বলেন: উম্মু অরাকা কুরআনের হাফিয ছিলেন তাই তিনি নবী ﷺ কে আবেদন করলো যেন তাকে ঘরে মহিলাদের নামাযের মুয়াযযিন হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।" (আবু দাউদ: ৫৯১, হাসান)

২১. আয়েশা (রা)-এর কুরআন তিলাওয়াত এবং পরকালের চিন্তা।

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ : قَالَ : كُنْتُ اِذَا غَدَوْتُ اَبْدَأُ بِبَيْتِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَغَدَوْتُ يَوْمًا فَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تَقْرَأُ (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ) وَتَدْعُوْ وَتَبْكِىْ وَتُرَدِّدُهَا فَقُمْتُ حَتَّى مَلَلْتُ الْقِيَامَةَ فَذَهَبْتُ اِلَى السُّوْقِ لِحَاجَتِىْ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ كَمَا هِىَ تُصَلِّىْ وَتَبْكِىْ.

অর্থ: "উরওয়া তার পিতা যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যুবাইর (রা) যখন সকালে ঘর থেকে বের হত তখন প্রথমে নিজের খালা আয়েশা (রা) এর ঘরে এসে তাকে সালাম দিত, একদা আমি ঘর থেকে বের হলাম এবং অভ্যাস মুতাবিক সালাম দেয়ার জন্য আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম এসময় তিনি নামাযরত ছিলেন এবং কুরআন মাজীদের এ আয়াত "অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।' (সূরা তূরঃ ২৭) তিলাওয়াত করছিল, এ আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করছিল আর কাঁদছিল, আমি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম, এমনকি আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম, তাই তখন কোনো কাজে আমি বাজারে চলে গেলাম, ফিরে এসে দেখলাম তখনো আয়েশা (রা) নামাযে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ঐ আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করে কাঁদছিল।" (ইমাম ইবনু জাওযী লিখিত সাফওয়াতুল সাফওয়া।)

২২. একজন মহিলা সাহাবীর ঈর্ষান্বিত কুরআনের জ্ঞান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَاَةً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: اُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ، فَاَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ اَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِي لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ

اللهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} " فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «اذْهَبِي فَانْظُرِي» . قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا».

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা শরীরে উল্কি অঙ্কনকারিণী, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী, চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারিণীদের প্রতি লা'নত করেছেন, আসাদ বংশের জনৈকা মহিলা উম্মু ইয়াকুব একথা শুনল, সেও কুরআন অধ্যয়ন করত। সে ইবনু মাসউদের নিকট আসল এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: যাকে নবী ﷺ লা'নত করেছেন তাকে আমি কেন লা'নত করব না? আর তা আল্লাহর কিতাবেও বিদ্যমান আছে। ঐ মহিলা বললো: আমি আমার মুখস্থকৃত সমগ্র কুরআন পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাও একথা পাই নাই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে তাহলে তুমি তা পেতে। "রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" তখন ঐ মহিলা বললো: এ বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু কাজ আপনার স্ত্রীও করছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: যাও দেখে আস, সে গেল কিন্তু তার স্ত্রীর মাঝে কিছু পেল না, তখন সে ফিরে এসে বললো: ঐ বিষয়গুলোর কোনো কিছু আমি তোমার স্ত্রীর মাঝে পাই নাই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললো: যদি সে এমন কিছু করত তাহলে আমি তার সাথে সহবাস করতাম না।" (মুসলিম: ৫৬৯৫, ২১২৫)

২৩. বাচ্চাদের মাঝে কুরআন মুখস্থ এবং তিলাওয়াতের আগ্রহ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ؟ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ

فَنَسْاَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ [ص:151] مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: يَزْعُمُ اَنَّ اللهَ اَرْسَلَهُ، اَوْحَى اِلَيْهِ، اَوْ: اَوْحَى اللهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ اَحْفَظُ ذَلِكَ الكَلاَمَ، وَكَاَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِاِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُوْنَ: اتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ، فَاِنَّهُ اِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ اَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلاَمِهِمْ، وَبَدَرَ اَبِي قَوْمِي بِاِسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا» . فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ قُرْاٰنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ اَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُوْنِي بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ، وَاَنَا ابْنُ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ

অর্থ: "আমর বিন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের ঘর নদীর পাশে ছিল যেখান দিয়ে পথিকরা পথ অতিক্রম করত। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, মদ্বীনার লোকদের কী অবস্থা? এবং ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কী অবস্থা? লোকেরা বলত: ঐ ব্যক্তি দাবি করছে যে, সে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর ওপর এ অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি ওহীর বাণীসমূহ মুখস্থ করে নিতাম যেন কেউ আমার বুকে তা স্থাপন করে দিয়েছে। আরবরা ঈমান আনার ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল আর বলছিল: ঐ ব্যক্তি এবং তার জাতিকে ঐ অবস্থায় থাকতে দাও, যদি সে তাঁর স্বজাতির ওপর বিজয় লাভ করে তাহলে সে সত্য নবী, অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন প্রত্যেক বংশ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। আমার পিতা তার জাতির সাথে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করছিল, যখন সে নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আসল তখন বলতে লাগল আল্লাহর কসম! আমি সত্য নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুক নামায অমুক সময় এবং অমুক নামায অমুক সময় আদায় কর। যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আযান দিবে, আর যে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে সে ইমামতি করবে। আমার জাতির লোকেরা দেখল যে আমার চেয়ে অধিক আর

কেউ কুরআনের জ্ঞান রাখে না, কেননা আমি মুসাফিরদের কাছ থেকে শুনে শুনে কুরআন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। তাই তারা আমাকে ইমাম নির্ধারণ করল, তখন আমার বসয় ছিল ছয় বা সাত বছর।" (বুখারী: ৪৩০২, ৪০৫১)

২৪. ক্রীতদাসের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত এবং মুখস্থের আগ্রহ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ «وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»

অর্থ: " ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদ্বীনায় আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম কাফিলা যখন ওসবা (কূবার নিকটবর্তী একটি ছোট জনবসতিতে) আসল তখন তাদের ইমামতি করত আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম। কেননা সে সবচেয়ে বেশি কুরআন মুখস্থ করেছিল।" (আবু দাউদ: ৫৮৮, সহীহ)

কুরআন মাজীদ সরাসরি রহমত

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহরবাণী

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: "আর নিশ্চয়ই এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা নামল ২৭:৭৭)

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: "সৎকর্মশীলদের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ।" (সূরা লুকমান ৩১:৩)

প্রত্যেক মানুষ এ পৃথিবীতে সম্মান, আত্মতৃপ্তি ও ভালো অবস্থা নিয়ে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমতের মুখাপেক্ষী। এ পৃথিবী ত্যাগ করার পর আলমে বারযাখ (কবরের) জিন্দেগিতেও প্রত্যেক মানুষ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। কবরের জীবনের পর কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির

জন্যও প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। পৃথিবী, কবর, পরকাল এ তিনটি স্থানে আমরা সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। ঐ রহমত যার আমরা কদমে কদমে মুখাপেক্ষী, তা কুরআন মাজীদ দ্বারাই হাসিল করা সম্ভব, আসুন গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, কুরআন মাজীদ কীভাবে পৃথিবী, কবর এবং পরকালে আমাদের জন্য রহমত।

ক. পার্থিব জীবন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা লিখেছি যে, কুরআন মাজীদ মানুষের জন্য হিদায়াত, এটাও আল্লাহর একটি রহমত। এমনিভাবে কুরআন মাজীদ আরোগ্য, আরোগ্য লাভের মাধ্যমে এটাও একটি রহমত। এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদ ঈমানদারদের জন্য পার্থিব জীবনে কীভাবে রহমতের কারণ হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা নিচে পেশ করা হলো:

১. **পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা:** যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের শিক্ষাগুলোর ওপর দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, সে সর্বকালে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে, আল্লাহর বাণী:

    فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ.

    অর্থ: "যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।" (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৩)

    নবী ﷺ বলেছেন: কুরআন মাজীদের একটি প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে, যদি তোমরা তা ধরে থাক তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (ত্বাবারানী)

২. **জীবন যাপনের ফিতনা থেকে রক্ষা:** নবী ﷺ বলেছেন, সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। (মুসলিম)

    আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় আর কোনো ফিতনা হয় নাই। (মুসলিম)

    সূরা কাহাফের আয়াতসমূহ যদি এতবড় ফিতনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে তাহলে অন্যান্য ফেতনা থেকেও স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত রাখবে ইনশাআল্লাহ।

৩. **আসমানী মুসিবত থেকে রক্ষা :** আসমানী মুসিবত, অন্ধত্ব, তুফান, রোগ, ভূমিকম্প, বন্যা, অভাব-অনটন, ভূমিধ্বস, আকৃতির পরিবর্তন (মানুষকে অন্য প্রাণীতে রূপান্তর) ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস এবং ফালাক

পাঠ করা। উকবা বিন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম, হঠাৎ আমাদেরকে অন্ধকার এবং অন্ধত্ব আবরিত করে দিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ দু সূরার চেয়ে উত্তম আর কোনো কিছুই নেই। (আবু দাউদ)

৪. **আকস্মিক মুসিবত থেকে রক্ষা:** যুদ্ধের ময়দানে তালহা (রা)-এর আঙুল কেটে গেল, তখন সে তার মুখ দিয়ে ব্যথা অনুভবের আওয়ায করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে তাহলে ফেরেশতা তোমাকে ওপরে উঠিয়ে নিত। (নাসায়ী)

৫. **রিযিক বৃদ্ধি :** আল্লাহর বাণী:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: "আর যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করত, তবে অবশ্যই তারা আহার করত তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে। তাদের মধ্য থেকে সঠিক পথের অনুসারী একটি দল রয়েছে এবং তাদের অনেকেই যা করছে, তা কতইনা মন্দ!" (সূরা মায়িদা ৫:৬৬)

৬. **রাজনৈতিক উন্নতি এবং বিজয় :** কুরআন মাজীদের বিধি-বিধান অনুসরণকারী জাতিকে আল্লাহ তা'আলা রাজনৈতিক বিজয় এবং উন্নতি দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা কিতাবের মাধ্যমে কাউকে সম্মানিত করেন আবার কাউকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করেন।" (মুসলিম)

৭. **রাতের অনিষ্টতা এবং ফিতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে শোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় যে সকাল পর্যন্ত তাকে সংরক্ষণ করে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি শোয়ার পূর্বে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করে তা তার জন্য সর্বপ্রকার কষ্ট, অনিষ্টতা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী)

৮. **কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়া :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাইবে তাকে তিনি তা দিবেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন: সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দিবেন। (মুসলিম)

৯. **বরকত ও কল্যাণ লাভ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সূরা বাকারা তিলাওয়াত কর, তা তিলাওয়াত করা বরকত লাভের কারণ, আর তা ত্যাগ করা অকল্যাণ লাভের কারণ। (মুসলিম)

আল্লাহর বাণী

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ: "আর এটি কিতাব– যা আমি নাযিল করেছি– বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।" (সূরা আনআম ৬:১৫৫)

১০. **বিপদ, দুঃখ, চিন্তা থেকে মুক্তি :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিন বার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করবে সে সর্ব প্রকার বিপদাপদ এবং দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত এবং শ্রবণের মাধ্যমে কুরআনকে তার চোখ, কান এবং অন্তরের আনন্দ ও বিপদাপদ ও চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করবে তাকে আল্লাহ অন্তরের শান্তি এবং চোখের তৃপ্তি দিবেন, তার বিপদাপদ এবং চিন্তা দূর করবেন। (আহমাদ)

চিন্তা করুন! কুরআন মাজীদের সাধারণ তিলাওয়াত আর কিছু বিশেষ সূরা বা আয়াতের প্রতি যত্নবান হওয়া মানুষকে কত বিপদাপদ, দুঃখ, চিন্তা, অনিষ্টতা এবং ফিতনা থেকে রক্ষা করে পৃথিবীতে সম্মান, আরাম, কল্যাণ ও বরকতময় জীবন দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, মূলত কুরআন মাজীদ পৃথিবীর নিকৃষ্ট ফেতনা, বিপদ, কষ্ট থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, ভালো ও মন্দের মাঝে শক্তিশালী ঢাল, জীবনের শান্তি, যে তাকে জীবনের চলার পথের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ

করবে তার জন্য তা রহমত হবে আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে নিঃসন্দেহে সে বঞ্চিত হবে।

খ. বারযাখী (কবরের) জীবন : কবরের জীবনেও মানুষ আল্লাহর রহমতের এ রকম মুখাপেক্ষী, যেমন পৃথিবীতে বরং এর চেয়েও আরো কয়েকগুণ বেশি সেখানেও ঐ রহমত কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই হাসিল হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হবে তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা "মুনকার ও নাকীর" আসে এবং নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন করবে।

১. তোমার প্রভু কে?

২. তোমার নবী কে?

৩. তোমার দ্বীন কী?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মু'মিন ব্যক্তি বলবে: আমার প্রভু আল্লাহ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম।

তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর ফেরেশতা মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি কিভাবে জানতে পারলে? মু'মিন ব্যক্তি বলবে: "আমি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করেছি।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

অতএব কবরে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে সফল শুধু তারাই হবে যারা কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান এনেছে, তা তিলাওয়াত করেছে, অর্থ বুঝেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে। এ কুরআন মাজীদ বরজাখেও ঈমানদারদের জন্য রহমত বলে প্রমাণিত হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যখন মু'মিন ব্যক্তি ফেরেশতাদের উত্তরে বলবে: আমি কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান এনেছি, তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, তা তিলাওয়াত করেছি, তখন কবরে তার আনন্দ এবং শান্তির কী অবস্থা হবে?

আর যদি মু'মিন ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন কোনো পাপ করে থাকে যেজন্য তাকে কবরে আযাব ভোগ করতে হবে তখন তার জন্যও কুরআনের ওপর ঈমান আনা, তিলাওয়াত করা, সে অনুযায়ী আমল করা রহমতের কারণ হবে এবং কুরআন মাজীদ আযাবের ফেরেশতাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। সূরা মুলক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এটা কবরের আযাবের প্রতিবন্ধক হবে। (হাকিম) এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, কুরআন তিলাওয়াত মু'মিন ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী আমল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : মানুষকে যখন কবরে রাখা হবে তখন ফেরেশতারা মাথার দিক থেকে আযাব দেয়ার জন্য আসে, এসময় কুরআন তিলাওয়াত তাকে বাধা প্রদান করে, যখন ফেরেশতারা সামনের দিক থেকে আসে তখন দান-খয়রাত তাদেরকে বাধা দেয়, আর যখন ফেরেশতাগণ পায়ের দিক থেকে আসে তখন মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাদেরকে বাধা দেয়। (ত্বাবারানী)

এভাবে বারযাখেও কুরআন মাজীদ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য বিরাট রহমত বলে প্রমাণিত।

গ. পরকালীন জীবনঃ পার্থিব এবং বারযাখী জীবনের ন্যায় পরকালীন জীবনেও মানুষ আল্লাহর দয়ার সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর এ দয়াও কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হাসিল হবে। হাশরের মাঠ হোক বা মিযান, পুলসিরাত, জান্নাত সর্বত্রই কুরআন মাজীদ তার অনুসারীদের জন্য রহমত হয়ে আসবে, কিছু হাদীস দ্রঃ

১. মাগফিরাতের জন্য সুপারিশঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কুরআন মাজীদ কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে। (ত্বাবারানী)

সুপারিশ করার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিছু কিছু সূরার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ সূরা মুলক সম্পর্কে বলেছেনঃ সূরা মুলক তার পাঠকদের জন্য তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

সূরা বাকারা এবং আলে ইমরান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এও বলেছেনঃ যে, এ উভয় সূরা তাদের তিলাওয়াতকারীদেরকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে। (মুসলিম)

কুরআন মাজীদ এবং অন্যান্য সূরাসমূহ আল্লাহর নিকট সুপারিশ বা ঝগড়া আল্লাহর নির্দেশক্রমেই করবে, যা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম)।

২. কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য কুরআনের তিনটি আবেদনঃ কুরআন মাজীদ তার তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াও নিম্নোক্ত তিনটি আবেদন জানাবেঃ

ক. হে আল্লাহ! তুমি তাকে সম্মানজনক পোশাক পরিধান করাও, তখন কুরআন মাজীদের সুপারিশক্রমে তার তিলাওয়াতকারীকে সম্মান স্বরূপ তাজ পরানো হবে।

খ. কুরআন মাজীদ তার তিলাওয়াতকারীর জন্য আবারো একই আবেদন জানাবে তখন তাকে সম্মানজক পোশাক পরানো হবে।

গ. কুরআন মাজীদ তার তিলাওয়াতকারীর জন্য তৃতীয় আবেদন করবে যে, হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (তিরমিযী)

তখন তার এ আবেদনটিও গ্রহণ করা হবে।

৩. নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণের সাহচার্য লাভ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণের সাহচর্যে থাকবে। (মুসলিম)

৪. উচ্চ মর্যাদা : জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াতকারীর অবস্থান তার কুরআন মুখস্থের পরিমাণ অনুযায়ী হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তিলাওয়াত কর এবং ওপরের স্তরে আরোহণ করতে থাক, তোমার অবস্থান হবে সেখানে যেখানে তোমার তিলাওয়াত শেষ হবে। (তিরমিযী)

৫. পিতামাতার সম্মান : কুরআন তিলাওয়াতকারীর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাকেও সম্মানিত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা এবং সম্মানিত করার পর কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাকে এমন মূল্যবান পোশাক পরানো হবে যে, যার মুকাবেলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তুচ্ছ গণ্য হবে। পিতামাতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমাদের এ সম্মান এবং মর্যাদা কোন্ আমলের কারণে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমার সন্তানদেরকে কুরআন শিখানোর কারণে। (মুসনাদ আহমাদ ও ত্বাবারানী)

(হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।)

মানবজীবনের এ তিনটি স্তর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ গভীর মনোনিবেশের মাধ্যমে গবেষণা করুন, এরপর ফায়সালা করুন যে, আমরা কি এ পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ব্যতীত সম্মান ও আরামদায়ক জীবন যাপন করতে পারব? বারযাখে আল্লাহর রহমত ব্যতীত ক্ষমা এবং আরাম হাসিল করা যাবে? বা পরকালে আল্লাহর রহমত ব্যতীত ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করা যাবে? যদি সম্ভব না হয় আর বাস্তবে তা সম্ভবও নয়, তাহলে আল্লাহর রহমত হাসিলের জন্য আমাদের তো কোনো না কোনো চেষ্টা করা উচিত। শুধু স্বীয় ঘরে একথা লিখে

রাখলে যে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঘরে রহমত নাযিল কর" এতে তো আল্লাহর রহমত হাসিল হবে না।

আল্লাহর রহমত হাসিলের তরিকা হলো এ যে, আমরা কুরআন মাজীদের দিকে ফিরে আসব, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত এবং শ্রবণ জীবনের নিত্যনৈমত্তিক বিষয়ে পরিণত করা, কর্মজীবনে তাকে নিজের পরিচালক এবং পথ প্রদর্শক বানানো, বাচ্চাদেরকে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করানো, কুরআন মাজীদের অনুবাদ এবং তাফসীর শিখানো, তাদের অন্তরে কুরআন মাজীদের ভালোবাসা সৃষ্টি করা, কুরআন মাজীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যত গভীর হবে আমরা ততো বেশি রহমতের হকদার হব, আর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক যত কম হবে আমরা তত কম রহমত হাসিল করব। আর যদি কুরআন মাজীদকে পরিপূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে পরিপূর্ণভাবে নিজে নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা হবে। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে কি আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী না মুখাপেক্ষী নয়, অল্প মুখাপেক্ষী না বেশি?

فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا.

অর্থ: "অতএব যে চায় সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে।" (সূরা ইনসান ৭৬:২৯)

কুরআন মাজীদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আজ মানবজীবনে বিজ্ঞান এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে যে, মেডিকেল সায়েন্স ব্যতীত সায়েন্সের অন্যান্য শাখাগুলো থেকেও প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি বা কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হচ্ছে, যা থেকে অলৌকিকভাবে বিজ্ঞানের সাথে সাধারণ মানুষের আগ্রহ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের আয়াতসমূহের তাফসীরের ওপর বর্তমানে অনেক গ্রন্থও বের হয়েছে, কুরআন মাজীদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলার আগে আমি ওহীর জ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে এটা স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি যে, এ উভয় জ্ঞানের উৎস ভিন্ন ভিন্ন।

১. মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ.

অর্থ: "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে: এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে।" (সূরা যুমার ৩৯:৬)

আয়াতে উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্ধকারের অর্থ হলো মায়ের পেট, জরায়ু এবং ঐ থলি যেখানে বাচ্চা সংরক্ষিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান মানব সৃষ্টির এ অবস্থাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

২. আল্লাহর বাণী:

سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: "পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যমীন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সে সবকিছু থেকেও যা তারা জানে না।" (সূরা ইয়া-সীন ৩৬:৩৬)

বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে শুধু উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী লিঙ্গ এবং পুরুষ লিঙ্গের অস্তিত্বের কথাই সত্যায়ন করে নাই বরং অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ের মধ্যেও স্ত্রী লিঙ্গ এবং পুরুষ লিঙ্গের অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ করে।

৩. সূরা আল হুজুরাতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِيْنَ.

অর্থ: "আর আমি বায়ুকে উর্বরকারীরূপে প্রেরণ করি অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। তবে তোমরা তার সংক্ষণকারী নও।" (সূরা হিজর ১৫:২২))

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: কিছু কিছু বাতাস বাদলকে পানিতে পরিণত করে এবং বৃষ্টি হতে শুরু করে, আবার কিছু বাতাস বৃক্ষসমূহকে ফলবান করে দেয়, ফলে বৃক্ষ থেকে পাতা এবং ফল হতে শুরু করে। আধুনিক বিজ্ঞানও এ কথার প্রমাণ করেছে যে, কিছু কিছু চারাগাছ উৎপন্ন হওয়া এবং বৃক্ষের ফলবান হওয়ার বাতাস, পানি, পোকামাকড়, পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির ভূমিকা রয়েছে। আর এ সবগুলোর মধ্যে অধিক ভূমিকা হলো বাতাসের যা দীর্ঘসময় পর্যন্ত বৃক্ষসমূহের ফলবান হওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রভাব ফেলে।

৪. আল্লাহর বাণী:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ.

অর্থ: "তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" (সূরা আর রাহমান ৫৫:১৯-২০)

এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, লবণাক্ত এবং তিক্ত পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকে, অথচ মিষ্টি পানিতে লবণাক্ততা কম থাকে যার ফলে উভয় পানির ঘনত্বের পার্থক্য তাদেরকে পরস্পরের সাথে একাকার হয়ে যেতে বাধা দেয়, তাই সমুদ্রের মধ্যে কোথাও মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানির ভিন্ন অবস্থান আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যমতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪. এ যুগের বায়োলোজির প্রফেসর উইলিয়াম ব্রাউনের Journal of Plant Molecular মধ্যে একটি বিশ্লেষণ-ধর্মী প্রবন্ধ বের হয়েছে যেখানে সে গত কয়েক বছর বিশ্লেষণ করে এ বিস্ময়কর দর্শন পেশ করেছে যে, বিষুব রেখায় উৎপাদিত কচি বৃক্ষসমূহ নাড়ির নড়াচড়ার অনুরূপ ঢেউ বের হয়, যখন এ ঢেউসমূহকে Oscilloscope এর Monitor রেকর্ড করা হলো তখন তার আকৃতিটি আরবি الله শব্দের অনুরূপ ছিল, প্রফেসর এ বিষয়টি তার অন্যান্য বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করল তখন একজন মুসলিম প্রফেসর তাকে বললো: যে আরবি ভাষায় এটা الله শব্দ, সে সাথে সাথে এ আয়াতও তিলাওয়াত করে শুনাল–

وَاِنْ مِّن شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَه وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُوْراً.

অর্থ: "এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪৪)

নিঃসন্দেহে কুরআনের আয়াতসমূহের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে মিলালে শুধু একজন মুসলমানের অন্তর আনন্দই লাভ করে না বরং ঈমানও বৃদ্ধি পায় এবং কিছু সুস্থ আত্মার ধারক সুভাগ্যবান অমুসলিম এ সমস্ত আবিষ্কারসমূহ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে মুসলিমও হয়ে যায়, অতএব এ সমস্ত আয়াতসমূহ যেখানে বিজ্ঞান ও কুরআন পরস্পরের মাঝে মিল পাওয়া যায় তার তাফসীর করতে গিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের উদ্ধৃতি দেয়া মোটেও দূষণীয় নয়। কিন্তু এর অর্থ মোটেও এ নয় যে, কুরআন মাজীদ একটি বিজ্ঞানের গ্রন্থ যার উদ্দেশ্য মানুষকে

বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত করানো, বা বিজ্ঞানের জ্ঞানসমূহ উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা বা বিজ্ঞানের সেবাসমূহের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা। সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ: "আর আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা।" (সূরা নাহল ১৬:৮৯)

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থ: প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। এখান থেকে উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার জ্ঞান, যেমন: সায়েন্স, ইতিহাস, ভূগোল, ম্যাথমেটিক্স, জীবন উপকরণ ইত্যাদি। অথচ এটা ঠিক নয়, এখানে প্রত্যেক বিষয় বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ সমস্ত বিষয় যা মানুষের হিদায়াত লাভের সাথে সম্পর্ক রাখে, কুরআন মাজীদে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, যেমন: মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়সমূহ) সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, মানব অদৃশ্য সৃষ্টিসমূহ, আত্মা, জ্বীন, ফেরেশতাগণ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, মৃত্যু এবং বারযাখ (কবরের জীবন) সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, এ সমস্ত আয়াত এমন যে যার সম্পর্কে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত না কোনো ব্যাখ্যা করতে পেরেছে, না ভবিষ্যতে করতে পারবে। আর এ কারণেই ওহীর জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে অনবগত ব্যক্তিবর্গ এ সমস্ত স্থানে এসে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

এর কিছু উদাহরণ দ্র:

১. ডারউইন (১৮০৮ইং.... ১৮৮২) তিনি মানব সৃষ্টি সম্পর্কে উন্নত দর্শন পেশ করলেন, যার ধারণা মতে আজ থেকে দুই শত কোটি বছর আগে থেকে বিদ্যমান পানির উপাদান কারবন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে আশ্চর্যজনকভাবে একটি কোষের আকৃতি ধারণ করেছে, ঐ কোষটি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে গিয়ে জীব এবং উদ্ভিদের কোষের পৃথক পৃথক আকৃতি ধারণ করেছে, এরপর এ উভয় কোষ থেকে একটি প্রাণ বিশিষ্ট কোষ (অ্যামিবা) সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্বে লক্ষ, কোটি কোষের জীব যেমন: পিরামিসিম, সাইকোন, আবিয়া, জেলি মিসলী, পলিটেরিয়া, আইস কেরিস, জুনাক, (এগুলো বিভিন্ন রকম প্রাণীর নাম)। কেঁচো, মাছি, মশা, টিড্ডি, কাকড়া, ব্যাঙ, সাপ, পাখি, বানর এবং

এরপর মানুষ আর আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে বানর থেকে, এ হলো ডারউইনের উন্নত দর্শনের সার সংক্ষেপ।[১০২]

ওহীর জ্ঞান শূন্য ব্রেণ যদি এ ধরনের কাল্পনিক কথা বলে তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু যদি ওহীর জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবিদার ব্যক্তি এ ধরনের কাল্পনিক দর্শনকে মেনে নেয়ার জন্য কুরআন মাজীদের আয়াতকে অপব্যাখ্যা করতে শুরু করে বা সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করে তাহলে এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, এ ব্যক্তি মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে নাই বরং সে ডারউইনের প্রতি ঈমান এনেছে।"[১০৩]

এ মুহূর্তে আমার সামনে কুরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত তিন-চারটি বই আছে, যার মধ্যে ঘুরে ফিরে প্রায় একই রকম চিন্তা-চেতনা পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি বই হলো কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স যার লেখক উন্নত দর্শনকে প্রমাণিত করার জন্য শুধু কুরআনের আয়াতসমূহেরই অপব্যাখ্যা করে নাই এবং সহীহ হাদীসসমূহকেও অস্বীকার করেছে। যেমন: উন্নত দর্শনের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে ড. সাহেব বলেছেন: "উন্নত দর্শনের ওপর গবেষণা করার আগে দু'একটি ভ্রান্তির আপনোদন করুন, যা আমাদের দেশে ইহুদি নাসারাদের দেশ থেকে এসেছে[১০৪] এবং আমাদের দেশের একশ্রেণির লোক তা গ্রহণ করে নিয়েছে, অথচ এ সম্পর্কে কুরআনে কোনো ইঙ্গিতও নেই, প্রথম বিষয়টি হলো আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)-এর পিতামাতা ছিল না, আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এ যে, আদম (আ) এর পাজরের হাড্ডি থেকে হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১০৫]

"কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স" এ গ্রন্থের লেখকের এ দু'টি বক্তব্যই ভুল, আদম (আ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ.

অর্থ: আমি তাকে (আদমকে) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা সোয়াদ: ৭৫)

এ শব্দটি কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন নি, যা প্রমাণ করে যে, আদম (আ)- এর সৃষ্টি সাধারণ মানব সৃষ্টি থেকে

---

[১০২] প্রফেসর ড. ফজলুল করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স পৃ. ১২১-১২২।

[১০৩] উল্লেখ: এফ. এস. সি. মেডিকেল বিষয়ক পাঠ্যসূচিতে ডারউইনের এ কুফরীপূর্ণ উন্নত দর্শন এখনও অন্তর্ভুক্ত আছে, যার শিক্ষা মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া হচ্ছে।

[১০৪] ঐ লিখকের নিকট গ্রন্থকারের প্রশ্ন যে, তাহলে এ উন্নত দর্শনটি কোথা থেকে এসেছে?

[১০৫] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ. ১৪৪-১৪৬।

ভিন্নভাবে পিতামাতা ব্যতীত তিনি সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে হাওয়া (আ) কে আদম (আ)-এর পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে–

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ.

অর্থ: নারীকে পাজরের হাড্ডি বা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুর রিজা, বাব আল ওসিয়া বিননিসা, হাদীস: ১৪৬৮)

উন্নত দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উল্লিখিত লেখক

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ.

অর্থ: "যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (নিসা: ১)

এ আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেছেন: একটি কোষ।[১০৬]

এ তাফসীরটি কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতের বিরোধী। যেমন:

আল্লাহর বাণী:

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا.

অর্থ: "মানুষের ওপর কি কালের এমন কোনো ক্ষণ আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?" (সূরা দাহর/ইনসান ৭৬:১)

অথচ উন্নত দর্শনের আলোকে আদম (আ)-এর পূর্বে মাছি, মশা, টিড্ডি, পাখি, সাপ, ব্যাঙ, বানর এ সমস্তকি উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল?

২. ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া, রাসূল ﷺ-এর মেরাজে যাওয়া, এ উভয় ঘটনাই মু'জিযাসমূহের (অলৌকিক বিষয়) অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের লেখক ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়াকে এবং রাসূল ﷺ-এর মিরাজ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে বলেছেন: "এ সময়ে আমাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা এ ধরনের ঘটনাবলিকে মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) বলে মেনে নিতে বাধ্য। কেননা বিজ্ঞানের মূলনীতির আলোকে এ ঘটনা দু'টি ছিল লোক দেখানো বিষয়। যদিও আজ এ মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।"[১০৭]

---

[১০৬] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ. ১৪৫।

[১০৭] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ. ১৪৮।

অর্থাৎ যদি ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রাসূল ﷺ-এর মিরাজকে মু'জিযা মনে করা হয় তাহলে এটা সরাসরি অজ্ঞতা, আর যদি বিজ্ঞানের অজানা মূলনীতিসমূহকে এ ঘটনাগুলোর ভিত্তি বলে মেনে নেয়া যায় তাহলে এটা জ্ঞানের কাজ? বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি) ঈমান আনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং দৃশ্যমান বিষয়ে পূর্ণ ঈমান, এটাই হলো আমাদের বস্তুবাদ এবং নাস্তিকতাবাদী শিক্ষা নীতির ফলাফল। (দুনিয়া এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততা)।

২. কুরআন মাজীদের একস্থানে কাফিরদের ইসলাম বিদ্বেষকে নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে।

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.

অর্থ: সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ–সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। (সূরা আনআম ৬:১২৫)

এ উদাহরণে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে কাফিরদের জন্য ঈমান আনা এতটাই কষ্টকর যেমন কোনো মানুষের আকাশে আরোহণ কষ্টকর।

"কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স"-এর লিখক উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: কুরআন হাকীম শূন্যতাকে মনঃপূত করার জন্য মানুষের মধ্যে নড়াচড়ার শক্তি দিয়েছেন, এ আয়াতে আকাশের দিকে আরোহণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আমাদের পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ উপেক্ষা করেছেন, শেষে বিজ্ঞান আমাদের জন্য বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে। শূন্যতা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি এ মুহূর্তে যে অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি লাভ করেছে তাও কুরআন হাকীমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে।

তার এ তাফসীর এমন ব্যক্তির জন্য তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে কুরআন কারীমকে বিজ্ঞানসহ অন্যান্য সমস্তজ্ঞানের নিকট বিজিত বলে মনে করে, কিন্তু যে ব্যক্তি মনে করে যে, আদম সন্তানের জন্য কুরআন আল্লাহর পক্ষথেকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে সে এ ধরনের হাস্যকর এবং পূর্ব ও পরবর্তীর সাথে সম্পর্কহীন তাফসীরকে কী করে গ্রহণ করতে পারে?

৩. সূরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَن تَنفُذُواْ مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانفُذُواْ لاَ تَنفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ.

অর্থ: "হে জ্বিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমিনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না।" (সূরা আর রাহমান ৫৫:৩৩)

"কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স"-এর লেখক এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: হে জ্বিন ও মানবকুল তোমরা পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পারবে না, এরপর তিনি এও বলেছেন যে, তবে তোমরা 'সুলতানের মাধ্যমে বের হতে পারবে, লেখকের স্বল্পজ্ঞান এখানে 'সুলতান' বলতে শূন্যতা সম্পর্কীয় টেকনোলজিকে বুঝানো হয়েছে। যা আজকের যুগে রকেটই হতে পারে, যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী থেকে বের হয়ে চাঁদের সীমানায় প্রবেশ করেছে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শূন্যতাকে মুনঃপূত করার সুসংবাদ দিয়েছেন, আফসোসের বিষয় হলো মুসলিমগণ এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি পক্ষান্তরে প্রাচ্যবাসীরা শূন্যতাকে মনঃপূত করে মুসলিমদেরকে বিস্ময়কর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।[১০৮]

এ[১০৯] চিন্তা-চেতনার মূল ফলাফল হলো একদিকে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি আকর্ষণ অপর দিকে দুর্বল ঈমান এবং দ্বীনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকা, যার ফলে মানুষ তার চিন্তা-চেতনাকে তো কোনোভাবেই পরিবর্তনের আগ্রহ রাখে না, তবে ইসলামের বিধান, ইসলামী শিক্ষা , কুরআনের আয়াতকে পরিবর্তন এবং ক্ষত-বিক্ষত করতে মোটেও অন্যায় বলে মনে করে না।

৫. আহলে কিতাবগণ রাসূল ﷺ-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

অর্থ: "বল, রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮৫)

উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রূহের হাকীকত সম্পর্কে জানা যে কোনো মানুষের জন্যই সাধ্যাতীত, মানুষকে ঐ পরিমাণ জ্ঞান দেয়া হয় নাই যার মাধ্যমে সে রূহের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

---

[১০৮] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স, পৃ. ২০৭-২০৮।

[১০৯] পূর্বের বক্তব্যের ওপর লিখকের পর্যালোচনা।

'কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স'-এর লেখক রূহ সম্পর্কে লিখেছেন "লেখকের স্বল্পজ্ঞান অনুযায়ী রূহের সম্পর্ক হলো বাহিরের বাতাসের সাথে, আর আল্লাহ তা'আলা সেই রূহ আদম (আ)-এর মাটির দেহে দিয়েছেন তা বাতাসই হতে পারে[১১০] কেননা ফুঁ এর সম্পর্ক বাতাসের সাথেই হতে পারে, আর বাতাসের মধ্যে জীবনের অন্যতম প্রধান উপাদান অক্সিজেন রয়েছে, যদি অক্সিজেনের সরবরাহ এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায় তাহলে শরীরের ধ্বংস অনিবার্য, এ রূহই বাতাস থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষকে জীবিত রাখে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি এ যে, রূহ বা অক্সিজেন একই জিনিসের ভিন্ন নাম মাত্র, আর যদি তাই না হয় তাহলে রূহের মধ্যে অক্সিজেনের উপাদান অবশ্যই আছে।[১১১]

কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স'-এর সম্মানিত লেখক কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী লম্বা আলোচনায় একথা বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই যে, যদি রূহের হাকীকত তাই হয় যা উল্লিখিত লাইনসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ: "এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল:৮৫)

কেন বলা হলো যে, রূহের উল্লিখিত ব্যাখ্যা তো এতো সাধারণ ও সহজ যে মেট্রিক লেভেলের কোনো ছাত্রও তা অতি সহজে বুঝে নিবে?

৬. কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স'-এর লেখক স্বীয় গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি ঘটনা মি'রাজ সম্পর্কিত, মি'রাজ থেকে ফিরার পর মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে পরীক্ষা করার জন্য বাইতুল মাকদেস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বাইতুল মাকদিস সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলতে লাগলেন যেন ঐ মুহূর্তে তিনি তা দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কে, খন্দক খনন করার সময় যখন সাহাবায়ে কিরামগণ কষ্ট অনুভব করেছিলেন তখন রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ পাঠ করে কংকরের ওপর আঘাত করে বললেন: আল্লাহু আকবার! আমাকে সিরিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম আমি এ মুহূর্তে ওখানকার লাল প্রাসাদসমূহ দেখছি, দ্বিতীয় বার আঘাত করে বললেন: আমাকে পারস্য দিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি

---

[১১০] একথা লিখতে গিয়ে লিখক হয়ত ভুলে গেছে যে, সেতো ডারউইনের উন্নত দর্শনের প্রতিনিধি আদম (আ) এর মাটির শরীরে রূহ ফুঁকে দেয়ার আক্বীদা (বিশ্বাস) উন্নত দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী।
[১১১] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্স, পৃ. ১১৩-১১৫।

মাদায়েনের সাদা প্রাসাদ দেখছি, তৃতীয় বার আঘাত করে বললেন: আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়ামেনের চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে সানআর সিংহদ্বার দেখতে পাচ্ছি।

উল্লিখিত ঘটনাবলি রাসূল ﷺ-এর মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের লেখক এ ঘটনাবলি সম্পর্কে বলেছেন: ইসলাম প্রথম মাযহাব যা প্রথম টেলিভিশনের ধারণা দিয়েছে, এ ছিল উন্মুক্ত চোখের টেলিভিশন কোনো যান্ত্রিক সংযোগ ব্যতীত যেখানে না কোনো প্রচার স্টেশন ছিল, না কোনো দেখানোর যন্ত্র ছিল। এ দৃশ্যপট ঐ মূলনীতি থেকে কি কোনোভাবে ভিন্ন, যার ওপর টেলিভিশনের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।[১১২]

লিখক বলে দিলেন যে, রাসূল ﷺ-এর এ দেখা, সায়েন্সের ঐ সমস্তমূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যার ওপর টেলিভিশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেটা কোন সায়েন্সী নীতি? তা স্পষ্ট করার কষ্ট তিনি স্বীকার করেন নাই।

মূলত সম্মানিত লেখক শব্দের উলট-পালট করে মু'জিযা অস্বীকার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, অন্যথায় বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ-এর এ দেখা মু'জিযা ছিল। যেখানে কোনো দুরবিন বা এমন যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না যেখানে কোনো বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রয়োগ করা যায়, অথচ টেলিভিশনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং হেতু নির্ভর, আবার এর জন্য বিজ্ঞানের নীতিমালাও ব্যবহার হচ্ছে, এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতার সামান্যতম কোনো সম্পর্ক চোখে পড়ে না। আমার জানা নেই যে, সম্মানিত লেখক কোন ভিত্তির ওপর এতবড় দাবি করলেন যে, রাসূল ﷺ-এর এ দেখা টেলিভিশনের আবিষ্কারের একই নীতি?

৭. ফেরেশতা এবং জ্বিন জাতি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নকারীর জন্য এটা তো, পেরেশানীমূলক কোনো প্রশ্নেরই সৃষ্টি করে না, অবশ্য বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবিদের জন্য ফেরেশতা এবং জ্বিন জাতি এবং ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব সর্বদাই একটি সমাধানহীন বিষয় ছিল, কুরআন আওর জাদীদ সায়েন্সের লেখকও অসংখ্য ভুল বুলি আওড়ানোর পর বলছেন: "জ্বিন এবং ফেরেশতাগণের ব্যাপারে জানার জন্য আমাদেরকে বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির আরো উন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"[১১৩]

---

[১১২] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ. ২০১-২০২।

[১১৩] প্রফেসর ড. ফজলে করীম লিখিত কুরআন আওর জাদীদ সাইন্স, পৃ. ৩৩৪৫-৩৩৬।

এ কথার পরিষ্কার উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতা এবং জ্বিন জাতির হাকীকত সম্পর্কে বুঝার জন্য কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ যথেষ্ট নয়, বিজ্ঞানের ফতোয়া পাওয়া জরুরি, আর যতক্ষণ বিজ্ঞান এ বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা লাভ না করবে ততক্ষণ স্বীয় দ্বীন এবং ঈমান শূন্য হয়ে বসে থাকুন!

যখন কুরআন মাজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে চিন্তা করে পাঠ করা হবে এবং তার আয়াতসমূহকে বিজ্ঞানের সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে তখন তার ফল হবে পথভ্রষ্টতা।

অহীর জ্ঞান থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা মু'মিন ব্যক্তির জন্য এ দিক থেকেও পথভ্রষ্টতার কারণ হবে যে, মু'মিন ব্যক্তির জীবনের অধিকাংশ বিষয় গায়েবের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, অথচ বিজ্ঞানের জ্ঞানের সবকিছুই হেতু নির্ভর। যার ফলাফল এ দাঁড়ায় যে, সায়েন্সের জ্ঞান অন্বেষণকারী তার বাস্তব জীবনে সর্বদা সাগরে হাবুডুবু খাবে, আর যিনি হেতুর ঘটক তার ব্যাপারে অন্যমনস্ক থাকবে। সুনামী হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান বলে এলার্ম সিস্টেমে ঠিক থাকত তাহলে এ বিপর্যয় হতো না। রোগ বিস্তার করলে বিজ্ঞানের জ্ঞান বলে অমুক ভাইরাস বিস্তার লাভ করেছে তাই এ রোগ দেখা দিয়েছে, যদি তা না হতো তাহলে এ রোগ বিস্তার লাভ করত না। ভূমিকম্প হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ঐদিকে দৃষ্টি ফেরায় যে, ইমারত নির্মাণের ভুলনীতি অবলম্বনের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটল, যদি ইমারত নির্মাণের সঠিক নীতি অবলম্বন করা হতো তাহলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

যেন বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিক থেকে দুর্ঘটনার মূল কারণ মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল পথ অবলম্বন করা, আর তার সমাধান হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে উন্নত করা এবং সঠিক পথ অবলম্বন করা। অথচ অহীর জ্ঞান এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আল্লাহর ঐ বিধানের প্রতি আহ্বান করে:

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থ: "গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" (সূরা সাজদা ৩২:২১)

অহীর জ্ঞানের আলোকে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা আর তার সমাধান হলো আল্লাহর পথে ফিরে আসা।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক বিপদাপদেরই কোনো না কোনো কারণ থাকে, কিন্তু সমস্ত কারণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের মুখাপেক্ষী, তাই ওহীর জ্ঞান মানুষকে হেতুর আগে হেতুর যিনি ঘটক তার প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ

দেয়, অথচ বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে হেতুর ঘটক থেকে অন্যমনস্ক হয়ে হেতুর সাগরে হাবুডুবু খাওয়ায়, যার ফলে পরকালতো বরবাদ হয়ই এমনকি পৃথিবীতেও মানুষের আরাম ও শান্তি জুটে না।

মূলকথা হলো এ যে, আমাদের সন্তানদেরকে বিজ্ঞানের শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে, আমরা তার বিরোধী নই, কিন্তু পিতামাতার জন্য জরুরি হলো এ যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান শিখানোর আগে বা কমপক্ষে তার সাথে সাথে নিজের সন্তানদেরকে কুরআন হাদীসের শিক্ষা অবশ্যই দিবে, যেন ওহীর জ্ঞানের প্রতি তাদের ঈমান এতোটা গভীর হয় যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জ্ঞান তাদের ঈমানকে টালমাটাল করতে না পারে, আর তারা মৃত্যুর সময় স্বীয় রবের সাথে কৃত ঐ অঙ্গীকারের ওপর সুদৃঢ় থাকে।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

অর্থ: "হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৫৩)

কুরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার কিছু কারণ

মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজীদই একমাত্র উপায়, আর এখান থেকে দূরে রাখার জন্য মানুষের চিরশত্রু অসংখ্য বাধা দাঁড় করে রেখেছে এবং এ জন্য সে অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দলিলও প্রস্তুত করে রেখেছে।

যদিও এ ধরনের কারণ তো অসংখ্য, আবার এটাও হতে পারে যে, সামগ্রিক কারণ ব্যতীতও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কিছু বিশেষ কারণও রয়েছে, এখানে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করব, কোন কোন সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েও নিজে নিজেকে রোগী বলে মনে করে না, তবে রোগের অনুভূতি তখন হয় যখন বুঝে যে, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, কুরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যও তাই, যদি কেউ তার অজান্তে এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত থাকে বা এর মধ্য থেকে কোনো একটি রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে সে যেন ঐ রোগের চিকিৎসাহীন হওয়ার আগেই সে বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে। আমার দৃষ্টিতে কুরআন মাজীদ থেকে দূরে থাকার বড় কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা : যদি বলা যায় যে, আল্লাহ মানব জাতিকে যত নি'আমত দিয়েছেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমত হলো কুরআন মাজীদ, তাহলে এটা মোটেও কোনো অতিরঞ্জন হবে না। বাস্তবতা এ যে, ইহকাল এবং

পরকালের সমস্ত বরকত এবং কল্যাণসমূহকে একত্রিত করে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ আকারে তা আমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছেন।

কুরআন মাজীদ তার তিলাওয়াতকারীদের জন্য শান্তি, রহমত, হিদায়াত, আরোগ্যের কারণ। জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে সংরক্ষণকারী, আসমানী এবং যমিনী মুসিবত থেকে রক্ষাকারী, মানবজীবনের এমন কি প্রয়োজন এবং সমস্যা আছে সে বিষয়ে উপযুক্ত সমাধান কুরআন মাজীদে পেশ করা হয় নাই? কোনো রোগ এমন আছে যার চিকিৎসা দেয়া হয় নাই? কোনো প্রশ্ন এমন আছে যার উত্তর দেয়া হয় নাই? এ পৃথিবীর পর বারজাখের জীবনে কুরআন মাজীদ ঈমানদারগণের জন্য রহমত এবং মুক্তির কারণ হবে। বারজাখের পর পরকালেও কুরআন মাজীদ ঈমানদারগণের জন্য সুপারিশ, মর্যাদা বৃদ্ধি, সম্মান এবং গৌরবের কারণ হবে। মানুষ তার সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত কুরআন মাজীদের যতটা মুখাপেক্ষী অন্য কোনো কিছুর ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল মুসলিমদের একটি বিরাট অংশই কুরআন মাজীদের মর্যাদা সম্পর্কে অনবগত। সাধারণ মানুষের মনে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে শুধু এতোটুকু ধারণা আছে যে, এটা আমাদের পবিত্র গ্রন্থ। তাকে স্পর্শ করার আগে ওযূ করা, তাকে ধরেই চুম্বন করা, চোখে লাগানো জরুরি, রেশমের সুন্দর জুজদানে সুন্দর করে সাজিয়ে উঁচু স্থানে রাখা জরুরি। বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে বর কনেকে উপহার হিসেবে দেয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বর কনেকে তার ছায়া দিয়ে অতিক্রম করানো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে কসম এবং সাক্ষীর বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা, জ্বিন দূর করার জন্য কুরআনের সূরাসমূহের ওপর আমল করা, আরোগ্য লাভের জন্য তা তাবীজ হিসেবে ব্যবহার করা, প্রয়োজনের সময় তা থেকে বরকত কামনা, ঈসালে সাওয়াবের জন্য কুরআনখানি ইত্যাদিই মূল উদ্দেশ্য যার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিবেকে এ বিষয়টি দিয়ে দিয়েছেন যে যার উপকার এবং কল্যাণ সম্পর্কে সে অবগত তা লাভের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। একজন অশিক্ষিত সাধারণ শ্রমিকও জানে যে, ভালো কাজ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি, তাই সে হাড় কাঁপানো শীতের রাতেও উঠে এসে তার জমিতে কাজ করে, গরমে রোদের প্রখরতাকে উপেক্ষা করে কষ্ট স্বীকার করে কাজ করে, এমনিভাবে ব্যবসায়ী জানে যে, ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত ফায়দা তার কত উপকারী, তার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সে প্রতিদিন একাধারে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা তার ব্যবসার কাজে লিপ্ত থাকে, একজন ছাত্র জানে যে,

ইঞ্জিনিয়ারি ও ডাক্তারের ডিগ্রি কী মূল্য, তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ছাত্র ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতামাতা না থাকায় বা অন্য কোনো দুর্বলতা থাকায় বুদ্ধিমান ছাত্ররা কষ্ট করে পরিশ্রম করে ডিগ্রি অর্জন করার জন্য রাত-দিনকে একাকার করে দেয়। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র স্ব স্ব কাজে নিজের সফলতা লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। যেহেতু ঐ কর্ম থেকে উপার্জিত পারিশ্রমিক সম্পর্কে সে পরিপূর্ণরূপে অবগত আছে। কুরআন মাজীদ থেকে আমাদের গাফলতি এবং বেপরোয়া নীতির একটি মূল কারণ হলো এ যে, আমরা তার তিলাওয়াত, মুখস্থ, শিক্ষা র উপকার এবং কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। কুরআন মাজীদ থেকে আমাদের উপকার ঐ ব্যক্তির মতো যে হিরা এবং জাওহারের অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবীর মাটি যাচাই বাছাই করে চলছে অথচ তার ঘরেই হিরা এবং জাওহারের ধনভাণ্ডার পড়ে আছে।

হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন মাজীদ দিয়ে আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন, হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কুরআন মাজীদ থেকে গাফিল হয়ে আমরা কত বড় যুলুম করছি, যারা তাদের চোখ থেকে আজ গাফলতির পর্দা না সরাবে নিঃসন্দেহে সে কিয়ামাতের দিন আফসোস করে মাথা উঠিয়ে বলবে:

سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ.

অর্থ: "আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমরা যালিম ছিলাম।" (সূরা কালাম ৬৮:২৯)

২. পিতামাতার অমনোযোগিতা : জন্মের সময় সন্তানের স্মরণশক্তি একটি সাদা কাগজের ন্যায় থাকে, পিতামাতা সেখানে যে চিত্র অংকন করে দেয়, তার কথা জীবন ব্যাপী সন্তানের ব্রেনে থাকবে। বলা হয়ে থাকে–

اَلْعِلْمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ.

অর্থ: শৈশবে জ্ঞান অর্জন পাথরে চিত্র অঙ্কনের ন্যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক শিশু ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে আর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অগ্নিপূজক বানায়। (বুখারী)

তাই পিতামাতাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন বাচ্চারা কথাবার্তা বলতে শিখবে তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিবে। (ইবনুস সুন্নী)

যখন সন্তান সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিবে। (আবু দাউদ)

আর একথা তো স্পষ্ট যে নামায আদায়ের জন্য কুরআন মাজীদের কিছু সূরা মুখস্থ করা জরুরি, যার অর্থ হলো এ যে, সাত বছর বয়স হওয়ার আগেই সন্তানদেরকে কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া শুরু করা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো যে, অধিকাংশ পিতামাতা স্বীয় বাচ্চাদেরকে শিক্ষার সূত্রপাত করে পার্থিব শিক্ষার মাধ্যমে, মান-সম্মানের চেয়ে আরো মানসম্পন্ন খুঁজে, ভালো পোশাক, ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো বাসস্থান প্রস্তুত করে, সন্তানদের জন্য সর্ব প্রকার আরাম ও আয়েশের কথা চিন্তা করে, পানির মতো পয়সা খরচ করে। নিজে সর্বপ্রকার কষ্ট এবং পরিশ্রম স্বীকার করে যাতে করে সন্তান ভালো থেকে ভালো শিক্ষা হাসিল করে কোনো উঁচু পদ লাভ করতে পারে এবং সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু কুরআনের শিক্ষার জন্য পিতামাতা বিশেষ কোনো চিন্তাই করে না, কুরআনের শিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করাও কষ্টকর মনে হয়, আর তার জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করাতো মানাই যায় না। আর এভাবে অধিকাংশ পিতামাতা নিজের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিন্তা করুন এটা কি একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা নয় যে, আর কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সন্তানদের কিছু সংখ্যক ব্যতীত বাকিরা শুধু পিতা-মাতার সেবক বা তাদের হক আদায়ে দুর্বল হয়, এটাই নয় বরং কখনো কখনো লাঞ্ছনা এবং অবমাননারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে সন্তান এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং অবমাননার কারণ হবে সে পরকালে তার পিতা-মাতার কোনো কাজে আসবে কি? অথচ আল কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিতরা শুধু পৃথিবীতেই তাদের পিতামাতার সেবক এবং তাদের হক আদায়ে অভ্যস্ত হয় না বরং পরকালেও তাদের পিতামাতার জন্য সাদকা জারিয়া হবে। তাই পিতামাতাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন মাজীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে তারা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা শুধু নিজেদের প্রতিই যুলুম নয় বরং সন্তানদের প্রতিও যুলুম। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: "বল, নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ, এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা যুমার ৩৯:১৫)

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে স্বীয় দয়া এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করুন! আমীন।

৩. টেলিভিশনের ফিতনা : এমনিই তো প্রতিদিন নতুন নতুন ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে, যা মুসলিমদেরকে এ পবিত্র গ্রন্থ থেকে দ্রুত দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু টেলিভিশন এ সমস্ত ফিতনার তুলনায় বড় ফিতনা। টেলিভিশন আবিষ্কারের আগে সাধারণত মুসলিম পরিবারসমূহের অভ্যাস ছিল এ যে, পিতামাতা ফজরের নামাযের সময় উঠত এবং ফজরের নামায আদায় করার পর কুরআন তিলাওয়াত করত, বাচ্চাদেরকে নামাযের জন্য উঠাত, নামায আদায় করানোর পর তাদেরকে মহল্লার কোনো কোনো বাসায় বা মসজিদে কুরআন শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিত, এরপর স্কুলের সময়ে স্কুলে যেত, ঘরের লোকেরা তাদের প্রতিদিনের রুটিনের কাজ শেষ করার পর সন্ধ্যার পর খাবারদাবার শেষ করে মাগরিবের পর পিতামাতা স্বীয় সন্তানদেরকে নবী জীবনী, সাহাবাগণের চরিত্র শুনাতো। ছোট ছোট সূরাসমূহ এবং দু'আ-দুরূদ ইত্যাদি মুখস্থ করাত। ইশার নামাযের পরপরই বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতো এবং পিতামাতাও শুয়ে যেত। কোনো প্রয়োজন ব্যতীত ইশার নামাযের পর জাগ্রত থাকা পরিকল্পনাও করা যেত না, এ ধারাবাহিকতায় বাচ্চারা মেট্রিক পাস করতে করতে কুরআন মাজীদ নাযরানা (দেখে দেখে) পড়ে একবার খতম দিতে পারত। ৩০তম পারার কিছু ছোট ছোট সূরা মুখস্থ করে নিতে পারত, ইসলাম সম্পর্কে কিছু না কিছু শিক্ষা স্কুল থেকে পেয়ে যেত, আর কিছু শিখতে পারত বাড়িতে পিতামাতার কাছ থেকে। এভাবে প্রত্যেক সন্তান ইসলামের মূল আকীদা, বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারত। কর্মজীবনে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় আরো সংযোজন হওয়ার কারণ হতো।

টেলিভিশন মানুষের মেজাজ, কর্ম, অভ্যাস, আচরণ, রুচি, সম্মানবোধকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সকাল বেলা চোখ খোলামাত্রই দিনের শুরু হয় টেলিভিশনের প্রোগ্রাম সূচি দেখা এবং শুনার মাধ্যমে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহম করেছেন তারা ব্যতীত। বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের এক চোখ থাকে টেলিভিশনের ওপর আর অপর চোখ থাকে তার প্রস্তুতির ওপর। স্কুলেও বাচ্চাদের বেশিরভাগ সময় কাটে টেলিভিশনের নাটক, সিনেমা, খেলাধূলা, আরো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করে। স্কুল বা অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ আরাম করার পর পরিবারের সকলে এক সাথে টেলিভিশনের সামনে নিজ নিজ পছন্দের অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, আর এ ধারাবাহিকতা রাতে শোয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। আর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কয়েক দিন

আগে থেকেই পরিবারের সকল সদস্য বেশ আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে। জীবন যাপনের এ পদ্ধতি মানুষকে কুরআন মাজীদের শিক্ষা তো বটেই এমনকি আল্লাহর হক এবং মানুষের হক আদায় করা থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে। টেলিভিশন শুধু মানুষের পরকালই নয় বরং পার্থিব দিক থেকেও ক্ষতির কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানীদের মতে টেলিভিশন দেখার কারণে ক্ষতির যে প্রভাব বিস্তার হয় তা নিম্নরূপ:

১. দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ৬৪%

২. বাচ্চাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা ৬৩%

৩. সাধারণ পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত ৬৩%

৪. শারীরিক দুর্বলতা ৪৬%

৫. শারীরিক ব্যায়াম থেকে বঞ্চিত ৪৪%

নিউজিল্যান্ডভিত্তিক শিশুবিষয়ক এক সংস্থা 'ডিইউনুডিন রিচার্স ইউনিট' এর সহকারী ডাইরেক্টর বাব বনকোকেস ৩০ বছর পর্যন্ত এক হাজারের অধিক শিশুর জীবন যাপনের ওপর পরীক্ষা চালায়, যার ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

যে বাচ্চা প্রতিদিন একঘন্টার অধিক টেলিভিশন দেখে সে লেখাপড়া করতে পারে না, যে বাচ্চা একঘন্টা থেকে কম সময় টেলিভিশন দেখে সে লেখাপড়া করতে পারে, আর যে বাচ্চা মাঝে মাঝে টেলিভিশন দেখে শুধু সেই বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে এসে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে।[১১৪]

ধর্মীয় দিক থেকে একটি ফিতনা ঘরে প্রবেশ করলে এর সাথে চুপে চুপে আরো কত ফিতনা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে তার প্রতিও একটু দৃষ্টি দেয়া যাক।

ক. ছবির ফিতনা : ছবি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন: কিয়ামতের দিন বেদনাদায়ক শাস্তি হবে তার যে ছবি উঠায়। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীসে যে ব্যক্তি ছবি উঠায় তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হয়তো এতো কঠিন শাস্তি র কথা মানুষ অনুভব করতে পারত না, কিন্তু বর্তমানে তা পরিপূর্ণভাবেই বুঝা যাচ্ছে, যে পর্দায় আগত কোনো নারী বা পুরুষের ভেসে উঠা চলমান রঙিন ছবি মানুষকে এতো আকর্ষণ করছে যে, তা উপভোগকারীকে স্বাভাবিকভাবেই এতো যাদুময় করে রাখে যে, প্রত্যেক

---

[১১৪] উর্দু নিউজ, জিদ্দা, ২২ জুলাই, ২০০৫।

দর্শক ঐ রকম হওয়া পছন্দ করে যেমন নায়ক নায়িকাকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এ কথাও জেনে রাখুন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্কের সূত্রপাত ছবিকে কেন্দ্র করেই হয়েছে।[১১৫]

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ব্যক্তি পর্দায় বা স্ক্রিনে ভেসে উঠা ছবিকে সহজভাবে নিয়ে তাকে বৈধ মনে করে থাকে, যা মূলত সরাসরি ধোঁকা। কেননা ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি হাতে অংকিত ছবির ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকে, তাই ইসলামের দৃষ্টিতে হাতে অংকিত ছবি এবং ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি উভয়ের বিধান একই।

খ. গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদেরকে দেখা : ইসলামের দৃষ্টিতে গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) সে সমস্ত নারী এবং পুরুষকে দেখা চোখের ব্যভিচার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

টেলিভিশনের সামনে বসে নারী-পুরুষগণ যতক্ষণ তা দেখতে থাকে ততক্ষণ তারা এ পাপে লিপ্ত থাকছে।[১১৬]

গ. গান-বাজনা : গান-বাজনা আল্লাহর আযাবের কারণ, নবী ﷺ বলেছেন: যখন গান-বাদ্যযন্ত্র, গান-বাজনাকারী নারী বিস্তার লাভ করবে তখন ভূমিধ্বস, পাথর বৃষ্টি, আকৃতি পরিবর্তন ইত্যাদি আযাব আসবে। (ত্বাবারানী)

যারা টেলিভিশন দেখে তাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায় ঐ পাপে লিপ্ত থাকার মধ্য দিয়ে।

ঘ. ফ্যাশন পূজা: টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী লোকেরা নিজেদেরকে সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্য নিত্যনতুন ফ্যাশনকে বেছে নেয়, আর সাথে সাথে

---

[১১৫] বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, আয়াত: লাতাজারু ন্না ওদ্দাও ওলা সূয়াআ ওলা ইয়াগুসা।

[১১৬] ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আজ কোথাও কোথাও "ইসলামী টেলিভিশন" চালু করার কথা খুব চাতুরতার সাথে চিন্তা -ভাবনা চলছে, আচ্ছা ধরু ন ইসলামী টেলিভিশনে কোনো নারী আসল না, শুধু পুরু ষরাই আসবে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, ঐ পুরু ষকে কি গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) ঐ সমস্ত নারীরা দেখবে না? না ইসলামী টেলিভিশন থেকে এ সাধারণ হাদীসটি রহিত হয়ে যাবে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইর মাহরামদেরকে দেখা চোখের ব্যভিচার বলেছেন? আধুনিক টেকনলোজির মাধ্যমে অন্যায় এবং অশ্লীলতা বিস্তারের প্রতিবাদে আধুনিক টেকনোলোজির মাধ্যমে দ্বীন এবং সাওয়াবের কাজ বিস্তার করার যুক্তিতো বাস্তবেই মনঃপূত। কিন্তু তার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল আছে কি? নূহ (আ) -এর যুগে যে ভালো কাজটির একেবারেই কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া ব্যতীত ছবির মাধ্যমে শুরুহয়েছিল সেটাই আস্তেআস্তেবড় কবীরা গুনাহ অর্থাৎ শিরকে গিয়ে পৌছেছিল। আর এ উদাহরণ তা আমাদের চোখের সামনে যে কোন মুসলিম দেশে প্রথমে টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরুহয় এভাবে যে সেখানে কোন নারীরা কণ্ঠও ছিল না, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এ দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমা ধাঁচের ফিল্ম, নাটক অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদ আমাদেরকে একটি মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছে যে, অর্থ: "মন্দের জওয়াবে তাই বলুন যা উত্তম। (সূরা মুমেনুন: ৯৬)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে: ويدرءون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار

ঐ বেসভূষাকে দর্শকরাও বেছে নেয়ার জন্য চেষ্টা করে, আর এ সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতিকে ধুলিস্যাৎ করে অপসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে, টেলিভিশন আসার আগে কোনো নারীর বিনাপর্দায় ঘর থেকে বের হওয়া দূষণীয় বলে গণ্য হতো, আর টেলিভিশন আসার পর প্রথমে পর্দা খতম হলো, এরপর মাথা থেকে চাদর সরে গেল, এরপর ওড়না দূর হলো এরপর শার্ট কামিসের প্রচলন। আবার রয়েছে ফ্যাশন পূজার জন্য বিউটিপার্লার, হেয়ার প্রেসার, পলিক্লিনিক ইত্যাদি এখন পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গড়ে উঠেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিছু কিছু নারী পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে, পুরুষদেরকে নিজের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে, নিজে পর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ ধরনের নারী জান্নাতেরও সুঘ্রাণও পাবে না। (মুসলিম)

ঙ. বে-হায়াপনা : বালিগ এবং নাবালিগ সন্তান তাদের পিতামাতার সাথে বসে টেলিভিশনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা উপভোগ করা, প্রেম, ভালোবাসার ওপর ভিত্তিকৃত নাটক, সিনেমা দেখা, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গান শ্রবণ, নারী-পুরুষের অর্ধালুঙ্গপনা, চরিত্র নষ্টকারী দৃশ্যাবলি দেখা, বাচ্চাদের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক লজ্জা-শরমকে শেষ করে দেয়। টেলিভিশন চালু হওয়ার আগে শুধু মেয়েরাই কেন বরং ছেলেরাও বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে পিতামাতার বিরোধিতা করার সাহস করত না। কিন্তু টেলিভিশন আসার পর মেয়েরাও নির্দ্বিধায় পিতা-মাতার সামনে সরাসরি বলে ফেলে যে, আমি ওমুকের সাথে নয় অমুকের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হব। আর কখনো যদি পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভুল সিদ্ধান্তে অমত হয় তাহলে ছেলেমেয়েরা তার পছন্দের ব্যক্তির সাথে পলায়ন করতে এবং কোর্টে গিয়ে বিয়ে করাকে মোটেও তারা দূষণীয় মনে করে না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যখন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে পিতামাতার সাথে বসে বিনা দ্বিধায় নাটক সিনেমা দেখে শিক্ষা হাসিল করে তখন তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা পূরণে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কে দেখাবে?

টেলিভিশনের পরে ডিস, ভিডিও, ইন্টারনেট মোবাইল ইত্যাদি আমাদের সমাজকে যেভাবে বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতার অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করছে তার অনুমান নিচের সংবাদসমূহ থেকে অনুভব করুন:

রাওলাপিণ্ডির একটি ইন্টারনেট ক্যাফেতে গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে অশ্লীল সাইট দেখার সময় কিছু যুবক যুগলের সিডি তৈরি করা হয়েছে, যা চার পাঁচ হাজার রূপীর বিনিময়ে বাজারজাত করা হয়েছে, যখন সংশ্লিষ্ট যুবক যুগলের পরিবার

তাদের সম্পর্কে জানতে পারল তখন এ ঘটনায় জড়িত তিন মেয়ে আত্মহত্যা করে, অপর জনকে তার পিতা হত্যা করেছে।[১১৭]

এরপর মোবাইলের ফিতনা : এ ফিতনার ফলে মানুষের মাঝে যতটুকু লজ্জা শরম ছিল তাও শেষ করে দিয়েছে। মোবাইল না থাকতে যুবক ছেলেমেয়েরা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতো, সার্বিক সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও টেলিফোন কল ঘরের অন্য কোনো সদস্য শুনে নিলে গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সর্বদা মাথায় থাকত। এরপর পিতামাতার শাসন সন্তানদেরকে সর্বদা ভয়ে ভিত করে রাখত, মোবাইল এ সমস্ত বাধা দূর করে দিয়েছে। পিতামাতা কিছুই জানতে পারে না, ঘরের ভিতরে এমন বেদনাদায়ক ঘটনা জন্ম দিচ্ছে, আর পিতামাতা মাথায় হাত রাখছে। এভাবে বেহায়া সংস্কৃতি জন্ম নিচ্ছে আর কে তা করছে? ফিতনার মূল টেলিভিশন।

চ. অপরাধ বিস্তৃতি : যুবক যাবতীরা টেলিভিশনে মারামারি, হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি, গুম, মদ, ব্যভিচার, জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদির ওপর প্রচারিত সিনেমা দেখে নিজেরা সেগুলোর অভিনয় করতে শুরু করে, আবার কিছু কিছু শিক্ষিত এবং উঁচু পদের অধিকারী লোকদের সন্তানেরা এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়াও ঐ পছন্দনীয় অভিনয়ের ফল মাত্র।

ছ. সময়ের অপচয় : একটি সরাসরি উপহার হিসেবে টেলিভিশনের প্রতি মুগ্ধ ব্যক্তিরা প্রতিদিন মোটামুটি চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে থাকে, একজন সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভ্যাসকে সামনে রেখে যদি ২৪ ঘণ্টাকে ভাগ করা যায় তাহলে এ ফলাফল দাঁড়ায়:

টেলিভিশনে- ৪ ঘণ্টা।

ঘুম- ৬ ঘণ্টা

পেশাগত কাজ- ১০ ঘণ্টা

অন্যান্য কর্মকাণ্ড- ৪ ঘণ্টা

অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে সন্তানের শিক্ষা -দিক্ষা, ওষুধ, চিকিৎসা, বাজার খরচ, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, আত্মীয়-স্বজনদের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখা ব্যক্তি যদি ৬০ বছর বেঁচে থাকে তাহলে সে ৬০ বছরে মধ্যে পূর্ণ ১০ বছর টেলিভিশন দেখে অতিক্রম করেছে।

---

[১১৭] হাফতা রোযা সহিফা আহলে হাদীস, করাচী, ১২ মার্চ, ২০০৫ইং।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব না দিবে ততক্ষণ সে এক পা নড়াতে পারবে না। (তিরমিযী)

একাধারে ৯ বা ১০ বছরের পাপের হিসাব আমরা কীভাবে দিব? আর টেলিভিশন আমাদেরকে একথা চিন্তা করার সুযোগই বা কখন দিচ্ছে? সময়ের মূল্যায়ন আমাদের নিকট তখনই হবে যখন কোনো ব্যক্তি পৃথিবী সমান সোনা রূপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার বিনিময়ে একটু সময় চাইবে যে সময়ের মধ্যে সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সুযোগ পাবে, কিন্তু তাকে সে সুযোগও দেয়া হবে না। (হাদীসের ভাবার্থ)।

জ. বান্দার হক আদায়ে দুর্বলতা : টেলিভিশনের নেশা আমাদেরকে এতো বেহুশ করে রেখেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের বন্দনায় বন্দী করে রেখেছে, ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এক ভিন্ন পৃথিবীতে অতিবাহিত করছে যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঘরে বিদ্যমান দাদা-দাদি, বা নানা নানি, বা অন্য কোনো ব্যক্তি আমাদের টেলিভিশন দেখাকে খারাপ মনে করে না, ঘরে আসা-যাওয়াকারী মেহমানদের চাই আপ্যায়ন হোক বা না হোক, আমাদের আশপাশে প্রতিবেশী মারা যায়, বা জন্মগ্রহণ করে? আমাদের দূরবর্তী কোনো আত্মীয় কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নয়তো? কোনো গরিব বা মিসকিন তার কোনা অসুস্থ বাচ্চা ঔষধের জন্য কাতর হয়ে নেইতো? টেলিভিশনের নেশা আমাদেরকে এতোটুকু হুঁশ কোথায় দিচ্ছে যে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করব?

ঝ. আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে দুর্বলতা : উপরে দেয়া সংক্ষিপ্ত হিসাবটির ওপর একটু চিন্তা করুন, যে ঘরে টেলিভিশন আছে ঐ ঘরের অন্যান্য কার্যাবলির জন্য চার ঘণ্টার মধ্যে নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কতটুকু সময় পাওয়া যাবে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকেও কুরআন মাজীদ এবং টেলিভিশন দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয়, যে ঘরে কুরআন মাজীদ শিখার ব্যবস্থা থাকে সে ঘরে কোনোভাবেই টেলিভিশন থাকার সুযোগ নেই। আর যে ঘরে টেলিভিশন দেখা যাবে সে ঘরে কুরআন শিখার পরিবেশ থাকবে না। আমার মতে টেলিভিশন কুরআন মাজীদ থেকে দূরে রাখার সবচেয়ে বড় বাধা। ঐ এক ফিতনা ঘরে আসার সাথে সাথে আরও অসংখ্য ছোট বড় ফিতনা ঘরে চলে আসে যে ব্যাপারে মানুষ অনুভবও করতে পারে না। চারিত্রিক দিক থেকে টেলিভিশনের নেশা হিরোইনের নেশা থেকে কয়েক গুণ বেশি ভয়ানক এবং ক্যান্সারের চেয়ে

কয়েকগুণ বেশি ক্ষতিকর রোগ যা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নতুন প্রজন্মকে নষ্ট করার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে চলছে। কেউ কি চিন্তা করার মতো আছে?

৪. কঠিন গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করার ভ্রান্ত ধারণা : কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কিছু কিছু লোক এ ভ্রান্তিতে আছে যে, এটা একটি কঠিন গ্রন্থ, এটা পড়া এবং বুঝা সবার কাজ নয়, শুধু আলেমগণই এ গ্রন্থ পড়তে এবং বুঝতে পারবে, এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকেরা হয় কুরআন মাজীদে মোটেও দৃষ্টি দেয় না আর না হয় শুধু তিলাওয়াত করা পর্যন্তই তাদের শেষ সীমা। কুরআন মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ এ চিন্তা ঐ ব্যক্তি তো রাখতেই পারে, যে কখনো কুরআন মাজীদ পড়ার বা বুঝার জন্য চেষ্টা করে না, কিন্তু বাস্তবতা হলো এ যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজীদের চেয়ে অধিক সহজ এবং সর্বজনের জন্য উপযোগী আর কোনো কিতাব নেই। মক্কার কাফিরদের যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল তা হলো তাওহীদ, রিসালাত পরকালে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে, যা কুরআন মাজীদে বারবার বিভিন্নভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এ সন্দেহসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ কোথাও দর্শন বা তর্কের আশ্রয় নেয় নাই, বরং অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় বিভিন্ন স্থানে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করেছে।

তাওহীদ সম্পর্কে বুঝানোর জন্য প্রতিনিয়ত মানুষের সামনে দৃশ্যমান বিষয়সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনঃ মানব সৃষ্টি, আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি, রাত-দিন, নদী-নালা, চাঁদ-সূর্যের উদয় এবং অস্ত, মৌসুম পরিবর্তন, নদীপথে চলার সময় নৌযান তুফানে পতিত হওয়া এরপর ওখান থেকে রক্ষা পাওয়া, এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন ব্যবহার্য বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করার জন্যও আহ্বান করা হয়েছে যে, চিন্তা কর এবং বল যে এগুলোকে কে সৃষ্টি করেছে? যেমনঃ পানি, দুধ, মধু, ফল, সবুজ, খনিজ সম্পদ, আবাদী জমি, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করুন। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতার এমন পর্যায়েও থাকতে পারে যে, কখনো আকাশ ও পৃথিবী দেখে নাই বা বাতাসে উড়ে বেড়ানো পাখি দেখে নাই, বা গরু-ছাগল, উট দেখে নাই, বা দুধ, মধু সম্পর্কে অবগত নয়। বাস্তবতা হলো এ যে, কুরআন মাজীদ প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে নিন, কোথাও আপনি এমন একটি আয়াত পাবেন না যেখানে মানুষের হিদায়াতের কথা আলোচনা করা হয়েছে অথচ তা সর্বসাধারণের বুঝতে কষ্টকর।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মক্কার কাফিররা অসংখ্য প্রশ্ন করেছে কিন্তু এ কথা কখনো বলে নাই যে, আমাদের বুঝার উপযোগী নয় বা এটাতো শুধু আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরাই বুঝতে পারে।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থ: "আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (সূরা কামার ৫৪:১৭)

মূলত কুরআন-মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ এ প্রচারণা কেবলমাত্র খানকার পূজারীরা করে চলছে, যাদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী।

বুযুর্গগণ মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকেন তাদের এ বিশ্বাস, তারা আরো বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পূজারীদের আহ্বান শ্রবণ করে, তারা এ বিশ্বাসও রাখে যে বুযুর্গরা তাদেরকে ফয়েজ দিয়ে থাকে, তাদের মনের মাকসুদ পূর্ণ করে থাকে, বিপদাপদে তাদেরকে সাহায্য করে থাকে, আল্লাহর নিকট সুপারিশ করা এবং স্বীয় মুরীদদেরকে ক্ষমা করাতে পারবে। অসুস্থদের সুস্থতা লাভের জন্য তাদের মাযারের আরোগ্যদাতা মাটি হাসিল করা, মাযারে সূতা বাঁধা, তাদের নামে নযর-নেয়ায পেশ করা, বাতি দেয়া, ফুল যুক্ত চাঁদর দেয়া, কবরে চুমু দেয়া, কবরের সামনে নত হওয়া এবং সিজদা করা, কবর ধৌত করা, আর তাদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য উৎসব করা, ওরস করা, মেলা পার্বণকে গুরুত্ব দেয়া, পুরুষদের জন্য আরবি 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু ঐ সমস্ত সূরার চিত্র অঙ্কন করা, কুরআনখানি করা, আবদুল কাদির জিলানীর নাম বলে বাধন দেয়া এ সমস্ত কাজ এমন যে, কুরআন সুন্নাহের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। তাই খানকার খাদিমরা কুরআন মাজীদ একটি কঠিন গ্রন্থ বলে লোকদেরকে তার শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে চায়, খানকার খাদিমরা ভালো করে জানে যে, কুরআন মাজীদের শিক্ষা যদি ব্যাপকতা লাভ করে আর খানকা থেকে দ্বীন বাহিরে চলে যায় তাহলে তাদের খানকা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে যাবে।

পরিশেষে আমরা এটাও স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি যে, কুরআন মাজীদের কোনো কোনো অংশ বাস্তবেই ব্যাখ্যার দাবি রাখে কিন্তু কোনো গ্রন্থের কোনো অংশ কঠিন বলে সে গ্রন্থে একেবারেই দৃষ্টি দেয়া যাবে না তা কি যুক্তিসংঙ্গত কথা? যদি কোনো ছাত্র ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্রির কোনো ফর্মূলা বুঝতে না পারে তাহলে কি তার ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্রি পড়া বাদ দিয়ে দেয়া ঠিক হবে? না এ ফর্মূলাটি কোনো ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে? প্রত্যেক জাগ্রত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি এ উত্তর দিবে যে, তার উচিত হবে কোনো ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে তা বুঝে নেয়া, এমনিভাবে কুরআন মাজীদের কোনো একটি

আয়াত বা বিধান বুঝতে না পারলে তা কোনো দ্বীনী আলেমের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

শুধু কঠিন গ্রন্থ এ বাহানা দিয়ে আজীবন তাতে দৃষ্টি না দেয়া, বা তা তিলাওয়াত করার জন্য বা বুঝার জন্য চেষ্টা না করা, এটা একান্তই শয়তানী চক্রান্ত। যদি কোনো ব্যক্তি এ ভ্রান্তিতে পতিত থাকে, তাহলে তার উচিত দ্রুত এ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিদায়াত লাভের জন্য দু'আ করা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ: "আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা মু'মিন ৪০:৬০)

৫. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : ইংরেজরা আমাদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল এ যে, উপমহাদেশের মুসলিমরা যদি কাফির নাও হয় তবে কমপক্ষে তারা যেন মুসলিমও না থাকতে পারে, ইংরেজরা তাদের এ উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছে, আফসোস! ইংরেজরা যাওয়ার পর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ রকমই রয়ে গেছে, পাঠ্যপুস্তক চাই ইতিহাস সংক্রান্ত হোক আর মেডিকেল সায়েন্স সংক্রান্ত হোক, রাজনৈতিক হোক আর ভূমি বা খাদ্যনীতি হোক, বিজ্ঞান সংক্রান্ত হোক আর দর্শন সংক্রান্ত, তার কোথাও আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর হিকমত, এ ধরনের কোনো শব্দ না আগে ছিল আর না এখন আছে। যার ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, আগে যেমন এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বে-দ্বীন এবং আল্লাহর বিমুখ ব্যক্তি গড়ে উঠেছে আজও তাই হচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পর যে পরিবর্তন এসেছে, তাহলো এ যে, যে ছাত্র নিজে আরবী ভাষা পড়তে আগ্রহী হবে তার জন্য এ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যে, সে তা শিখতে পারবে, কিন্তু কুরআন মাজীদ পড়তে এবং বুঝতে আরবি ভাষাকে অপরিহার্য করে সিলেবাসে তা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কখনো অনুভব করে নাই।

ইসলামিয়াতকে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বটে কিন্তু তার সিলেবাস এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, তা পড়ার পর একজন ছাত্র বাহ্যিকভাবে তো মুসলিম হয়ে যায় কিন্তু এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে কুরআন মাজীদকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করার আকীদা (বিশ্বাস) সুদৃঢ় হবে এ ধরনের সিলেবাস প্রস্তুত করার জন্য আমাদের ইসলাম প্রিয় সরকার কখনো প্রস্তুত ছিল না। বর্তমান সরকার সম্পর্কে একমত যে, সে ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছে,

ইসলামের শত্রুতার সমস্তসীমা অতিক্রম করেছে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে সেক্যুলার বানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছে, ইসলামী কৃষ্টি-কালচারকে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে, ইসলামী বিধি-বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে বিন্দু পরিমাণে দ্বিধা করছে না, এসব কথা একেবারেই সত্য কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এ যে, আমাদের সরকার কি আকাশ থেকে হঠাৎ অবতীর্ণ হয়েছে? না পৃথিবী থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হয়েছে? আমাদের সরকার যা কিছু বলছে এবং যা কিছু করছে তাতো তারই প্রতিফল, যা সে রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা পেয়েছে, আজ যদি আমরা সরকারকে খারাপ চোখে দেখি তাহলে এ খারাপের কারণ হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ।

তাই আমরা যদি আমাদের জাতিকে কুরআন শিখানোর প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে চাই তাহলে তার প্রাথমিক স্তর হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ তার কুপ্রভাব নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

৬. বয়ঃবৃদ্ধির অজুহাত : কিছু লোক অল্প বয়সে যে কোনো কারণে কুরআন মাজীদের শিক্ষা হাসিল করতে পারে নাই কিন্তু পরবর্তীতে যখন সে তার এ দুর্বলতা অনুভব করতে পারে তখন সে শুধু বয়ঃবৃদ্ধতাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করে। এটা ইতিবাচক চিন্তা নয়, বয়সের যে পর্যায় আল্লাহ মানুষকে হিদায়াত দিবে ঐ পর্যায়েই সে কুরআন শিখতে শুরু করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সে ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে আস্তে আস্তে কুরআন তিলাওয়াত করে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (ত্বাবারানী)

এ হাদীসে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই, সাহাবাগণ বিভিন্ন বয়সে ঈমান এনেছেন এবং যে বয়সেই ঈমান আনতেন তখনই তারা কুরআন শিখার কাজে লেগে যেত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করবেন যতক্ষণ না তার গরগরা শুরু হয়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

এ হাদীসেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হিদায়াত দিবেন তখনই সে কুরআন শিখা শুরু করবে এবং এ ক্ষেত্রে মোটেও কোনো সংকোচবোধ করবে না। বলা হয়ে থাকে যে, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।

তাই কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষকে কোনো প্রকার সংকোচবোধ করা ঠিক নয়, চাই সে মানুষ বৃদ্ধ বয়সের লোকই হোক না কেন, নিয়তের পরিশুদ্ধিতার কারণে আল্লাহ মানুষের অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছিল, সে তাওবা করার ব্যাপারে একজন দরবেশকে জিজ্ঞেস করেছিল উত্তরে সে বললো: তোমার তাওবা কবুল হবে না, ঐ ব্যক্তি তখন দরবেশকেও হত্যা করল, এরপর সে একজন আলেমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন ঐ আলেম বললো: হ্যাঁ, তোমার তাওবা কবুল হতে পারে, তবে একটি শর্ত সাপেক্ষে, আর তা হলো এ যে, তুমি পাপী লোকদের এলাকা ছেড়ে সৎ লোকদের এলাকায় হিজরত করবে, হিজরত করার সময় রাস্তায়ই সে মৃত্যুবরণ করল, রহমত এবং আযাব উভয় দলের ফেরেশতাগণ তার রূহ কবজ করার ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, উভয় অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব দেখ, যদি সৎ লোকদের অঞ্চল নিকটবর্তী হয় তাহলে তার রূহ রহমতের ফেরেশতারা কবজ করবে, আর যদি খারাপ লোকদের অঞ্চল নিকটবর্তী হয় তাহলে তার রূহ জাহান্নামের ফেরেশতারা কবজ করবে, সাথে সাথে আল্লাহ সৎ লোকদের অঞ্চলকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তার নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর খারাপ লোকদের অঞ্চলকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও, ফেরেশতারা উভয় অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব দেখল এবং সৎ লোকদের অঞ্চলকে নিকটবর্তী পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (বুখারী ও মুসলিম)

বৃদ্ধ বয়সে খালেস নিয়াতে কুরআন তথা ইসলাম শিখার প্রস্তুতি নেয়াতেই যদি অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে?

৭. পাঞ্জে সূরা এবং অন্যান্য অজিফার গ্রন্থসমূহ: প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক ফায়দা পেতে চায়। আর এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে পাঞ্জে সূরা এবং বিভিন্ন দুরূদ সম্বলিত গ্রন্থের বাজার বেশ সরগরম আছে। লোকেরা এ ধরনের গ্রন্থ এমনভাবে পাঠ করে যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত ছিল, আমাদের দৃষ্টিতে এ সমস্ত গ্রন্থের অপরাপর ক্ষতিকর দিকসমূহ:

ক. এ সমস্ত গ্রন্থে ফযীলাত সম্পর্কিত যে সমস্ত সূরা, আয়াতসমূহ এবং অন্যান্য দুরূদ ও ওজিফাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সে ফযীলাত সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল বা জাল এবং মণগড়া কথা। আর দুর্বল এবং জাল হাদীস ও

মণগড়া কথা বা কোনো প্রকার কিচ্চাকাহিনী দ্বারা বর্ণিত ফযীলাতপূর্ণ সূরা বা অজিফাকে নিয়মিত আমলে পরিণত করা ঠিক নয়। কেননা কুরআন মাজীদের সূরাসমূহ তিলাওয়াতের সওয়াব তো তার স্বস্থানে অবশ্যই আছে কিন্তু যে ফযীলাতের কথা মাথায় নিয়ে সূরাসমূহ তিলাওয়াত করা হয় ঐ ফযীলাত থেকে তো পাঠকারী বঞ্চিত হবে, কারণ এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

খ. পাঞ্জে সূরা এবং এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থ যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তা প্রতিদিন নিয়মতান্ত্রিক অযিফা হিসেবে পাঠকারীগণ কুরআন মাজীদে হাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, আর এ ক্ষতি পূর্বে বর্ণিত ক্ষতি থেকে মারাত্মক। কিছু কিছু ধর্মীয় সংগঠন স্ব স্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিছু কিছু সূরা বাছাই করে তা সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ করে থাকে যে তাদের কর্মীরা ঐ সমস্ত সূরাসমূহ বিশেষভাবে পাঠ করে, যদি এ পঠন প্রতিদিনের কুরআন তিলাওয়াতের বিকল্প না হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি তা প্রতিদিনের কুরআন তিলাওয়াতের বিকল্প হয় তাহলে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন মাজীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকার দাবি এ যে, তা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা এবং বুঝা আর প্রতিদিন কোনো বাধা ব্যতীত তিলাওয়াত করা এবং অন্য কোনো কিছু যেন তার বিকল্প না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৮. কুরআন মাজীদ ধরার জন্য ওযূর শর্ত : কিছু কিছু মানুষ মনে করে যে, বিনা ওযূতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষেধ। আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় বরং অনেক মানুষ বিভিন্ন রোগের কারণে শুধু নামাযের সময়ে ঠিক রাখাও কষ্টকর হয়ে যায়, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কুরআন তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ হাত না লাগিয়ে মুখস্ত তিলাওয়াতের ব্যাপারে সমস্ত আলেমগণ একমত যে, বড় নাপাকী থেকে পবিত্র ব্যক্তি বিনা অজুতে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। অবশ্য কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে আলিমগণের দুটি অভিমত রয়েছে:

১ম: বিনা ওযূতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা না জায়েয।

২য়: বিনা ওযুতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা এবং তিলাওয়াত করা জায়িয।

প্রথম অভিমতের পক্ষে দলিল হলো সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতটি–

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

অর্থ: "কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া।" (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:৭৯)

এ আয়াত ব্যতীত আর কোনো আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস নেই যেখানে কুরআন মাজীদ বিনা ওযূতে স্পর্শ করা নিষেধ। আর সূরা ওয়াকেয়ার এ আয়াতটির সাথে সম্পর্কিত তার পূর্ববর্তী দু'টি আয়াত :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।" (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৭ ও ৭৮)

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুহ (র) বলেন: অধিকাংশ মুফাসসিরীগণের মতে لَا يَمَسُّهُ -এর هُ সর্বনামটির ইঙ্গিত লাওহে মাহফুয, অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে সেই স্পর্শ করতে পারে যে পবিত্র অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ। কেউ কেউ এ সর্বনামটিকে কুরআনের ব্যাপারেও ব্যবহার করেছেন আর এর মাধ্যমে তারা দলিল দিয়েছেন যে, বিনা ওযূতে কুরআন মাজীদকে স্পর্শ করা জায়িয নয়। তবে এ দলিলটি শুদ্ধ নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়িয।[১১৮]

আহসানুল বায়ানের মুফাসসির হাফিজ সালাহউদ্দীন ইউসুফ এ আয়াত সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন:

لَا يَمَسُّهُ-এর সর্বনামটির ইঙ্গিত লাউহে মাহফুয। আর পাক-পবিত্র লোক বলতে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এ সর্বনামটির ইঙ্গিত কুরআন কারীমের দিকে করেছেন অর্থাৎ এ কুরআনকে ফেরেশতাগণ স্পর্শ করে অর্থাৎ, আকাশে ফেরেশতাগণ ব্যতীত কারো পক্ষে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই। এর মাধ্যমে মুশরিকদের দাবি খণ্ডন করা হলো যে, যারা বলে কুরআন শয়তান অবতীর্ণ করেছে, আল্লাহ বললেন: এটা কীভাবে সম্ভব, কুরআন তো শয়তানের নাগালের বাহিরে, আবার কেউ কেউ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করা এবং তিলাওয়াত করা নিষেধ, কিন্তু এ দলিল গ্রহণ করা ঠিক নয়, কেননা এখানে একটি বিষয়ের সংবাদ দেয়া হচ্ছে মাত্র এখানে স্পর্শ করা বা না করার কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নাই।[১১৯]

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যে কথার ধারাবাহিকতায় এ আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে তা রেখে যদি দেখা যায়

---

[১১৮] আশরাফুল হাওয়াসী-পৃ: ৬৪০, হাদীস নং-১১।

[১১৯] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ. ৮৩২, হাসিয়া নং-১১ এ সংক্রান্ত বাকী হাসিয়া ৭০২ নং পৃ.।

তাহলে একথা বলার মোটেও কোনো সুযোগ নেই যে, এ গ্রন্থ পবিত্র লোকেরা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না, কেননা এখানে তো কাফিররা সম্বোধিত হয়েছে, আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনে অবতরণকৃত গ্রন্থ, এ সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, এটা শয়তান অবতীর্ণ করেছে নবী ﷺ-এর ওপর। তাহলে এখানে শরী'আতের এ বিধান বর্ণনার কী কারণ থাকতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বিনা ওযূতে তা স্পর্শ করবে না? বেশি থেকে বেশি যে কথা বলা যেতে পারে তা এ যে, যদিও আয়াতটি এ নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় নাই, তবুও কথার তাৎপর্য ঐ দিকে ইঙ্গিত করে যে, যেভাবে আল্লাহর ওখানে এ গ্রন্থকে শুধু পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে, এমনিভাবে পৃথিবীতেও কমপক্ষে ঐ সমস্ত লোকেরাই তা স্পর্শ করবে যারা এটাকে আল্লাহর বাণী বলে ঈমান রাখে। তবে অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে।[১২০]

মোটকথা হলো এ যে, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য ওযূ করার নির্দেশ কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বাহ্যিক নাপাকী এবং গোসল ফরয হয় এমন নাপাকী থেকে পবিত্র ব্যক্তি সবসময় বিনা দ্বিধায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে এবং তার তিলাওয়াতও করতে পারবে।

কুরআন শিক্ষা করার পর যে কুরআন অনুযায়ী আমল না করার শাস্তি

১. যে ব্যক্তি গৌরব করার জন্য বা নিজেকে বড় বলে জাহির করার জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করল তার জন্য জাহান্নাম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ»

অর্থ: "জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: আলিমদের ওপর গৌরব করার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না বা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়া করার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না বা বৈঠকে বড় সাজার জন্য জ্ঞান অর্জন করবে না। আর যে তা করবে তার জন্য জাহান্নাম।" (ইবনু মাজাহ: ২৫৪, সহীহ)

[১২০] তাফহীমুল কুরআন, খ. ৫, পৃ: ২১৯, হাসিয়া নং-৩৯।

২. কুরআন শিক্ষাকারী এবং ঐ অনুযায়ী আমল না কারীর ঠোঁট জাহান্নামে আগুনের কাঁচি দিয়ে কাঁটা হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَتَيْتَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ وَلَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَءُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَفْعَلُوْنَ بِهِ "

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি এমন এক জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আবার পরক্ষণেই তা ভালো হয়ে যাচ্ছিল, এরপর আবার তা কাটা হচ্ছিল, আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন লোক সে বললো: এরা আপনার উম্মাতের ঐ সমস্ত বক্তা যারা অপরকে ওয়ায করত কিন্তু নিজেরা আমল করত না, আল্লাহর কিতাব পড়ত কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না।" (কানযুল উম্মাল ৩১৮৫৬, মুসনাদ আহমাদ, সহীহ)

৩. অপরকে কুরআন শিখানো এবং শিখার জন্য বলা আর নিজে কুরআন অনুযায়ী আমল না করার বেদানাদায়ক পরিণতি।

عَنْ اُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: اَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ اَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ "

অর্থ: "উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাড়ীভূড়ি বের হয়ে আসবে। অতঃপর যেভাবে গাধা চাক্কির চারপাশে ঘুরে এমনিভাবে ঐ ব্যক্তি তার নাড়িভূড়ির চারপাশে ঘুরবে। জাহান্নামবাসী তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, হে ওমুক তোমার কী হয়েছে? তুমি তো

আমাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দিতে আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে উত্তরে বলবে: হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দিতাম কিন্তু নিজে ভালো কাজ করতাম না, আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে খারাপ কাজ করতাম।" (বুখারী: ৩২৬৭, ৩০৯৪)

৪. পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিন্দা করেছেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ، وَفِيْكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْأَسْوَدُ، اقْرَءُوْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُ»

অর্থ: "সাহল বিন সা'দ সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, আমরা তখন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলাম। তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর কিতাব এক, আর তোমাদের তিলাওয়াতকারীদের মধ্যে কালো এবং লাল বর্ণের লোক রয়েছে, তাই তা ভালো করে তিলাওয়াত কর। এমন লোকদের আগমনের পূর্বে যারা কুরআন মাজীদ এমনভাবে পরিপাটি করে তিলাওয়াত করবে যেন তীরকে পরিপাটি করে রাখা হয়। কিন্তু তারা এর প্রতিদান পরকালের পরিবর্তে পৃথিবীতেই হাসিল করে নিবে।" (আবু দাউদ: ৮৩১, হাদীস হাসান সহীহ)

৫. যে ব্যক্তি আমল না করে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞান অর্জন করল যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায়, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (ইবনে মাজাহ: ২৫২, হাদীসটি সহীহ)

৬. প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, শিক্ষা দেয়া, কুরআন অনুযায়ী আমল না কারীকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপকরা হবে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ،

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ফায়সালা করা হবে, এমন এক ব্যক্তির যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন শিক্ষা করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে, আল্লাহ তাকে দেয়া নি'আমাতসমূহের কথা স্মরণ করাবেন সে তা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন এ নি'আমাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ? সে বলবে: আমি নিজে জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে (কুরআন সুন্দর করে তিলাওয়াতকারী), আর পৃথিবীতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে যেন তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।" (মুসলিম: ৫০৩২, ১৯০৫)

৭. মুনাফেকী নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং সে অনুযায়ী আমল না কারী দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

عَنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا. لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (কোনো এক মুনাফিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন) তার বংশ থেকে এমন লোক জন্ম নিবে যে, কুরআন মাজীদ সুন্দর করে তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন মাজীদ তার গলার অভ্যন্তরে যাবে না, সে দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।" (বুখারী: ৪৩৫১, ৪০৯৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَكْثَرُ مُنَافِقِي اُمَّتِي قُرَّاؤُهَا»

অর্থ: " আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের অধিকাংশ মুনাফেক কুরআন তিলাওয়াতকারী হবে।" (আহমদ: ৬৬৩৭)

৮. কুরআন মাজীদের জ্ঞান অর্জন করার পর তা প্রত্যাখ্যান করা বা সে অনুযায়ী আমল না কারীর মাথা জাহান্নামে বার বার পাথর দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে।

عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ لِاَصْحَابِهِ: «هَلْ رَاَى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصَّ، وَاِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «اِنَّهُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَاِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَاِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَاِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَاِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الاُولَى» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ

অর্থ: "সামুরা বিন জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (ফজরের নামাযের পর) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করতেন যে, কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি না? এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তি তার স্বপ্নের কথা বলত, তখন তিনি তার ব্যাখ্যা করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন যে, গতকাল আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসেছিল তারা আমাকে উঠিয়ে বললো: চল! আমি তাদের সাথে চললাম, আমরা এমন এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যে শুয়ে ছিল আর একজন ফেরেশতা তার মাথার পাশে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফেরেশতা তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছিল এতে তার মাথা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল, পাথর তার মাথায় আঘাত করে অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়ছে আর এভাবে ফেরেশতার হাতের পাথরগুলো শেষ হলে সে আবার গিয়ে পাথরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসছে, ইতোমধ্যে তার মাথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার ফেরেশতা পাথর মেরে তার মাথা যখম করে দিচ্ছে, এভাবে ধারাবাহিকভাবে চলছিল। আমি ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? আমার সাথের ফেরেশতারা বললো: তারা ঐ লোক যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করছে, এরপর তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়েছে।" (বুখারী: ৬৬৪০)

নিজের অভিমত দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করার শাস্তি

১. কুরআন মাজীদ সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা যা ইসলামের বিপরীত তা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের হকদার বানিয়ে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: "যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারা আমার কাছে গোপন নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে! তোমাদের যা ইচ্ছা তা তোমরা কর, তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।" (সূরা হা মীম সাজদা ৪১: ৪০)

২. কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের মনমত করা আল্লাহর গযবে নিপতিত করে।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

অর্থ: "যারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।" (সূরা মু'মিন ৪০:৩৫)

৩. কুরআন মাজীদের মূল ব্যাখ্যা পরিহার করে ভুল ব্যাখ্যা করা, সালফে সালিহীনদের তাফসীর থেকে সরে গিয়ে নতুন নতুনভাবে তৈরি করা পূর্ব এবং পরবর্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আয়াতের অর্থ করা এবং নিজের মনমতো আয়াতের ব্যাখ্যা করা কুফরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কুরআন নিয়ে (কুরআনের অর্থ করতে গিয়ে) ঝগড়া করা কুফরী।" (আবু দাউদ: ৪৬০৫)

৪. কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান ব্যতীত নিজের মনমতো কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর মুখে কিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

অর্থ: "ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যাকে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলো আর সে জেনে বুঝে তা গোপন করল কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়িয়ে উপস্থিত করা হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে বিনা জ্ঞানে বক্তব্য দিল কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়িয়ে উপস্থিত করা হবে।" (আবু ইয়ালা: ৪৬০৩)

কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার শাস্তি

১. কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত, কোন নির্দেশ বা কোন বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের শাস্তি হলো জাহান্নাম।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ انظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوْراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ اَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ الْغَرُوْرُ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অর্থ: সেদিন মুনাফিক পরুষ ও মুনাফিক নারীগণ ঈমানদারদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের নূর থেকে আমরা একটু নিয়ে নেই', বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর,' তারপর তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরভাগে থাকবে রহমত এবং তার বহির্ভাগে থাকবে আযাব। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। আর তোমরা অপেক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আকাঙ্খা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেল। আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। সেটাই তোমাদের উপযুক্ত স্থান। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল!" (সূরা হাদীদ ৫৭:১৩-১৫)

২. কুরআন মাজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ.

অর্থ: "তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে।" (সূরা ক্বাফ ৫০:২৪-২৫)

৩. কুরআন মাজীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ঈমান গ্রহণ করতে চাইবে কিন্তু তাদেরকে ঈমান গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে না।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيْبٍ.

অর্থ: "আর তাদের ও তারা যা কামনা করত তার মধ্যে অন্তরাল করে দেয়া হবে, যেমন ইতোপূর্বে তাদের সমগোত্রীয়দের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।" (সূরা সাবা ৩৪:৫৪)

কুরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত বা বিধান অপছন্দ করার শাস্তি:

১. যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো একটি আয়াত, বিধান, নির্দেশ বা ফায়সালাকে অপছন্দ করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَآ اَنزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: "যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন, তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৮:৯)

২ অপছন্দ, সন্দেহ এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন গবেষণা করা যালিমদের কুফরী এবং পথভ্রষ্টতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَاراً.

অর্থ: "কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮২)

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.

অর্থ: "তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের জন্য হবে অন্ধত্ব।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৪৪)

কুরআন মাজীদ আল্লাহর অবতীর্ণকৃত গ্রন্থ, তার প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে ঈমান রাখা ফরয। আল্লাহর বাণী:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً.

অর্থ: "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৪:৬৫)

ঈমান আনার পর কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত বা কোনো বিধানকে অপছন্দ করা, বা কোনো আইনকে বা কোনো ফায়সালাকে অপছন্দ করা (চাই সেই অপছন্দ মন থেকে হোক আর মুখ দিয়ে) তা ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয়, যার দলিল কুরআন মাজীদের এ আয়াত:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৮-৯)

কোনো আয়াত বা নির্দেশকে অপছন্দ করার সরাসরি উদাহরণ, যেমন: পর্দার আয়াত বা নির্দেশকে অপছন্দ করা, আরেকটি উদাহরণ হতে পারে এ যে, পর্দাকে খারাপ মনে করে না কিন্তু কাফিরদের দেশে প্রচলিত বে-পর্দাকে পর্দা থেকে উত্তম মনে করে, এ উভয়ের পরিণতি একই।

এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কুরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত, কোনো একটি নির্দেশ, কোনো একটি আইন বা কোনো একটি ফায়সালা অপছন্দ করা কুরআন মাজীদের সমস্ত আয়াত, নির্দেশ, আইন বা ফায়সালাকে অপছন্দ করার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের বিধানাবলির বিপরীতে অন্য কোনো বিধানাবলিকে ভালো বলে বিবেচনাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ)

নিম্নোক্ত পাঁচটি অবস্থানের কোনো একটি অবস্থান অবলম্বনকারীকে ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দিয়েছেন:

১. যে ব্যক্তি মনে করে যে, মানব রচিত জীবন বিধান ইসলামী জীবন বিধান থেকে উত্তম বা তার সমমানের বা তার অনুরূপ ফায়সালা গ্রহণ করা বৈধ। সে ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে গেল যদিও সে মনে করে যে ইসলামী বিধান মুতাবিক ফায়সালা করা উত্তম।

২. ঐ ব্যক্তি যে, মনে করে, এ বিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলাম অনুযায়ী চলা সম্ভব নয় বা মুসলিমদের ইসলাম অনুযায়ী চলা মুসলিমদের পশ্চাদমুখী হওয়ার কারণ, সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তি যে মনে করে যে, দ্বীন ইসলাম বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে ধর্মীয় সম্পর্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, এর বাহিরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৪. ঐ ব্যক্তি যে বলে: চোরের হাত কাটা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা, বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নয় সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে।

৫. ঐ ব্যক্তি যে বলে, পার্থিব বিষয়ে ইসলামী দণ্ডবিধির স্থলে অনৈসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা জায়েয সেও ইসলামের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে, যদিও তার আক্বীদা এটা নয় যে, অনৈসলামী আইন ইসলামী আইনের চেয়ে উত্তম।[১২১]

বাস্তবতা হলো এ যে, দ্বীনের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, এটা কোনো খেল-তামাসার বিষয় নয়, যে নিজের পছন্দ বা অপছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বিধান অনুযায়ী আমল করে নিল বা কোনো বিধানকে ত্যাগ করল বা কোনো বিধানকে উত্তম মনে করল বা কোনোটাকে খারাপ বলে দিল। আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ দিয়েছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً.

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।" (সূরা বাকারা: ২০৮)

ইসলামের কিছু অংশ বিশ্বাস করা আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করা ইহুদি নাসারাদের কাজ; যার ফলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

---

[১২১] শেখ বিন বায লিখিত নাওয়াকেজ ইসলাম।

আল্লাহর বাণী:

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ.

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা বাকারা ২:৮৫)

ঈমানদারগণের ঐ নিন্দনীয় অপরাধ থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যথায় তাদেরকেও ঐ শাস্তি দেয়া হবে, যা আহলে কিতাব (ইহুদি-নাসারাদেরকে) দেয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে লাঞ্ছনা অবমাননা পরকালে কঠিন আযাব, এ থেকে কি তোমরা বিরত থাকবে?

কুরআন মাজীদের কোনো একটি আয়াত বা একটি নির্দেশকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার শাস্তি

১. কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করার পরিণতি জাহান্নাম।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوٓا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً.

অর্থ: "এ জন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে।" (সূরা কাহাফ ১৮:১০৬)

২. কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত এবং পদদলিত করার জন্য কোনো ভুলে যাওয়া বিষয়ের ন্যায় করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِيْنَ ذٰلِكُم بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ.

অর্থ: "আর বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকবো যেমন তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়টি ভুলে ছিলে। আর তোমাদের নিবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না'। এটা এজন্যই যে, 'তোমরা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল'। সুতরাং আজ তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না।" (সূরা জাসিয়াহ ৪৫:৩৪-৩৫)

৩. কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাময় শাস্তি দেয়া হবে।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

অর্থ: "আর যখন সে আমার আয়াতসমূহের কিছু জানতে পারে, তখন সে এটাকে পরিহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।" (সূরা জাসিয়াহ ৪৫:৯)

৪. কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপকারীদের ইহকাল এবং পরকালে বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ.

অর্থ: "তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছিল। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।" (সূরা রূম ৩০:১০)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

অর্থ: "আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।" (সূরা লুকমান ৩১:৬)

৫. নবী ﷺ-এর যুগে কুরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে ঠাট্টাকারী মুরতাদ ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمَ، وَقَرَاَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُوْلُ: مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ اِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَاَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوْهُ، فَاَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْاَرْضُ، فَقَالُوْا: هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَاَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَاَعْمَقُوا، فَاَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْاَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ، نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَاَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَاَعْمَقُوا لَهُ فِي الاَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، فَاَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الاَرْضُ، فَعَلِمُوا: اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَاَلْقَوْهُ".

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন নাসারা মুসলমান হলো, এরপর সে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান মুখস্থ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে ওহী লিখতে শুরু করল, কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে গিয়ে বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ ﷺ তো কিছুই জানে না। আমি যা লিখে দিই সে শুধু তাই বলে। আল্লাহর ইচ্ছায় যখন সে মারা গেল তখন নাসারা হিসেবে তাকে কবরস্থ করল। সকাল বেলা লোকেরা দেখতে পেল যে, তার লাশ বাহিরে পরে আছে। নাসারারা বলতে লাগল যে, এটা মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ, যেহেতু সে তাদের দ্বীন থেকে ফিরে এসেছে, তাই তারা তার লাশ মাটি খুঁড়ে বাহিরে বের করে রেখেছে। নাসারারা তার জন্য দ্বিতীয় বার কবর খনন করল আর তা প্রথমটির তুলনায় বেশি গভীর করল এবং দ্বিতীয়বার লাশ দাফন করল, যখন সকাল হলো তখন লোকেরা দেখতে পেল যে, তার লাশ আবার বাহিরে পড়ে আছে। নাসারারা আবার অপবাদ দিল যে, এটা মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ, যেহেতু সে তাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে, তাই তারা তার লাশ মাটি খুঁড়ে বাহিরে বের করে রেখেছে। নাসারারা তৃতীয়বার তার জন্য কবর খনন করল এবং এতো গভীর করল যতটা গভীর করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এরপর ওখানে তার লাশ দাফন করল। কিন্তু সকালে দেখল যে, তার লাশ আবার বাহিরে পড়ে আছে, তখন তাঁরা বুঝতে পারল যে, এটা মুসলমানদের কাজ নয় বরং

আল্লাহর শাস্তি । তাই নাসারারা তার লাশ এভাবে পড়ে থাকতে দিল।" (বুখারী: ৩৬১৭)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও মানুষ কুরআনের আয়াত বা নির্দেশের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাদের মধ্যে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক সবধরণের লোকই শামীল ছিল তার কিছু উদাহরণ দ্রঃ

১. আল্লাহ তা'আলা যখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

অর্থ: "সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।" (সূরা বাকারা ২:১৪৪)

তখন তারা এভাবে ঠাট্টা করছিল, বুঝতে পারছি না যে, মুহাম্মাদ-এর সঠিক কিবলা কোনটি?

যদি প্রথমটি সঠিক হয় তাহলে তা এখন কেন পরিবর্তন করল, আর যদি পরেরটি সঠিক হয় তাহলে পূর্বেরটি ভুল, আর মুহাম্মাদ যদি বাস্তবেই আল্লাহর নবী হয় তাহলে বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে বাইতুল্লাহকে নিজের কিবলা বানাতো না?

২. আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَه اَضْعَافاً كَثِيْرَةً.

অর্থ: "কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন?" (সূরা বাকারা ২:২৪৫)

তখন তারা এভাবে ঠাট্টা করছিল যে, দেখ দেখ এখন আল্লাহ গরিব হয়ে গেছে, তাই এখন ঋণ চাচ্ছে।

৩. জাহান্নামের প্রহরীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

অর্থ: "এর ওপর নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশতা।" (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৩০)

আবু জাহিল এ আয়াতের সাথে এভাবে ঠাট্টা করেছিল যে, মুহাম্মাদের সাহায্যকারীরা মাত্র ১৯ জন, আর আমাদের সংখ্যা এতো অধিক যে, ১০ জন, ১০ জন বা ১০০ জন, ১০০ করেও যদি একজন পাহারাদারকে পরাজিত করতে

হয় তবুও সমস্যা হবে না। অপর এক কাফির ঠাট্টা করে বললো: তোমরা সবাই মিলে দু'জনকে পরাজিত করবে আর বাকি ১৭ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট হব।

কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিকদের এ ধারা আজও বিদ্যমান আছে, দণ্ড বিধির আয়াতের সাথে ঠাট্টা, পর্দার আয়াতের সাথে ঠাট্টা, একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত আয়াতের সাথে ঠাট্টা, কিয়ামত সংক্রান্ত আয়াতের সাথে ঠাট্টা, সাওয়াব এবং শাস্তির আয়াতের সাথে ঠাট্টা। কুরআন আয়াত ছাড়াও আরো কিছু ইসলামী বিধান যেমন: দাড়ি, ইসলামী পোশাক, বোরকা, মসজিদ, মাদরাসা, সালাত ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঠাট্টা করা এখন একটি বিশেষ শ্রেণির ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের একথা ভুলা চলবে না যে, কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত, কোনো নির্দেশ, কোনো আইন বা ফায়সালার ব্যাপারে ঠাট্টা করা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের অপরাধকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

যার দলিল কুরআন মাজীদের এ আয়াত−

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ কর না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" (সূরা তওবা ৯:৬৫-৬৬)

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا.

অর্থ: "এ জন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে।" (সূরা কাহাফ ১৮:১০৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এ ধরনের লোকদের ঐ রকম শাস্তিই হবে যেমন কাফিরদের হবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থ: "আর যখন সে আমার আয়াতসমূহের কিছু জানতে পারে, তখন সে এটাকে পরিহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।" (সূরা জাসিয়াহ ৪৫:৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একজন নাসারা মুসলিম হলো। শিক্ষিত হওয়ার কারণে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাতেব (ওহীর লিখক) ছিল, সে এক সময় মোরতাদ হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ ﷺ তো কিছুই জানে না, আমি যা কিছু লিখে দেই, তাই কুরআন হিসেবে লোকদের সামনে পেশ করে। একথা বলে সে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ কেই অবমাননা করে নাই বরং কুরআন মাজীদেরও অবমাননা করল। বললো: যে এ ধরনের কিতাব লিখাতো কোনো বিষয়ই নয়, আমিও লিখতে পারব। এ মোরতাদের এ বেয়াদবী এবং ঠাট্টামূলক বক্তব্যের জন্য আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে এ শাস্তি দিলেন যে, যখন সে মারা গেল তখন নাসারারা তাকে কবরে দাফন করল কিন্তু পরের দিন তার লাশ কবর থেকে বের হয়ে গেল, নাসারারা মনে করল যে, হয়তো মুসলিমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ কাজ করেছে। তাকে দ্বিতীয় বার দাফন করল, পরের দিন তার লাশ আবার কবর থেকে বের হয়ে গেল, নাসারারা তাকে তৃতীয় বার দাফন করল কিন্তু পরের দিন তার লাশ আবার কবর থেকে বের হয়ে গেল, তখন নাসারারা তাকে দাফন না করে এভাবেই রেখে দিল।[১২২]

অতএব, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, মুক্ত চিন্তার অতিরিক্ত আগ্রহ যেন আল্লাহর সাথে কোনো বেয়াদবী বা অন্যায় না হয়ে যায় বা আল্লাহর বাণীসমূহ এবং বিধানাবলির সাথে কোনো বিদ্রূপকারীদের সাথে কোনো সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখার কারণে এমন না হয় যে, পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে আফসোস এবং লজ্জিত হয়ে মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের সাথে এ বলে অশ্রুজল ফেলতে না হয় যে,

يٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ.

অর্থ: "হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব পশ্চিমের ব্যবধান থাকত, সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী!" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৩৮)

---

[১২২] বোখারী কিতাবুল মানাকেব, বাব আলামাতুন নাবুয়া ফিল ইসলাম।

কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শাস্তি

কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটি অর্থ হতে পারে, তাঁর প্রতি ঈমান না আনা, যার ফলে মানুষ কাফির হয়ে যায়। কিন্তু ঈমান আনার পর কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আরো রাস্তা থাকতে পারে: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না করা, তদানুযায়ী আমল না করাও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের বিধানাবলি এবং মাসআলাসমূহ বুঝার চেষ্টা না করাও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদ না শিখা এবং শিখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়াও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আলেমগণ কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করাকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি যে ধরনের মুখ ফিরিয়ে নেবে তার ঐ পর্যায়ের শাস্তি হবে।

আল্লাহর বাণী:

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

অর্থ: আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল, তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) 'তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন কর'। (সূরা আনফাল ৮:৫০)

রূহ কবজ করার পর তার রূহের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না।" (সূরা আরাফ ৭:৪০)

আর তাদের রূহকে আকাশের ওপর থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমাদ)

দাফন করার পর তাদেরকে কবরে আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, ফেরেশতা তাদেরকে লোহার গুর্জ দিয়ে আঘাত করতে থাকবে, আবার কিছু কিছু কাফিরদেরকে বিষাক্ত সাপ দংশন করতে থাকবে। (আবু ইয়ালা)

কিয়ামাতের দিন যখন কাফিরকে তার কবর থেকে উঠানো হবে তখন তাদের কাউকে কাউকে মুখে ভর করে চালানো হবে। (বুখারী)

কোনো কোনো মানুষকে অন্ধ, মূক এবং বধির করে উঠানো হবে।

আল্লাহবলেন–

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً.

অর্থ: "কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯৭)

আবার কাউকে কাউকে ফেরেশতাগণ মাটিতে হেঁচড়িয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবে, যাদেরকে উপস্থিত করা হবে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান ২৫:১৩৪)

(আয়াতের ভাবার্থ) কিয়ামতের মাঠে হিসেব দেয়া এবং কিতাব লাভ করার পর যারা কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনেনি এবং কুরআন মাজীদ মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছে ও কুফরী করেছে তাদেরকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা যুমার ৩৯:৫৯)

এ হলো নিকৃষ্টতম শাস্তি, যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে। ঈমান আনার পর কুরআনের প্রতি অলসতা প্রকাশ অর্থাৎ তা তিলাওয়াত না করা, তার বিধান অনুযায়ী আমল না করা, নিজের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা না দেয়ার শাস্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বিমুখতা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক. পৃথিবীর জীবনে শাস্তি

১. কষ্টদায়ক জীবন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَىٰ

অর্থ: "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।" (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)

কষ্টদায়ক জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এ নয় যে, অভাব-অনটনের জীবন, বরং এমন জীবন যেখানে মানুষ শান্তিও নিরাপত্তা পাবে না, বে-হিসাব ধন-সম্পদের মালিক

হওয়া সত্ত্বেও বা উচ্চ পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্য বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে, যেমনঃ এমন রোগে আক্রান্ত হওয়া যেখানে জীবনের কোনো আরাম ও শান্তি থাকবে না বা পিতামাতার অবাধ্য এবং অযোগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করা, ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াঝাটি চলতে থাকা, পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মাঝে বা ভাই-বোনদের মাঝে সর্বদা ঝগড়া-ঝাটি চলা, এমন মামলা-মোকদ্দমায় ফেঁসে যাওয়া যে রাত দিনের আরাম হারাম হয়ে গেল, দান-সম্পদ হাসিলের প্রতি এমন লোভ হয়ে যাওয়া যে, মানুষ তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নিতে পারে না, উচ্চ মর্যাদা হাসিলের লোভে পূর্ণ জীবন শেষ করে দেয়া, আবার উচ্চ মর্যাদা হাসিলের পর তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকা, এ সমস্ত পেরেশানী মূলত কষ্টদায়ক জীবনের বিভিন্ন চিত্র। যার মূল কারণ মানুষের কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়া।

কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তির এ বিধান প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য। চাই সে রাজা হোক আর প্রজা, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত, কালো হোক আর সুন্দর, নর হোক আর নারী।

আল্লাহর এ বিধান যেমন ব্যক্তির জন্য এমনিভাবে জাতি, গোষ্ঠীর জন্যও। যে জাতি সঙ্গবদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার বিধান অনুযায়ী আমল করবে না, তার জন্যও পৃথিবীতে ঐ শাস্তি হবে, জাতিয় জীবনে অভাব অনটনের কারণে আত্মহত্যা, দুর্নাম বোমাবাজি, নিষ্পাপ এবং নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা, দিনদুপুরে বাড়িতে ডাকাতি, গুম করে মুক্তিপণ দাবি, গুম করে ব্যভিচার করা, অশ্লীলতা এবং বে-হায়াপনার আড্ডা, অপরাধ বৃদ্ধি, আসমানী মুসিবত, তুফান, ভূমিকম্প, নানা রোগ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট, অরক্ষিত বর্ডারে সর্বদা কাফিরদের ধমক, চক্রান্ত এবং আক্রমণের ভয়, এ সমস্ত বিষয়গুলো কি জাতীয় পর্যায়ে সঙ্কীর্ণময় জীবন যাপন বলে মনে হচ্ছে না? মূলতঃ এ সমস্ত দৃশ্য কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনার পর তা থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি ।

২. শয়তানের চড়াও হওয়া : কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে পৃথিবীতে আরেকটি শাস্তি হলো এ যে, আল্লাহ এ ধরনের ব্যক্তি বা পুরা জাতির ওপর শয়তানকে চড়াও করে দেন, যা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে ঐ পথভ্রষ্টতার রাস্তায় শুধু অটলই রাখে না বরং ঐ চক্রান্তে তাকে আক্রান্ত করে রাখে যেন সে মনে করে যে, আমি যে রাস্তায় চলছি তা সঠিক রাস্তা।

আল্লাহর বাণীঃ

وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ.

অর্থ: "আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। আর নিশ্চয়ই তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৩৬-৩৭)

যার ওপর শয়তান চড়াও হবে স্পষ্ট কথা যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার সমস্ত কার্যক্রমই করবে, কুফর, শিরক, মুনাফিকী, মুরতাদ, বিদআত, হত্যা, সুদখোর, মদপান, ব্যভিচার, জুয়া, অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত, মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষের ওপর চড়াও হওয়ার পর শয়তানের মূল কাজ সেটাই থাকবে, যার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্টতার রাস্তায় অনড় করে দেয়, অতঃপর পথভ্রষ্টতার রাস্তাকে এতো পছন্দনীয় করে দেয় যে, মানুষ পথভ্রষ্টতাকেই হিদায়াত বলে মনে করে, বাতিলকে হক মনে করে আর হককে বাতিল মনে করে। মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা মনে করে, ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে, শয়তানের এ চক্রান্তকে আল্লাহ অপর এক আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: "আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।" (সূরা আন'আম ৬:৪৩)[১২৩]

শয়তান মানুষের ওপর চড়াও হওয়ার কারণেই ফিরআউন নিজেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করত আর মূসা (আ)-কে পথভ্রষ্ট মনে করে এ বলে সম্বোধন করল: আমার মনে হয় তোমাকে জাদু করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ১০১)

আর নিজের ব্যাপারে বললো: হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে ঐ কথাই বলছি যা আমি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছি, আর আমি তোমাদেরকে শুধু সঠিক পথই দেখাচ্ছি। (সূরা ৪০ মু'মিন: ২৯)

অর্থাৎ শয়তান ফিরআউনকে নবুয়াতের পথকে ভ্রান্ত পথ হিসেবে দেখিয়েছে আর কুফরীর পথকে সঠিক পথ হিসেবে দেখিয়েছে। নবী ﷺ-এর যুগে ইহুদি নেতা

---

[১২৩] আরো দ্র: ৮:৪৮, ১৬:৬৩, ২৪:২৪;, ২৯:৩৮।

কা'ব আব্দুল্লাহ বিন আশরাফ মক্কায় আসল তখন মক্কার কুরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করল তোমাদের নিকট কী আমাদের দ্বীন ভালো লাগে না মুহাম্মাদের দ্বীন? আমরা সঠিক পথে আছি না মুহাম্মাদ? কা'ব আব্দুল্লাহ বিন আশরাফ উত্তরে বললো: তোমরা মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের থেকে অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত এবং উত্তম দ্বীনের ওপর আছে। মূলত এ অনুমান ঐ শয়তান চড়াও হওয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র যে তাদের নিকট হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক হিসেবে দেখাচ্ছে।

আজও কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়া লোকদেরকে শয়তান ঐ চক্রান্তে ফেলে রেখেছে, তাই তারা পর্দাকে অজ্ঞতা, আর বে-পর্দাকে উন্নতি-অগ্রগতি বলে মনে করে, নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত অনুষ্ঠানকে মুক্ত চিন্তা, আর যাদের সাথে বিবাহ বৈধ ঐ ধরনের নারী-পরুষ কে পর্দা রক্ষা করে থাকাকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলে মনে করে, পর্দা প্রথাকে পশ্চাদপদতা আর উলঙ্গপনাকে সভ্যতা বলে মনে করে। ইচ্ছা করে গর্ভপাত করা এবং সমকামিতার মতো ঘৃণিত কাজকে মানবাধিকার বলে মনে করে, নৃত্য এবং বাজনাকে মনের খোরাক মনে করে, আর লজ্জা-শরমকে পশ্চাদপদতা মনে করে। ইসলামী দণ্ড বিধিকে অসভ্যতা আর অশ্লীলতা ও বে-হায়াপনাকে আধুনিকতা বলে মনে করে। জিহাদকে সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসকে প্রতিবাদ বলে মনে করে। লাঞ্ছনা আর অবমাননাকে সভ্যতা আর সম্মান ও মর্যাদাকে বোকামি এবং অজ্ঞতা বলে মনে করে। মূলত এ লোকেরাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় ঐ শাস্তিতে লিপ্ত আছে যেখানে শয়তান প্রত্যেক অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে অন্যায় করে দেখাচ্ছে, এমনকি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছেও শয়তান স্বীয় ভক্তদেরকে এ আশার বাণী শোনাচ্ছে যে, চিন্তা নেই তোমরা জান্নাতের কলোনিতে পৌঁছে যাচ্ছ।

৩. **লাঞ্ছনা এবং অবমাননা :** কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখতার তৃতীয় শাস্তি হলো এ যে, আল্লাহ এ ধরনের জাতিকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননার মাধ্যমে নিম্নস্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

عَنْ عُمَرُ قَالَ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ»

অর্থ: "উমার (রা) খেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাবধান অবশ্যই তোমাদের নবী বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কোনো কোনো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আবার কোনো কোনো মানুষকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেন।" (মুসলিমঃ ১৯৩৪)

হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মুসলিমদের জাতিগত উন্নতি এবং অবনতি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে, মুসলিমরা যখন কুরআন মাজীদ অনুযায়ী আমল করে তখন তারা উন্নতি লাভ করে আর যখন তা প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা লাঞ্ছিত এবং অবমাননায় পতিত হয়।

নবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামগণের যুগে কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং শিখানোকে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে গুরুত্ব দেয়া হত, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হওয়ার জন্য কুরআন মাজীদের হাফিয বা আলিম হওয়া বড় যোগ্যতা মনে করা হতো। উমার (রা) মজলিসে শুরার সকল সদস্য কুরআনের হাফেয অন্যথায় কুরআনের আলিম ছিলেন, যারা রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয়সমূহ কুরআনের আলোকে পরিচালনা করতেন, যার ফল এ ছিল যে, পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের মর্যাদার সুখ্যাতি ছিল। কায়সার ও কিসরারা তাদের দেশে বসে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল।

কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখতা আমাদের আজকের নমুনা হলো যে, স্কুলসমূহের সিলেবাসে প্রথম থেকে যতটুকু কুরআনের সূরা সন্নিবেশিত ছিল, তাও সরকার জোর করে সরিয়ে দিয়েছে, তাওহীদে বিশ্বাস, খতমে নবুয়তে বিশ্বাস, জিহাদ, ইসলামী দণ্ডবিধি, একাধিক বিয়ে এবং পারিবারিক নিয়ম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাপারে সরকার খুবই ভীত সন্ত্রস্ত, কী করে এগুলো দূর করা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সেকুলার বানানোর জন্য ষড়যন্ত্র করে চলছে, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া হয় তাদের কর্মকাণ্ডকে সঙ্কীর্ণ করার জন্য কখনো তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে আবার কখনো তাদের কার্যক্রমকে সীমিত করার আইন করা হচ্ছে, কখনো তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রচার মাধ্যমসমূহ অশ্লিলতা, বে-হায়পনা, বিস্তারের জন্য রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টাই সুযোগ আছে কিন্তু কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করার তাদের কোনো সুযোগ নেই। স্কুল এবং কলেজসমূহে সর্বপ্রকার সিলেবাস পড়ানোর শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে কিন্তু কুরআন মাজীদ শিখানোর শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে না।

সাধারণ লোকদেরকে কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ করার অবস্থা হলো, ঘর, দোকান, মাঠ, পার্ক, গাড়ি, আনন্দ করার স্থানসমূহ থেকে সর্বদা উঁচু আওয়াজে গান শুনা যাচ্ছে, কিন্তু কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আওয়াজ বিশেষ কিছু স্থান ব্যতীত অন্য কোথা থেকেও শোনা যাচ্ছে না।

খ. বারযাখী জীবনে শাস্তি

কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ শাস্তি বারযাখে (কবরের) জীবনেও ভোগ করতে হবে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ

থেকে গাফেল ছিল, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেনি, সে কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তখন ফেরেশতা তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে।

لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ.

অর্থ: তুমি জাননি এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করনি,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اَلْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ: أُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ "

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যখন কোনো বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তার সাথীরা তাকে দাফন করে ফিরে আসতে থাকে তখন সে তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বল? (মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে) তখন ঐ বান্দা বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর তাকে বলা হয় দেখ জাহান্নামে তোমার এ স্থানটি ছিল যার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে সে তার উভয় ঠিকানা দেখতে পায়। আর কাফির বা মুনাফিক মুনকার এবং নাকীরের উত্তরে বলে: আমার জানা নেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ কে? আমি তাই বলি যা লোকেরা বলে। তখন তাকে বলা হবে তুমি (কুরআন এবং হাদীস) জ্ঞান অর্জনও করনি, তিলাওয়াতও করনি। অতএব

তাকে তার উভয় কানের মাঝে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে, আর সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে, তার এ আওয়ায জ্বিন এবং ইনসান ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে।" (বুখারীঃ ১৩৩৮)

গ. পরকালে শাস্তি

কবরের পর পরকালেও কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি ভোগ করতে হবে, যা কবরের শাস্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং বেদনাদায়ক হবে।

প্রথম শাস্তি : তাকে কবর থেকে অন্ধ করে পুনরুত্থিত করা হবে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى

অর্থঃ "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।" (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)

مَّنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً خَالِدِيْنَ فِيْهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً.

অর্থঃ "এটা থেকে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামাতের দিন মহাভার বহন করবে তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামাতের দিন এ বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সে দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।" (সূরা ত্বা-হাঃ ১০০-১০২)

وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِ اَعْمَىٰ فَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ اَعْمَىٰ وَاَضَلُّ سَبِيْلاً

অর্থঃ "আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৭২)

দ্বিতীয় শাস্তি : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছেন:

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْراً.

অর্থ: "আর রাসূল বলবে, হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।" (সূরা ফুরকান ২৫:৩০)[১২৪]

তৃতীয় শাস্তি : কুরআন মাজীদ স্বয়ং এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ

অর্থ: আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কুরআন কিয়ামতের দিন হয় তোমার পক্ষে সাক্ষী হবে অন্যথায় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হবে। (মুসলিম ৫৫৬)

চিন্তা করুন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে তাকে কোন যমিন আশ্রয় দিবে? আর কোন্ অবকাশ তাকে সাহায্য করবে?

চতুর্থ শাস্তি : তাকে জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত করা হবে। আল্লাহর বাণী

وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً.

অর্থ: "আর যে তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন।" (সূরা জ্বীন ৭২:১৭)

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اَلْقُرْاٰنُ مُشَفَّعٌ، *، وَمَا حِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ اِمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ»

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামাতের দিন কুরআন মাজীদ সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তাঁর তিলাওয়াতকারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে এবং তাঁর কথা মানা হবে, আর যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে নিজের আদর্শ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ

---

[১২৪] উল্লেখ্য: কুরআন মাজীদকে ত্যাগ করার অর্থ এও যে, কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান না আনা, ঈমান আনার পর তা তিলাওয়াত না করা, তা বুঝার জন্য চেষ্টা না করা, তার নির্দেশনাসমূহ অনুযায়ী আমল না করা, তার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত না থাকা, তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয়া, কুরআনের আলোকে বিচার ফায়সালা না করা ও কুরআন মাজীদ শিক্ষা, শিখানো, প্রচার করা ত্যাগ করা। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

ক ...ক কুরআন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, আর যে তা পিছনে ফেলে রাখবে অর্থাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।" (কানুযুল উম্মালঃ ২৩০৬)

এ হলো কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করার পার্থিব শাস্তি, তাহলে বারযাখে এবং পরকালে কী হবে..... আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, সে অনুযায়ী আমল করার যেমন অসংখ্য ফযীলাত এবং মর্যাদা রয়েছে, এমনিভাবে তা থেকে বিমুখ হওয়ার এবং তার প্রতি অনিহা প্রকাশ করারও শাস্তি কঠোর হবে। তাই আমাদের উচিত যে, আমরা যদি প্রতিদিন এক পারা বা তার অধিক তিলাওয়াত করার ক্ষমতা না রাখি তাহলে কমপক্ষে এতোটুকু তিলাওয়াত প্রতিদিন করা উচিত যতটুকু করলে আমরা নিজেদেরকে কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম বলে মনে হবে না। চাই তা পাঁচ বা দশ আয়াতই হোক না কেন? যদি আমরা ২৪ ঘণ্টায় এতোটুকুও করতে না পারি তাহলে পৃথিবীতে এবং পরকালে আমাদেরকে ঐ শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? যার কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে।

আল্লাহর নিকট আমল কবুলের শর্তসমূহঃ

১. শিরকী আকীদা থেকে মুক্ত হওয়া,
২. আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া,
৩. আমল সুন্নাত মুতাবেক হওয়া
৪. রুজি রোজগার হালাল হওয়া

ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জনে তাওবা ও ইসতিগফার

১. তাওবা দ্বারা পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়

কেউ হয়তো বলতে পারেন, আমি তাওবা করতে চাই; কিন্তু তাওবা করলে আমার লাভ কী? এবং কে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি সঠিক পথে চলতে চাই; কিন্তু আমার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে, যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন তাহলে আমি তাওবা করতাম?

আমি তাকে বলব, আপনার ভেতরে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে সে অনুভূতি ইতঃপূর্বে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সৃষ্টি

হয়েছিল। আপনি যদি মনোযোগ সহকারে নিম্নোক্ত দুটি বর্ণনা পড়েন, তাহলে আপনার মনের প্রশ্ন আশা করি দূর হয়ে যাবে।

প্রথমত: ইমাম মুসলিম আমর ইবনে আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেন:

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ قَالَ: مَالَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟) قُلْتُ: أَنْ يَغْفِرَ لِيْ. قَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟).

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামকে পছন্দনীয় করে দিলেন, তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আপনার হাত বাড়ান আমি বাইয়াত করবো। তখন তিনি হাত বাড়ালে আমি হাত গুটিয়ে নেই। তিনি বলেন, হে আমর! তোমার কী হলো? আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বলেন, কিসের শর্ত? বললাম, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে দেয় এবং হিজরত পূর্বের যাবতীয় পাপ ধ্বংস করে দেয়।[১]

দ্বিতীয়ত: সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوْا فَأَكْثَرُوْا. وَزَنُوْا فَأَكْثَرُوْا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: إِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا إِلَيْهِ لَحَسَنٌ. وَلَوْ تُخْبِرُنَا إِنَّ لَمَّا عَمِلْنَا كَفَّارَةً. فَنَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: {وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} اَلْفُرْقَانُ /٦٨. وَنَزَلَ: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ).

অর্থাৎ, "কিছুসংখ্যক মুশরিক ব্যক্তি মানুষ হত্যা করে এবং তারা অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটায়, যিনা করে এবং অনেক ব্যভিচার করে এরপর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে, আপনি যা বলেন এবং যার দিকে ডাকেন তা অতি উত্তম। এখন আপনি যদি আমাদেরকে জানাতেন যে, আমরা যা করেছি এর কী কাফ্ফারা রয়েছে? তখন আল্লাহর এ বাণী নাযিল হয়:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থাৎ, "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ যাকে [হত্যা করা] হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করে না, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। শেষ বিচার দিবসে তার শাস্তি বাড়তে থাকবে এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে আর নেক কাজ করতে থাকবে আল্লাহ তাদের পাপরাশিকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন।[১] আর আল্লাহ বড়ই করুণাময়।[১]

এবং এ আয়াতটিও নাযিল হয়:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ, "আপনি বলে দিন, [আল্লাহ বলেন] হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ [অতীতের] যাবতীয় পাপ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[১]

হে মুসলিম ভাই! আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তাওবা দ্বারা শুধু গুনাহ মাপ হয় না; বরং তওবার আরো অনেক ফায়েদা ও লাভ রয়েছে। যেমন-

২. তাওবা দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বত লাভ হয়

মহান আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে"।[১]

৩. ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন

তাওবা দ্বারা একজন বান্দা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।[১]

৪. পাপরাশিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়

বান্দা যখন তার অপরাধ বুঝতে পেরে সত্যিকার তাওবা করে, তখন মহান আল্লাহ কেবল তার গুনাহকেই ক্ষমা করবেন না; বরং পাপরাশিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আপনি মহান আল্লাহর এ বাণীকে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, তাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কী সু-সংবাদ প্রদান করছেন :

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে মহান আল্লাহ তাদের গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১]

উত্তমরূপে একটু চিন্তা করে দেখুন এ বাণীটি, "তাদের পাপকে আল্লাহ নেকীতে পরিবর্তন করে দেবেন"। এতে আপনার নিকট মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথাই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আলেমগণ বলেন, পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে:

এক: খারাপ গুণকে ভালোগুণে পরিবর্তন করে দেয়া। যেমন– তাদের শিরককে ঈমানে পরিবর্তন করে দেয়া এবং ব্যভিচারকে পবিত্রতা ও চারিত্রিক সততায়, মিথ্যাকে সত্যবাদিতায় এবং খিয়ানতকে আমানতদারিতা দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া।

দুই: তারা যে পাপ করেছে তা শেষ বিচারের দিবসে সওয়াবে রূপান্তরিত করে দেয়া। আপনি একটু উত্তমরূপে পাঠ করুন, তাদের পাপকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেবেন। তিনি একথা বলেননি প্রত্যেক পাপের স্থান নেকীতে পরিবর্তন করবেন। কেননা হতে পারে কম বা সমান অথবা বেশিতে পরিবর্তন করে দেবেন। এটা নির্ভর করছে তাওবাকারীর নিষ্ঠা ও পূর্ণতার ওপর। আপনি কি এর চেয়ে উত্তম অনুগ্রহ আরো আছে বলে মনে করেন? আপনি মহান প্রভুর বাণীর উত্তম ব্যাখ্যা দেখুন নিচের হাদীসে :

عَنْ اَبِي طَوِيْلٍ شَطَبِ الْمَمْدُوْدِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَرَاَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا. فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً اِلَّا اَتَاهَا. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ

"আবু তালীব শাতবুল মামদুদ হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেন। তিনি রাসূলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি সকল ধরনের পাপ করে থাকে, এমন কোনো পাপ নেই যা সে করেনি [ছোট বড় সব ধরনের পাপই করেছে] এর জন্য কী তাওবা কবুল হবে?" (তাবারানী, মু'জামুল কবীর ৭২৩৫, হাদীস সহীহ)

এখানে তাওবাকারী হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি ছিলাম পথভ্রষ্ট, সালাত আদায় করতাম না, ইসলামের গণ্ডির বাইরে ছিলাম, আমি কিছু ভালো কাজও করেছি, এখন তাওবা করার পর এগুলো কী ধরা হবে, নাকি সব হাওয়া হয়ে যাবে?

আপনার প্রশ্নের জবাব হলো, উরওয়া ইবনে জুবাইর হতে বর্ণিত হাদীসটি। তিনি বলেন,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. اَرَاَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ. وَصِلَةِ رَحِمٍ. فَهَلْ فِيهَا مِنْ اَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

"হাকীম ইবনে হিযাম তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্ধকার যুগে দান-খয়রাত, গোলাম মুক্ত করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি নেকীর কাজ করতাম। আমি কি এতে নেকী পাব? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, পূর্বেরগুলোকে উত্তমরূপেই পাবে।" [বুখারী, ১৪৩৬]

কাজেই, এসব পাপ ক্ষমায় পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং এসব অন্ধকার যুগের নেকী তাওবার পরে ঠিক রাখা হবে। তাহলে আর কি-ইবা বাকি থাকলো?

৫. তাওবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়

তাওবা জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়। মহান আল্লাহ তাওবাকারীদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপরাশি মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত"।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ

"আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আর মহান আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!

৬. উত্তম জীবন উপকরণ ও পরকালে উত্তম প্রতিদান লাভ হয়

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ

"আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা চাও। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তার আনুগত্য অনুযায়ী দান করবেন"।[১]

অর্থাৎ, ইহকালে তাকে উত্তম ভোগ উপকরণ দান করবেন আর তার ইবাদত ও আনুগত্য অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেবেন।

৭. আসমান থেকে সময়মত বৃষ্টি ও তোমাদের শক্তি দান করবেন

মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে হুদ আ.-এর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, হুদ তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলছিল,

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়াবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না"।[১]

৮. দু'আ কবুল হয়

আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সালেহ আ.-এর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সালেহ তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলছিল,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ . هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

'আর সামূদ জাতির প্রতি (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন । কাজেই তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাও, অতঃপর তারই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা নিকটে, সাড়াদানকারী।'

৯. তাওবার দ্বারা যাবতীয় বালা-মুসিবত ও আল্লাহর আযাব দূর হয়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

১০. পেরেশানি দূর হয়, বিপদ থেকে মুক্তি পায় এবং রিযিক বাড়ে

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত পেরেশানীকে দূর করে দেয়, সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করে এবং তাকে তার ধারণাতীত রিযিক দেন।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৩৮১৯)

তাওবার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ

মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার তাওবা করা জরুরি নয়। তারপরও তিনি বলেন, হে মানুষ তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাও এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, আমি দৈনিক একশত বার তাঁর দরবারে ক্ষমা চাই। তিনি আরও বলেন, আমি দৈনিক সত্তরের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আর আমাদের জন্য

রাসূলের অনুকরণ করা ও তার সুন্নতের অনুসরণ করার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও উত্তম আদর্শ।

একটি মজলিসের মধ্যে রাসূল ﷺ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তাওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী' এ কথাটি একশ বারের বেশি বলতেন বলে সাহাবীরা গণনা করেন।

সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর যত সালাত আদায় করতেন, সব সালাতে তিনি এ দু'আ পড়তেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন নবী করীম ﷺ তাঁর রুকু ও সিজদায় এ দু'আটি বেশী বেশী বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।" কুরআনের নির্দেশ (সূরা নসর) অনুযায়ী তিনি এরূপ আমল করতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, তোমাদের কাউকে তার আমল মুক্তি দেবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নাজাত দেবে না? তিনি বললেন, না আমাকেও না, তবে যদি আল্লাহ তা'আলা তার রহমত ও দয়া দ্বারা আমাকে ডেকে নেন।

কাজেই আমাদের রাসূলের অনুসরণ করতে হবে এবং তার সাহাবীরা কীভাবে তাওবা করেছে তা অনুকরণ করতে হবে। নিচে দুই সাহাবীর প্রসিদ্ধ দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

সাহাবীদের তাওবা

মনে রাখবেন, সাহাবীরা ছিল উম্মতের আদর্শ। তারা যখন কোনো ভুল করতেন, সাথে সাথে তারা তার থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন এবং পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তারা অস্থির হয়ে যেতেন। তারা তাদের নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে তা প্রকাশ করতে কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমরা এখানে এ উম্মতের প্রথম যুগের রাসূলের সাহাবীদের তাওবার কয়েকটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করবো।

মায়েয ইবনে মালেক আল আসলামী রা.-এর তাওবা

১. বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক আল আসলামী রা. রাসূলুল্লাহ সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার আত্মার ওপর যুলুম করেছি, আমি যিনা করেছি। আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্প্রদায়ের নিকট লোক প্রেরণ করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মানসিক কোনো সমস্যা রয়েছে বলে তোমাদের কাছে সংবাদ আছে কি? তারা বলল, আমরা তো এ ধরনের কিছু জানি না। তাকে আমরা পূর্ণ জ্ঞানবানই দেখছি। আমাদের দৃষ্টিতে সে একজন সুস্থ মানুষ। এরপর সে তৃতীয়বার আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং রাসূল আবার তার গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন। তারা জানায়, তার কোনো মানসিক সমস্যা নেই। অতঃপর যখন সে চতুর্থবার আসে তখন তার জন্য গর্ত খোঁড়া হয়, পাথর ছুড়ে হত্যার মাধ্যমে তার শাস্তি কার্যকর করা হয়।

২. গামেদিয়া [গামেদিয়া গোত্রের জনৈকা নারী] এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন! রাসূল তার কথার প্রতি কোনো কর্ণপাত করলেন না এবং তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি আমাকে ফেরত পাঠালেন? হয়তো আপনি আমাকে ময়েযের মতো ফেরত পাঠাচ্ছেন! আল্লাহর শপথ! আমি অবৈধভাবে গর্ভবতী। তখন তিনি তাকে বললেন, যখন সন্তান প্রসব করবে, তখন এস। সন্তান জন্ম দেয়ার পর বাচ্চাটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে মহিলা রাসূলের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও যখন সে খাবার খেতে পারবে তখন আসবে। এরপর যখন বাচ্চা খাবার খেতে শুরু করে তখন মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে এসে হাজির হন, তখন বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি ধরা ছিল। সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! বাচ্চা এখন খাবার খাচ্ছে। অতঃপর তার বাচ্চাটাকে একজন মুসলমানের জিম্মায় দেয়া হলো। এরপর তার বুক পর্যন্ত গর্ত খুঁড়তে নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর লোকদের নির্দেশ দেয়া হলো যেন পাথর ছুড়ে হত্যার মাধ্যমে তার শাস্তি কার্যকর করা হয়। খালিদ ইবনে অলিদ একটা পাথর ছুড়ে তার মাথায় মারেন, যার ফলে রক্ত ছুটে খালিদের মুখে এসে পড়ে, এজন্য খালিদ তাকে গালি দেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গালি শুনতে পেয়ে বলেন, হে খালিদ! আমার জীবন যে সত্তার হাতে রয়েছে তার কসম করে বলছি। এ নারী এমন তাওবা করেছে, যদি এ তাওবা কোনো অবৈধ ট্যাক্স আদায়কারী করত, তাহলে তাকে ক্ষমা করে

দেয়া হতো। এরপর নির্দেশ দেয়া হয় এবং তার জানাযা পড়ে তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া

আপনি হয়তো আমাকে বলতে পারেন, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার পাপের পরিমাণ অনেক বেশি, আমি আমার জীবনে যত ধরনের পাপ রয়েছে, তা সবই আমি করেছি। আমি জীবনে অনেক বড় বড় পাপ কামাই করেছি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিগত এত বছরের সব পাপ কি মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন? হে সম্মানিত পাঠক ভাই! আপনাকে আমি বলছি, এটি বিশেষ কোনো সমস্যা নয়; বরং এটা অনেকেরই সমস্যা যারা তাওবা করতে চায়। পাপ যত বড় হোক না কেন, মহান আল্লাহর রহমত ও দয়া তার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের পাপকেই ক্ষমা করবেন।

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে স্বীয় বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ [অতীতের] যাবতীয় পাপ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে আস এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর আযাব আসার পূর্বেই, অতঃপর আর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।"[১]

মহান আল্লাহ বান্দাদের আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করবেনই। আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا اُبَالِي، يَا اِبْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا

أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

অর্থাৎ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যখনই তুমি আমাকে ডাকবে ও আশা করবে, আমি তোমার মধ্যে যে সব দোষ-ত্রুটি আছে, সেগুলো নির্বিঘ্নে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপের স্তূপ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাইলে, আমি নির্বিঘ্নে তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিন ভর্তি পাপ করে থাক, তারপর যে অবস্থায় তুমি আমার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করোনি সে অবস্থায় তুমি আমার নিকট আসলে, আমি তোমার কাছে জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব।[১]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"কোনো বান্দা রাতে যে সব অপরাধ করে, তা ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সারাদিন হাত পেতে রাখেন, আর দিনের বেলা যে সব অপরাধ করে, তা ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাতে হাত পেতে দেন। এটি ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে, যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫৯/৩১)

মোটকথা পাপের পরিমাণ যত বেশি হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারপরও আমাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন কিনা? এ অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার কারণ হচ্ছে:

প্রথমত: আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার ব্যাপকতা সম্পর্কে বান্দার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকা। এর ব্যাখ্যা হিসেবে মহান আল্লাহর এ বাণীই যথেষ্ট হবে:

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ [অতীতের] যাবতীয় পাপ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু"।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর রহমত যে কত ব্যাপক সে সম্পর্কে ঈমানে ঘাটতি থাকা। এক্ষেত্রে নিচের হাদীসে কুদসীই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি জানলো যে, আমি পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেব, এ ব্যাপারে কোনো কিছুতেই পরওয়া করবো না, যদি সে আমার সাথে কোনো কিছু শরিক [অংশীদার] না করে থাকে"। এটি হবে যখন বান্দা আল্লাহর সাথে পরকালে সাক্ষাৎ করবে।

তৃতীয়ত: তওবার কার্যকর ক্ষমতা সম্পর্কে এ ধারণা না থাকা যে, তা সব পাপকেই ক্ষমা করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে রাসূলের এ হাদীসই যথেষ্ট, "যে ব্যক্তি তওবা করবে তার যেন কোনো গুনাহ থাকবে না।"

তাওবার প্রতিবন্ধকতা

১. শয়তান মানুষের সামনে পাপগুলো সুশোভিত করে তুলে এবং প্রিয় বানিয়ে দেয়। ফলে বান্দার অন্তর পাপকাজের দিকে অগ্রসর ও ধাবিত হয়। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা হতে পলায়ন করে এবং ইবাদত-বন্দেগী করা তার নিকট কষ্টকর হয়।

২. হারামকে হালাল হিসেবে তুলে ধরে এবং হালালকে হারাম হিসেবে তুলে ধরে শয়তান বান্দাকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। এ ছাড়াও ভালো কাজকে খারাপ এবং খারাপ কাজকে উত্তম হিসেবে প্রকাশ করে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। ফলে তার আর তওবা করার সুযোগ হয় না। সে যে অন্যায় করছে, তা সে বুঝতেই পারে না।

৩. শয়তান বান্দাকে তাওবা থেকে ফিরানোর জন্য তারা তাকে বিভিন্ন ধরনের আশা দিয়ে থাকে। শয়তান বান্দাকে বলতে থাকে, তুমি তাওবা করতে এত তাড়াহুড়া করছ কেন? তোমার তো তাওবা করার এখনো অনেক সময় রয়েছে। তুমি এখনো যুবক, পড়ালেখা শেষ করোনি, চাকরি পাওনি ইত্যাদি। এরপর যখন চাকরি পায় তখন বলে এখনো বিবাহ করোনি ইত্যাদি বলে শয়তান মানুষকে তাওবা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ জাতীয় সমস্য সামনে আসলে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। কারণ, মৃত্যু ছোট বড় কাউকেই ছাড়ে না। যে কোনো সময় যে কোনো বয়সের লোকের মৃত্যু আসতে পারে। তখন আর তাওবা করার সুযোগ থাকবে না।

৪. পাপকে ছোট মনে করে তাওবা করা হতে বিরত থাকে। যখন কোনো একটি গুনাহ করে, তখন শয়তান এসে বলে, এতো বড় ধরনের কোনো অপরাধ নয় যে, তা হতে তাওবা করতে হবে। মানুষ এর চেয়ে আরো বড় বড় গুনাহ করে থাকে।

৫. তাওবা করার পর গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে তাওবা করতে মনে চায় না। কারণ, যখন তাওবা করে তখন সাথীরা বলে তুমি এত কষ্ট করছ কেন? তোমার থেকে তোমার সাথীরা দূরে সরে যাচ্ছে, সবাই তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাচ্ছে।

৬. হতাশাও মানুষকে তাওবা থেকে ফিরিয়ে রাখে। কারণ, যখন কোনো বান্দাহ পাপ করার পর তাওবা করতে চায়, তখন শয়তান এসে বলে, তোমার গুনাহ অনেক বড় যা আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবে না। যদি ক্ষমা নাই করে, তাহলে তাওবা করে লাভ কী? ফলে সে তাওবা করা হতে বিরত থাকে।

যখন আপনার সামনে উল্লিখিত বিষয়গুলো আসবে তখন আমরা আপনাকে বলব, আপনি শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। নিশ্চয় শয়তানদের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। আপনি শয়তানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, এসব শয়তান ও তার দোসররা অবশ্যই থেমে যাবে অতঃপর খুব শীঘ্রই তার ষড়যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং মুমিনের ধৈর্য ও দৃঢ়তার সামনে সে পরাজিত হবে।

আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আপনি যদি শয়তানের কথা মতো চলেন, তার কাছে মাথা নত করেন, তাহলে সে আরো অধিক ধোঁকা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। সুতরাং পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অতএব তার অনুসরণ না করে আল্লাহর সাহায্য চান এবং বলুন:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক"।[১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতির আশঙ্কা করতেন তখন বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনাকে তাদের গলার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি এবং আপনার নিকট তাদের খারাপী থেকে মুক্তি চাই।[১]

অনেক সময় দেখা যায় পাপকার্য ছাড়ার কারণে তার সাথে তার খারাপ বন্ধুরা যাদের সাথে ইতঃপূর্বে বন্ধুত্ব ছিল, তারা যোগাযোগ করে তাকে হুমকি দিয়ে বলে, তুমি এতদিন আমাদের সাথে ছিলে এখন কেন আমাদের থেকে দূরে সরে গেলে? আমাদের কাছে তোমার সব গোপন তথ্য আছে যেগুলো আমরা রেকর্ড করে রেখেছি, তোমার ছবিও আমাদের নিকট রয়েছে, তুমি যদি আমাদের সাথে বের

না হও তাহলে তোমার পরিবারের নিকট সব ফাঁস করে দিবো! একথা সঠিক যে, আপনার অবস্থান খুবই নাজুক।

এ জাতীয় কোনো পরিস্থিতির স্বীকার হলে, আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন, তাওবাকারীদের সাথে রয়েছেন এবং তিনি মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না এবং তাদেরকে ছেড়ে দেবেন না। তাঁর নিকট কোনো বান্দা আশ্রয় নেয়ার পর সে কখনো অপমানিত হয় না। আপনি জেনে রাখুন, নিশ্চয় কঠিন অবস্থার সাথেই সহজ অবস্থা আসে এবং সংকীর্ণতার পরেই প্রশস্ততা আসে।

সালাতুত তাওবা

পাপ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে সালাত আদায় করা হয় সেটাই সালাতুত তাওবা। তাওবার উদ্দেশ্যে দুই রাকআত বা চার রাকআত সালাত আদায় করা যেতে পারে। অথবা ফরয সালাতের পরও তাওবা করা যেতে পারে। সাইয়্যেদ সাবেক রহ. স্বীয় কিতাব ফিকহুস সুন্নাহতে বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস

عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ اِلَّا غَفَرَ لَهُ» . ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الاٰيَةَ {وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ. اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ

"হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি কোনো পাপ করবে তারপর উঠে (ওযূ-গোসল) আবশ্যক পবিত্রতা লাভ করবে এবং কিছু নফল নামায পড়বে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন "তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ

করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা দেখায় না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।"[১]

ত্বাবারানী কাবীরে 'হাসান' সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত সালাত দুই বা চার রাকআত ফরয কিংবা নফল পূর্ণ ওযূ ও সুন্দর রুকূ-সাজদাসহকারে হ'তে হবে।[১]

তওবার জন্য নিচের দু'আটি বিশেষভাবে সাজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে পড়া উচিত।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করছি বা তওবা করছি।"[১]

তাওবা কবুল হওয়ার আলামত

তাওবার যাবতীয় শর্তপূরণ করে যখন কোনো ব্যক্তি খালেসভাবে আল্লাহর দরবারে তাওবা করেন এবং পাপ থেকে ক্ষমা চান, তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার তাওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে যখন কোনো ব্যক্তি তাওবা করে, তার তাওবা কবুল হলো কিনা তার কিছু আলামত আছে। যেমন-

১. তাওবা করার পর লোকটির মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সে এখন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক নম্র, ভদ্র ও নমনীয়, পূর্বের তুলনায় অধিক নেক আমল করে, খারাপ সঙ্গীদের সাথে মিশে না, আলেম ওলামা ও উত্তম লোকদের সাথে উঠা-বসা করে এবং গুনাহের কর্ম ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

২. সর্বদা আল্লাহর পাকড়াও ও আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। সে

ধারণা করে যে কোনো সময় আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর ভয় তার অন্তরে বিদ্যমান থাকে। তার ভয় তখন দূর হয়, যখন মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলে-

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সে জান্নাতের সু-সংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।"

লোকটি সব সময় ইতঃপূর্বে যে সব অপরাধ করেছে, তার ওপর অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করতে থাকে। সে সব সময় আফসোস করতে থাকে আর বলতে থাকে- হায় এ অন্যায় কাজটি আমি কেন করলাম! আমি যদি এ কাজটি না করতাম! কতই না ভালো হতো! কারণ যে ব্যক্তি ইহকালে তার অপকর্মের ওপর লজ্জিত হবে না এবং আফসোস করবে না, পরকালে যখন সে আল্লাহর নেক বান্দাদের আমলের সাওয়াব ও বিনিময় এবং অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেখতে পাবে, তখন সে লজ্জিত হবে এবং আফসোস করবে। কিন্তু তখন তার লজ্জা ও আফসোস কোনো কাজে আসবে না।

কুরআনের প্রার্থনা মূলক আয়াত দ্বারা কল্যাণ লাভ

যে মহান আল্লাহর হাতে আসমান যমীনের ধন ভাণ্ডার, যিনি সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা দানকারী, ভাল-মন্দের চাবিকাঠি যার হাতে, যার ইচ্ছা ও আদেশ ব্যতিত কিছুই হতে পারে না, যার হুকুম ব্যতিত কোনো সৃষ্টিই কারো কোনো লাভ-ক্ষতি করতে পারে না, তিনিই তাঁর কাছে চাওয়া পাওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে আবেদন পত্র দিয়ে নিশ্চয়তা দিলেন যে, 'আমার কাছে চাও, আমি দান করবো, যারা আমার কাছে চাও না তাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট'। তাছাড়া চাওয়া এবং পাওয়াই তো আসল ব্যাপার। কে না পেতে চায়? যেখানে পাবে সেখানেই তো মানুষ দৌড়ে যায়। আর আসল পাওয়ার স্থান আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তাঁর কাছে চাওয়া বৃথা যাবে না। আল্লাহ কল্যাণজনক মনে করলে তাড়াতাড়ি দিবেন অথবা বিলম্বে দিবেন অথবা তার আগত কোনো বিপদ দূর করবেন নচেৎ আখেরাতের জন্য রেখে দেবেন আরো অধিক উত্তম দেওয়ার জন্য। দুনিয়ার যে চাওয়া আল্লাহ পরকালে দিবেন তা পেয়ে বান্দাহ বলবে 'আমার সব চাওয়া দুনিয়াতে না পেয়ে এখন দেয়া হতো, তাহলেই তো ভাল হতো।' আর চাওয়াই বড় ইবাদাত এবং চাওয়াই হলো সর্বোত্তম যিকর।

এজন্য চাওয়াই কামিয়াবী। আল্লাহর দেয়া কুরআনের আবেদন পত্রগুলোর মাধ্যমে আবেদন করে আল্লাহর নিকট থেকে তাঁর নি'আমত নিয়ে আমরা সকলে ধন্য হতে পারি।

নু'মান ইবনু বশীর (রা.) বলেন,নবী করীম ﷺ বলেছেন:

أَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত" একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

"তোমাদের প্রভু বলেন; তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবো। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা করে না) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"[৩] (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১১; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৭৬ ; ইবনু মাজাহ, আস সুনান ২/১২৫৮; হাদীসখানা সহীহ) এ আয়াতে দু'আ বা প্রার্থনাকে ইবাদত বলা হয়েছে।

এ জন্য এখানে কয়েক খানা প্রার্থনা সম্বলিত কুরআনের আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো। এ প্রার্থনা সম্বলিত আয়াতগুলো আমরা ফরয সালাতে অথবা সুন্নাত বা নফল সালাতেও পাঠ করতে পারি। রাসূল ﷺ প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী আমাদেরও আমল করা উচিত। তাই অর্থসহ প্রার্থনা সম্বলিত কুরআনের আয়াত বেশী বেশী করে মুখস্ত করে সালাতে তা পাঠ করা আল্লাহ প্রেমিক মুমিনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত । আর এটা হবে আল্লাহর পথের পথিকদের দ্বীনের পথ চলার সর্বোত্তম হাতিয়ার।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থঃ "অতপর যখন হজ্জের অনুষ্ঠান সমাধা কর, তখন তোমাদের বাপ-দাদাকে যেরূপ স্মরণ করতে সেরূপ আল্লাহকে স্মরণ কর বরং তার চেয়েও অধিক স্মরণ করবে। অতপর মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই কল্যাণ দান কর, " এদের জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। আর যারা বলে,"**হে আমাদের রব! দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও, আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও**।" এদের জন্যই রয়েছে প্রাপ্য তাদের উপার্জনের আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আল বাকারা ২: ২০০-২০২)

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ একজন অসুস্থ রোগাক্রান্ত মুসলমানকে দেখতে গিয়ে দেখেন যে, লোকটি একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূল ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো কিছুর প্রার্থনা করেছিলে? সে বললো, হ্যাঁ! আমি এ প্রার্থনা করেছিলাম- 'হে আল্লাহ! তুমি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দেবে সে শাস্তি আমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দাও।' এটা শুনে রাসূল ﷺ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! কারো পক্ষে কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

দু'আটি পড়ো।' তখন থেকে রুগ্ন ব্যক্তিটি এ প্রার্থনাটি করতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন।" সহীহ মুসলিম

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহই মালিক যা কিছু রয়েছে মহাকাশে আর যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা তোমরা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসেব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, যাকে ইচ্ছা আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আর আল্লাহ সকল কাজে সর্বশক্তিমান। এ রাসূল (মুহাম্মাদ) ঈমান এনেছে তাতে, যা নাযিল হয়েছে তার ওপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে এবং মুমিনগণও (ঈমান এনেছে)। তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে:) 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করিনা।' তারা আরো বলে: ' আমরা নির্দেশ শুনি এবং আনুগত্য করি। হে প্রভু! আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে (সবাইকে)।' আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তার ওপর তাই বর্তায় যা সে করে । হে আমাদের রব! আমাদের পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুল করি অথবা অপরাধ করি। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যেমন বোঝা তুমি চাপিয়ে দিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর । হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা আমাদের বহন করার শক্তি নাই। আমাদের পাপ মোচন করে দাও, আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি রহম কর, তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফিরদের ওপর তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো।, (সূরা বাকারার ২৮৪-২৯৫)

(সরা বাকারার শেষ এ আয়াতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ফযিলতের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু ! হিদায়াত দানের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না, তোমার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি দানকারী। হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় তুমি সকল মানুষকে এমন একদিন একত্রিত করবে যে দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা আলে ইমরান ৮-৯)

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ.

অর্থঃ (হে নবী) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসব (দুনিয়ার সামগ্রী) থেকে উত্তম বিষয়ের খবর দিব? (আর তা হলো) মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আর তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র জুগল এবং আলাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যারা বলে হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আর এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান ১৫-১৭)

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থঃ কত নবীর সাথী হয়ে বহু আল্লাহওয়ালাগণ যুদ্ধ করেছে; অতপর আল্লাহর পথে তাদের ওপর বিপদ আসার পর তারা না হীনবল হয়েছে, আর না হয়েছে দুর্বল , আর না নত হয়েছে, আর আলাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। আর তাদের কথা ছিল শুধু – হে আমাদের রব! আপনি ক্ষমা করে দিন আমাদের পাপসমূহ এবং কাজের মধ্যে আমাদের সীমালংঘনকে, আর আমাদের কদমকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং সাহায্য করুন আমাদেরকে কাফিরদের মোকাবিলায়। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেছেন পার্থিব কল্যাণ আর উত্তম পুরস্কার রয়েছে আখেরাতের জন্য; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ১৪৬-১৪৮)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا

مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)

অর্থঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে , রাত ও দিনের আবর্তনে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যার জ্ঞানবান।(১৯০) যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আর যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে; আর বলে, হে আমাদের রব! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।(১৯১) হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে লাঞ্ছিত করলে; আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।(১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব (এর উছিলায়) তুমি আমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদার ব্যতিক্রম করনা। (১৯৪) সূরা আলে ইমরান।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার রাসূলাল্লাহদের মধ্য থেকেও । হে আমাদের পালন কর্তা! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। (৪০) হে আমাদের প্রভু ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন। (৪১) সূরা ইবরাহীম।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থঃ তখন আদম ও হাওয়া আ. ফরিয়াদ করলো: 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো।' (সূরা আল আ'রাফ ৭:২৩)

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

অর্থঃ যুবকেরা যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তারা বলেছিল 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দান করো তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমাদেরকে আমাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে দাও।' (সূরা আল কাহফ ১৮:১০)

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থঃ আমার একদল বান্দাহ বলতো: 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, এর উছিলায় তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি দয়া করো, আর তুহি তো সর্বোত্তম দয়াশীল।'(সূরা মু'মিনুন ২৩:১০৯)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থঃ হে নবী! তুমি বলো: 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা করো এবং দয়া করো, আর তুমিই তো সর্বোত্তম দয়াশীল।' (সূরা মু'মিনুন ২৩:১১৮)

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ.

অর্থঃ যারা তাদের (প্রথম দিকের মুহাজির ও আনসারগণের) পরে এসেছে (ঈমান এনেছে) তারা বলে: 'হে আমাদের প্রভু! ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন আর আমাদের অন্তরে মু'মিনদের জন্য কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়াবান, পরম করুণাময়।'(সূরা হাশর ৫৯:১০)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার ওপর ভরসা করলাম এবং আমরা তোমারই অভিমুখী হলাম আর প্রত্যাবর্তন তো হবে তোমারই কাছে।

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের নিপীড়নের পাত্র বানিয়ো না। হে প্রভু! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।' (সূরা মুমতাহানাহ ৬০:৪,৫)

أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তাওবা করো (অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসো) আল্লাহর দিকে শুদ্ধ একনিষ্ঠ তাওবা। তাহলে অবশ্যি তোমাদের প্রভু তোমাদের থেকে মুছে দিবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। সেদিন আল্লাহ অপমানিত করবেন

না তাঁর নবীকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে দিয়ে এবং ডানে দিয়ে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও আমাদের নূর (জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত) এবং আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, **'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।**

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ .

আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, **'আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম'**। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোলেমীন বলে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ "

অর্থ: "সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মাছওয়ালা (ইউনুস আ.) যখন মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দু'আ করল যে

'আপনি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।' (সূরা আম্বিয়া: ৮৭)

এ আয়াত পাঠ করে যখনই কোনো মুসলমান দু'আ করবে তখন আল্লাহ তার দু'আ কুবল করবেন।" (তিরমিযী: ৩৫০৫)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, **'হে আমার রব!** আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65)

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) الْفُرْقَانُ 25

আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হল অবিচ্ছিন্ন'। 'নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট'।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) الْفُرْقَانُ 25

আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'।

সূরা ফালাক ও নাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অর্থঃ বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার (১) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন , তার অনিষ্ট থেকে (২) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয় (৩) আর গিরায় ফুঁ দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৪) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে (৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

পরমকরুনাময় অসীমদয়ালু আলাহর নামে

অর্থঃ বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের কাছে (১) মানুষের মালিকের কাছে (২) মানুষের ইলাহের কাছে (৩) তার অনিষ্ট থেকে , যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে (৪) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৫) জিনদের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে (৬)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

যা জানা জরুরী

১ কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক

কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ফযীলাতের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির বিষয়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এ সকল বিষয়ে অনেক মিথ্যা কথাও হাদীস নামে চালানো হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক অনির্ভরযোগ্য ও বানোয়াট কথা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা বা আয়াত বিষয়ক দুই প্রকারের কথা প্রচলিত। এক প্রকারের কথা ফযীলাত বা আখিরাতের মর্যাদা, সাওয়াব, আল্লাহর দয়া ইত্যাদি বিষয়ক। দ্বিতীয় প্রকারের কথা 'তদবীর' বা দুনিয়ায় বিভিন্ন ফলাফল লাভ বিষয়ক।

বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ফযীলাতের কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত বাকি হাদীসগুলি অধিকাংশই যয়ীফ অথবা বানোয়াট। আমাদের সমাজে প্রচলিত পাঞ্জ-সূরার ফযীলাত বিষয়ক অধিকাংশ কথাই যয়ীফ অথবা জাল। এ বিষয়ক যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি এবং এগুলির বিস্তারিত আলোচনার জন্য পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। এ বইয়ের কলেবর ইতোমধ্যেই অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আমরা এ বইয়ে ফযীলাত বিষয়ক যয়ীফ ও জাল হাদীসগুলি কিছু আলোচনা করছি । এখানে আমল-তদবীর বিষয়ক কিছু কথা উল্লেখ করছি।[১২৫]

২ আমল-তদবীর ও খতম বিষয়ক

কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁক দেওয়া বা এগুলি পাঠ করে বিভিন্ন রোগব্যাধি বা বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য 'আমল' করা বৈধ। হাদীস শরীফে 'কুরআন' দ্বারা 'রুক্ইয়া' বা ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাদীসের দোয়া বা যে কোনো ভাল অর্থের বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈধ।

ঝাড়ফুঁক বা তদবীর দুই প্রকারের। কিছু ঝাড়ফুঁক বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রকারের ঝাড়ফুঁক ও আমল সীমিত। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ঝাড়ফুঁক, আমল ইত্যাদি পরবর্তী যুগের বুযুর্গদের অভিজ্ঞতার আলোকে বানানো। যেমন, অমুক সূরা বা অমুক আয়াতটি এত বার বা এত দিন বা অমুক সময়ে পাঠ করলে অমুক ফল লাভ হয় বা অমুক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরূপ সকল আমল বা তদবীরই বিভিন্ন বুযুর্গের অভিজ্ঞতা প্রসূত।

কেউ ব্যক্তিগত আমল বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'তদবীর' বা 'রুকইয়া শরঈয়্যা' হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে এগুলির কোনো খাস ফযীলাত আছে বা এগুলি হাদীস-সম্মত এরূপ ধারণা করলে রাসূলুল্লাহ = এর নামে মিথ্যা বলা হবে। এছাড়া তদবীর বা আমল হিসেবেও আমাদের উচিত সহীহ হাদীসে উল্লিখিত তদবীর, দোয়া ও আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

হাদীসের নামে যে সকল বানোয়াট 'আমল' বা 'তদবীর' আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

---

[১২৫] নুকাতুল বাদী'আত, পৃ. ১৩১-১৩৪; ইবনু ইরাক, তানযীহ/২১৬৯-১৭০; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ১/১৩৯-১৪১।

১. লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা .... দারিদ্র্য বিমোচনের আমল

(লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) এ যিক্‌রটির ফযীলাতে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এ বাক্যটিকে বেশি বেশি করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বাক্যটি জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডার, গোনাহ মাফের ও অফুরন্ত সাওয়াব লাভের অসীলা বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। এ বিষয়খ কিছু সহীহ হাদীস এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি এই বাক্যটি প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করবে সে কখনো দরিদ্র থাকবে না।" কথাটি বানোয়াট বলেই প্রতীয়মান হয়।

৩. ঋণমুক্তির আমল

আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিম্নের বাক্যটি বললে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা পরিশোধ করাবেন :

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

"হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন।" হাদীসটি সহীহ।[১২৬]

কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে বা বিশেষ সংখ্যায় দোয়াটি পাঠ করার বিষয়ে কোনো নির্দেশ কোনো হাদীসে দেওয়া হয়নি। প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : "হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে ৭০ বার এ দোয়া পড়বে, অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ তাকে ধনী ও সৌভাগ্যশালী করে দিবেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন : শুক্রবার দিন জুমুয়ার নামাযের পূর্বে ও পরে ১০০ বার করে দরুদ পড়ে এ দোয়া ৫৭০ বার পাঠ করলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও তাহা অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ হয়ে যাবে...।" এই বর্ণনাগুলি ভিত্তিহীণ ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান হয়।

---

২. সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬০, নং ৩৫৬৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২১।

৪. সূরা ফাতিহার আমল

সূরা ফাতিহার ফযীলতে বলা হয় : اَلْفَاتِحَةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ

"ফাতিহা যে নিয়তে পাঠ করা হবে তা পূরণ হবে।"

এ কথাটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। আরেকটি কথা বলা হয় :

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

"সূরা ফাতিহা সকল রোগের আরোগ্য বা শেফা।"

এ কথাটি একটি যয়ীফ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[১২৭]

৫. বিভিন্ন প্রকারের খতম

বিভিন্ন প্রকারের 'খতম' প্রচলিত আছে। সাধারণত, দুটি কারণে 'খতম' পাঠ করা হয়: (১) বিভিন্ন বিপদাপদ কাটানো বা জাগতিক ফল লাভ ও (২) মৃতের জন্য সাওয়াব পাঠানো। উভয় প্রকারের খতমই 'বানোয়াট' ও ভিত্তিহীন। এ সকল খতমের জন্য পঠিত বাক্যগুলি অধিকাংশই খুবই ভাল বাক্য। এগুলি কুরআন কারীমের আয়াত বা সুন্নাত সম্মত দোয়া ও যিক্র। কিন্তু এগুলি এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠের কোনো নির্ধারিত ফযীলাত, গুরুত্ব বা নির্দেশনা কিছুই কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে বলা হয় নি। এ সকল 'খতম' সবই বানোয়াট। ওপরন্তু এগুলিকে কেন্দ্র করে কিছু হাদীসও বানানো হয়েছে।

'বিসমিল্লাহ' খতম, দোয়া ইউনুস খতম ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের। বলা হয় 'সোয়া লাখ বার বিসমিল্লাহ পাঠ করলে অমুক ফল লাভ করা যায়' বা 'সোয়া লাখ বার দোয়া ইউনূস পাঠ করলে অমুক ফল পাওয়া যায়' ইত্যাদি। এগুলি সবই বুযুর্গদের অভিজ্ঞতার আলোকে বানানো এবং কোনোটিই হাদীস নয়। তাসমিয়া বা (বিসমিল্লাহ), তাহলীল বা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দোয়া ইউনুস-এর ফযীলাত ও সাওয়াবের বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে।[১২৮] তবে এগুলি ১লক্ষ, সোয়া লক্ষ ইত্যাদি নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করার বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। খতমে খাজেগানের মধ্যে পঠিত কিছু দোয়া সুন্নাত সম্মত ও কিছু দোয়া বানানো। তবে পদ্ধতিটি পুরোটাই বানানো।

---

[১২৭]. সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ৩০৫, নং ৭৩৪, মুল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ: ১৬৫, নং ৬৩৩, ৬৩৪, আলবানী, যয়ীফুল জামিয় আসসাগীর, পৃ: ৫৭৬, নং ৩৯৫১।

৪. দেখুন, লেখকের অন্য বই : রাহে বেলায়াত, পৃ. ৮৯।

৬. যিক্‌র, ওযীফা, দোয়া ইত্যাদি

মহান আল্লাহর বিভিন্ন পাক নামের ওযীফা বা আমল

এ বিষয়ক প্রচলিত জাল হাদীসগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. "আল্লাহর যিক্‌র সর্বোত্তম যিক্‌র।"

বিভিন্ন পুস্তকে হাদীস হিসেবে নিম্নের বাক্যটির উল্লেখ দেখাযায় :

اَفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُ اللهِ۔

"আল্লাহর যিক্‌র সর্বোত্তম যিক্‌র।

অর্থের দিক থেকে কথাটি ঠিক। আল্লাহর যিক্‌র তো সর্বোত্তম যিক্‌র হবেই। আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া আর কার যিকির সর্বোত্তম হবে? তবে কথাটি হাদীস নয়। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে তা বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায়।

২. "যে ব্যক্তি রাত্রিতে আল্লাহর নাম যিক্‌র করে তাহার অন্তরে এবং মৃত্যু হইলে তাহার কবরে নূর চমকাইতে থাকিবে।[১২৯]

৩. যে ব্যক্তি ফজরের সময় 'আল্লাহ' নামটি ১০০ বার যিক্‌র করে নিম্নোক্ত ৬টি নাম (জাল্লা জালালুহু, ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু, ওয়া জাল্লা সানাউহু, ওয়া তাকাদ্দাসাত আসমাউহু, ওয়া আ'যামা শানুহু, ওয়া লা ইলাহা গাইরুহু) একবার করে পড়বে, সে ব্যক্তি গোনাহ হতে এমনভাবে মুক্ত হবে যেন সে এই মাত্র মাতৃগর্ভ হতে জন্মলাভ করল। তার আমলনামা পরিষ্কার থাকবে এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।[১৩০]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে বলা হয়েছে।

---

[১২৯]. মৌলবী মো. শামছুল হুদা, নেয়ামুল-কোর্‌আন, পৃ. ১৭।

[১৩০]. মৌলবী মো. শামছুল হুদা, নেয়ামুল- কোর্‌আন, পৃ. ৩৬।

১১. তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৬২, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৪৯, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১২৬, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৬-৩২৯, হাকিম, আল- মুসতাদরাক ১/৬৭৬, ৬৮১।

১২. হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৮৫, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়া ১/৫২. ২/২১১-১০/৮২, আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৩৯৪।

১৩. সহীহ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।

১৪. শাহ ওয়লীউল্লাহ, আল-কাউলূল জামিল, পৃ. ৩৮-৩৯; সিররুল আসরার, পৃ.৪০।

৪. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমার খাস যিকর

আল্লাহর যিক্র -এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "সর্বোত্তম যিকির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।[১৩১] আরো বলেন : "তোমরা বেশি বেশি করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।[১৩২] অন্যত্র তিনি বলেন : "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা -নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহ-হু আকবার'। তুমি ইচছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার।[১৩৩]

এ সকল যিক্র-এর গুরুত্ব, ফযীলাত, সংখ্যা ও সময় বিষয়ক অনেক সহীহ্ ও হাসান হাদীস আছে। এ সমস্ত হাদীসে আমরা সেখানে দেখেছি যে, এ সকল যিক্র যপ করার বা উচ্চারণ করার জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ শেখান নি। কোথাও কোনো একটি সহীহ্ বা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলূল্লাহ ﷺ কাউকে টেনে টেনে, বা জোরে জোরে, বা ধাক্কা দিয়ে,শব্দাঘাত করে বা কোনো 'লতীফা'র দিকে লক্ষ্য করে, বা অন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে যিক্র করতে শিক্ষা দিয়েছেন। মূল কথা হলো, মনোযোগের সাথে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্র করতে হবে এবং প্রত্যেকে তাঁর মনোযোগ ও আবেগ অনুসরে সাওয়াব পাবেন।

পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিম, পীর ও মুরশিদ মুরিদগণের মনোযোগ ও আবেগ তৈরির জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এগুলি তাঁদের উদ্ভাবন এবং মুরিদের মনোযোগের জন্য সাময়িক রিয়াযত বা অনুশীলন।

তবে জালিয়াতরা এ বিষয়েও কিছু কথা বানিয়েছে। এ জাতীয় একটি ভিত্তিহীন কথা ও জাল হাদীস নিম্নরূপ : "একদা হযরত আলী (রা) হুযুর ﷺ -কে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য আমাকে সহজ সরল পন্থা বালিয়া দিন। হুযূর ﷺ বলিলেন- একটি যিকর করিতে থাক। হযরত আলী বলিলেন- কিভাবে করিব? এরশাদ করিলেন-চক্ষু বন্ধ কর এবং আমার সাথে তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল। হযরত আলী (রা) ইহা হযরত হাসান

বসরীকে এবং হযরত হাসান বসরী হইতে মুরশিদ পরম্পরায় আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।"

এই গল্পটির আরেকটি 'ভার্সন' নিম্নরূপ : "আলী (রা) বলেন, খোদা-প্রাপ্তির অতি সহজ ও সরল পথ অবগত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর অপেক্ষায় থাকেন। অত:পর জিবরাঈল (আ) আগমন করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা শরীফ তিনবার শিক্ষা দিলেন। জিবরাঈল (আ) যে ভাবে উচ্চারণ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺও সেভাবে আবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে তা শিখিয়ে দিলেন। আলী (রা) অন্যান্য সাহাবীকে তা শিখিয়ে দিলেন।"

এ হাদীসটি লোকমুখে প্রচলিত ভিত্তিহীন কথা মাত্র। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও হাদীসটি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এ জন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী উল্লেখ করেছেন যে, তরীকার বুযুর্গগণের মুখেই শুধু এই কথাটি শোনা যায়। এছাড়া এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।[১৩৪]

৫. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ওযীফা

অগণিত সহীহ হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌র দোয়া বা ওযীফার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পালন করতেন বা সাহাবীগণকে ও উম্মতকে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি ছাড়াও কিছু ওযীফা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত, যা পরবর্তী যুগের মানুষদের বানানো, কোনো হাদীসে তা পাওয়া যায় না। নিম্নের ওযীফাটি খুবই প্রসিদ্ধ:

ফজর নামাযের পরে ১০০ বার هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ, যোহরের নামাযের পরে '১০০ বার هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ , আসরের নামাযের পরে ১০০ বার هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ, মাগরিবের নামাযের পরে ১০০ বার هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এবং ঈশার নামাযের পরে ১০০ বার هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ পাঠ করা।

এ বাক্যগুলি সবই সুন্দর এবং এগুলির পাঠে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এগুলির কোনোরূপ ফযীলাত হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এগুলিকে এত সংখ্যায় পড়তে হবে

বা অমুক সময়ে পড়তে হবে এমন কোনো প্রকারের নির্দেশনা কুরআন বা হাদীসে নেই। আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো ওযীফাগুলি পালন করা।

৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...'

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

"হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময়।"[১৩৫]

অনেকে এই বাক্যগুলির মধ্যে কিছু বাক্য বৃদ্ধি করে বলেন:

اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ۔

ইত্যাদি। মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.), আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহতাবী হানাফী (১২৩১ হি.) প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এই অতিরিক্ত বাক্যগুলি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। কিছু ওয়ায়েয এগুলি বানিয়েছেন।[১৩৬]

৭. দোয়ায়ে গঞ্জল আরশ

প্রচলিত মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়াগুলির অন্যতম এ দোয়াটি। এর মধ্যে যে বাক্যগুলি বলা হয় তার অর্থ ভাল। তবে এভাবে এ বাক্যগুলি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বাক্যগুলির সম্মিলিতরূপ এভাবে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বাক্যগুলির ফযীলাত ও সাওয়াবে যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা কথা।

৮. দোয়ায়ে আহাদনামা

অনুরূপ একটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে আহাদনামা'। প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে এ দোয়াটি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দোয়ার মূল বাক্যগুলি একাধিক যয়ীফ সনদে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। এ সকল হাদীসে এ

---

১৩৫. সহীহ মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।

১৩৬. মুল্লা আলী কারী, আল-আসরারুল মারফূ'আ, পৃ. ২৯০, ন ১১৩৪, আল্লামা তাহতাবী, হাশিয়াতু তাহতাবী আলা মারাকিল ফালা, পৃ. ৩১১-৩১২।

১৭. আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৪১২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪০৯; হাকিম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূল ২/২৭২; হাইসামী, মাজমাউস যাওয়াইদ ১০/১৭৪, ১৮৪; তাবারী, আত-তাফসীর ১১/১৫৪।

দোয়াটি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ফযীলাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ এ দোয়াটি সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করেন তবে কিয়ামতের দিন সে মুক্তি লাভ করবে... ।[১৩৭]

এছাড়া এ দোয়ার ফযীলাত ও আমল সম্পর্কে প্রচলিত কথাগুলি সবই বানোয়াট। এ সকল বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার একটি নমুনা দেখুন : "তিরমিযী, শামী ও নাফেউল খালায়েক কিতাবে 'দোয়ায়ে আহাদনামা' স্মপর্কে বহু ফজীলতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে জীবনে আহাদনামা ১০০ বার পাঠ করবে সে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এবং আমি তার জান্নাতের জামিন হব। ...হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, মানব দেহে আল্লাহ তায়ালা তিন হাজার রোগব্যাধি দিয়েছেন। এক হাজার হাকিম ডাক্তারগণ জানেন এবং চিকিৎসা করেন। দু'হাজার রোগের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেন না। যদি কেহ আহাদনামা লিখে সাথে রাখে অথবা দু'বার পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে দু'হাজার ব্যাধি থেকে হিফাজত করবেন। [১৩৮]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা ও হাদীসের নামে জালিয়াতি। সুনানুত তিরমিযী তো দূরের কথা কোনো হাদীস -গ্রন্থেই এ সকল কথা কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

৯. দোয়ায়ে কাদাহ

প্রচলিত আরেকটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে কাদাহ'। এ দোয়াটির ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা।

১০. দোয়ায়ে জামীলা

দোয়ায়ে জামীলা ও এর ফযীলাত বিষয়ক যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা।

১১. হাফতে হাইকাল

হাফতে হাইকাল নামক এ দোয়াটির মধ্যে মূলত কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলির এরূপ বিভক্তি, বণ্টন ও ব্যবহার কোনো

---

[১৩৮]. আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৪১২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪০৯; হাকিম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূল ২/২৭২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৭৪, ১৮৪; তাবারী, আত-তাফসীল ১১/১৫।

কোনো বুযুর্গের বানানো ও অভিজ্ঞতালব্ধ। এগুলির ব্যবহার ও ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বিভিন্ন মানুষের কথা, রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা বা হাদীস নয়।

১২. দোয়ায়ে আমান

প্রচলিত আরেকটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে আমান। এ দোয়ার বাক্যগুলির অর্থ ভাল। তবে এভাবে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি এবং এর ফযীলতে যা কিছু বলা হয সবই বানোয়াট।

১৪. দোয়ায়ে হিযবুল বাহার

প্রচলিত একটি দোয়া ও আমল হলো 'দোয়ায়ে হিযবুল বাহার'। এ দোয়াটির মধ্যে ব্যবহৃত অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীস থেকে নিয়ে জমা করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে এ দোয়াটি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এর কোনোরূপ ফযীলাত, গুরুত্ব বা ফায়দাও হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

অনেক বুযুর্গ এগুলির আমল করেছেন। অনেকে 'ফল' পেয়েছেন। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে, এসকল দোয়াকে হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা মনে করলে অন্যায় হবে। কিন্তু বুযুর্গদের বানানো দোয়া হিসাবে আমল করতে দোষ কি?

এ কথা ঠিক যে, মুমিন যে কোনো ভাল বাক্য দিয়ে দোয়া করতে পারেন। তবে এ সকল দোয়ার কোনো সাওয়াব বা ফলাফল ঘোষণা করতে পারেন না। এ ছাড়া সহীহ হাদীসে অনেক সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলি পালন করলে এরূপ বা এর চেয়েও ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। এ সকল বানোয়াট 'সুন্দর সুন্দর' দোয়ার প্রচলনের ফলে সে সকল 'নব্বী' দোয়া অচলও পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। এ সকল দোয়ায় বুযুর্গীর ছোয়া থাকলেও নবুওতের নূল নেই। আমাদের জন্য উত্তম হলো নবুওতের নূর থেকে উৎসারিত দোয়াগুলি পালন করা। এতে দোয়া করা ও ফল লাভ ছাড়াও আমরা সুন্নাতকে জীবিত করার এবং রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর ভাষায় দোয়া করার অতিরিক্ত সাওয়াব ও বরকত লাভ করব।

৭. দরূদ -সালাম বিষয়ক

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মহান নবীর ﷺ ওপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করতে। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে আকরাম ﷺ এর ওপর দরুদ পাঠ করা ও সালাম পাঠ

করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। সহীহ্ হাদীসের আলোকে দরুদ ও সালামের ফযীলাতেরবিষয়গুলি ' দরূদ ও সালাম বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ সকল ফযীলাতের মধ্যে রয়েছে :

(১) সালাত ও সালাম পাঠকারীর ওপর আল্লাহ নিজে সালাত (রহমত) ও সালাম প্রেরণ করেন। একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করলে আল্লাহ সালাত পাঠকারীকে ১০ বার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন, তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গোনাহ্ ক্ষমা করবেন। একবার সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাম জানাবেন।

(২) সালাত বা দরুদ পাঠকারী যতক্ষণ দরুদ পাঠে রত থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন। একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করলে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তাঁর ওপর সত্তর বার সালাত (রহমত ও দোয়া) করবেন।

(৩) সালাত ও সালাম পাঠকারীর সালাত ও সালাম তার পরিচয়সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌছান হবে।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সালাত পাঠকারীর জন্য দোয়া করবেন।

(৫) দরুদ পাঠ কিয়ামতে নবীজী ﷺ এর শাফায়াত লাভের ওসীলা।

(৬) মহান আল্লাহ দরুদ পাঠকারীর দোয়া কবুল করবেন এবং সকল দুনিয়াবী ও পারলৌকিক সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।

দরুদের এত সহীহ ফযীলাত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় আবেগী মানুষ দরুদের ফযীলতে আরো অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন।

'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ' এটুকু কথা হলো দরুদের নুন্যতম পর্যায়। এর সাথে 'সালাম' যোগ করলে সালামের ন্যূনতম পর্যায় পালিত হবে। যেমন, 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিও সাল্লিম'। অথবা 'সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লামা।' সহীহ্ হাদীসে দরুদ পাঠের জন্য দরুদে ইবরাহিমী ও ছোট বাক্যের দুই একটি দরুদ পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত দরুদের বাক্যগুলি দরূদ ও সালাম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত দরুদের বিভিন্ন নির্ধারিত বাক্য সবই বানোয়াট।

দরুদ-সালাম বিষয়ক কিছু প্রচলিত বানোয়াট বা অনির্ভরযোগ্য কথা

১. জুমু'আরর দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরুদ পাঠে ফযীলাত

জুমআর দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে সহীহ হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ দিনে নির্ধারিত সংখ্যক দরুদ পাঠের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ দিনে বা রাতে ৪০ বার, ৫০ বার, ১০০ বার, ১০০০ বার বা অনুরূপ কোনো সংখ্যায় দরুদ পাঠ করলে ৪০, ৫০, ১০০ বৎসরের গোনাহ মাফ হবে, বা বিশেষ পুরস্কার বা ফযীলাত অর্জন হবে অর্থে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুমিন যথাসাধ্য বেশি বেশি দরুদ ও সালাম এ দিনে পাঠ করবেন। নিজের সুবিধা ও সাধ্যমত 'ওযীফা' তৈরি করতে পারেন। যেমন আমি প্রতি শুক্রবার অথবা প্রতিদিন ১০০, ৩০০ বা ৫০০ বার দরুদ ও সালাম পাঠ করব।

২. দরুদে মাহি বা মাছের দরুদ

দরুদে মাহি 'মাছের দরুদ'-এর কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাবলি সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। অনুরূপভাবে এ দরুদের ফযীলাত বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। এ বানোয়াট কাহিনীটিতে বলা হয়েছে, যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে একব্যক্তি নদীর তীরে বসে দরুদ পাঠ করতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মাছ শুনে শুনে দরুদটি শিখে ফেলে এবং পড়তে থাকে। ফলে মাছটি সুস্থ হয়ে যায়। পরে এক ইহূদীর জালে মাছটি আটকা পড়ে। ইহূদীর স্ত্রী মাছটিকে কাটতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে মাছটিকে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মাছটি ফুটন্ত তেলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দরুদটি পাঠ করতে থাকে। এতে ঐ ইহূদী আশ্চার্যান্বিত হয়ে মাছটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়। তাঁর দোয়ায় মাছটি বাকশক্তি লাভ করে এবং সকল বিষয় বর্ণনা করে। ...পুরো ঘটনাটিই ভিত্তিহীন মিথ্যা।

৩. দরুদে তাজ, তুনাজ্জিনা, ফুতুহাত, শিফা ইত্যাদি

দরুদে তাজ, দরুদে তুনাজ্জিনা, দরুদে ফুতুহাত, দরুদে রু'ইয়াতে নবী ﷺ. দরুদে শিফা, দরুদে খাইর, দরুদে আকবার, দরুদে লাখী, দরুদে হাজারী, দরুদে রূহী, দরুদে বীর, দরুদে নারীয়া, দরুদে শাফেয়ী, দরুদে গাওসিয়া, দরুদে মুহাম্মাদী ....।

এ সকল দরুদ সবই পরবর্তী যুগের মানুষদের বানানো। এগুলির ফযীলাতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

এ সকল দরুদের বাক্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাল কথার সমন্বয়। তবে এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশেষভাবে পড়ার জন্য কোনো নির্দেশনা নেই। এ সকল দরুদের বাক্যগুলি বিন্যাস পরবর্তী মানুষদের তৈরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি পাঠ করলে দরুদ পাঠের সাধারণ ফযীলাত লাভ হতে পারে। তবে এগুলির বিশেষ ফযীলতে বর্ণিত কথাগুলি বানোয়াট।

যেমন, (আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) হাদীস সম্মত একটি দরুদ। আবার (আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন বি 'আদাদি কুল্লি দায়িওঁ ওয়া বি 'আদাদি কুল্লি ইল্লাতিওঁ ওয়া শিফা) কথাটির মধ্যে কোনো দোষ নেই। এই এই বাক্যের মাধ্যমে দরুদ পাঠ করলে দরুদ পাঠের সাধারণ সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। তবে এগুলির জন্য কোনো বিশেষ ফযীলাতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। সকল বানানো দরুদেরই একই অবস্থা। কোনো কোনো বানানো দরুদের মধ্যে শিরকের মত আপত্তিকর কথাও রয়েছে।

হাদীস সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জানার বিষয়

ক. বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু'প্রকার (১) সহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার।

১। **সহীহ লিযাতিহী :** যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী বলা হয়। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২। **হাসান লিযাতিহী :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

৩। **সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ) :** যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।

৪। **হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান) :** অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার

দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

খ. যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নাবাবী বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

প্রধানত ঃ দু'টি কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) সানাদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া, (২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকর হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ক্রটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো

১। মু'আল্লাক : যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

২। মুনকাতি : হাদীসের সানাদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

৩। মুরসাল : যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহতলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম মালিক (রহ) মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাকর রাজী ও

মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। **মু'দাল :** হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। **মুদাল্লাস :** সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার ওপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬। **শা'য :** একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ্ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭। **মা'রুফ :** যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

৮। মুনকার : মা'রূফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

৯। **মাতরূক :** যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদিতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। **মাওযু বা বানোয়াট :** যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে তবে তার হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। **মুবহাম ঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। মুদ্‌রাজ ঃ য হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

গ. দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন অথবা করেছেন এরূপ বলা অনুচিত

ইমাম নাবাবী (রহ) 'আল-মাজমু'আহ শারহুল মুহাজ্জাব' গ্রন্থে (১/৬৩) বলেন ঃ "হাদীস বিশারদ মুহাক্কিক 'আলিমগণ ও অন্যান্যরা বলেছেন কোন হাদীস দুর্বল হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে,

(قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهٰى أَوْ حَكَمَ) -রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা সিগায়ে জাযাম (দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ) দ্বারা প্রকাশ পায়। অনুরপভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবিঈ এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীসটি দুর্বল হয়ে থাকে। এসবের কোনটিতেই সিগায়ে জাযাম ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে رُوِىَ عَنْهُ. أَوْ نُقِلَ عَنْهُ أَوْ حُكِىَ عَنْهُ.

أو يُذْكَرُ.... তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে নাক্বল করা হয়েছে, তার সূত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ, যা সিগায়ে তাম্‌রীয-এর অর্থ প্রকাশ করে, সিগায়ে জাযাম নয়। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সিগায়ে জাযাম গঠিত হয়েছে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য। আর সিগায়ে তাম্‌রীয গঠিত হয়েছে এ দু'টো ছাড়া অন্যগুলোর জন্য। তাই সিগায়ে জামামকে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা তা বিশুদ্ধতার অর্থ দেয়..... ।" (মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)

ইবনু সালাহ বলেছেন ঃ যখন তুমি সানাদ বিহীনভাবে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তাতে বলবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই এই বলেছেন। এছাড়াও অনুরূপ অর্থবোধক আলাযুল জাযিমাহ। কেননা এরূপ শব্দ প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ সত্যিই তা বলেছেন। তাই দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে বলবেঃ

رُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ كَذَا كَذَا أَوْ بَلَغَ عَنْهُ كَذَا كَذَا۔

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে এই এই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্র দিয়ে আমাদের নিকট এই এই পৌঁছেছে।" এ ধরনের কথা হাদীসটি সহীহ দুর্বল হওয়ার মাঝে সংশয়ের হুকুম দেয়। তাই যে হাদীসের বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি বলবে قَالَ رَسُوْلُ اللهِ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।" (মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব)

ঘ. ফাযায়িলে আ'মলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস মোতাবেক আমল করা যাযিয় কিনা?

'আক্বীদাহা ও আহকামের ক্ষেত্রে যেমন হালাল, হারাম, বেচা- কেনা, বিবাহ, ত্বালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ আহ্‌লি 'ইল্‌ম ও তাদের ছাত্রদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস আমল করা জায়িয। তাদের ধারণা এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেনই বা এমনটি হবে না, ইমাম নাবাবী তার কিতাবে এ সম্পর্কে ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন? কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্টই প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা এ বিষয়ে যে মত পার্থক্য আছে তা জানা বিষয়। হাফিয ইবনু হাজার (রহ) বলেন " "হাদীসের ওপর 'আমালের ক্ষেত্রে আহকাম অথবা ফাযায়িলের মধ্যকার কোন পার্থক্য নেই। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই শারী'আত।" সেজন্যই কতিপয় মুহাক্কিক 'আলিম বলেছেন, দুর্বল হাদীসের ওপর কোনক্রমেই আমল করা যাবে না। আহকামের ক্ষেত্রেও নয়, ফাযীলাতের ক্ষেত্রেও নয়। যেমন শায়খ জামালুদ্দীন কাশিমী (রহ) তার "কাওয়ায়িদুল হাদীস" (পৃষ্ঠা ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন। যাঁরা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করাকে বৈধ মনে করেননি। যেমন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ বাক্‌র আল-'আরাবী ও আরো অনেকে। তাঁদের দলে ইবনু হায্‌ম এবং আল্লামা শাওকানীও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব "শারহুত-তিরমিযী" (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন : "ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দিমাতে উল্লেখিত ভাষ্যগুলোর বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীসগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।"

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) বলেন : নিঃসন্দেহে এটাই সঠিক এবং তা কয়েকটি কারণে:

প্রথমত ঃ বিনা মতভেদে 'আলিমগণের নিকট দুর্বল হাদীস দুর্বল ধারণা বা অনুমানের অর্থ বহন করে। তাই ঐকমত্যে এর ওপর আমল জায়িয নয়। অতএব যে ব্যক্তি এর থেকে ফাযায়িলে আমল সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসকে পৃথক করবে তাকে অবশ্যই এর দলীল দিতে হবে। হায় আফসোস, কোথায় পাবেন দলীল!

আল্লাহ তা'আলা তো একাধিক আয়াতে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে?

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ

অর্থ "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের ওপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।" (সূরাহ আন-নাজম ২৮)

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ

অর্থ "তারা কেবলমাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" (সূরাহ আন-নাম ২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

অর্থ "তোমরা অনুমান করা থেকে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয়ত : আমি তাঁদের বক্তব্যে বুঝেছি ফাযায়িলে আমল দ্বারা তারা এমন আমলকে বুঝাচ্ছেন যা শারী'আত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা দ্বারা শারীঈ দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি হাদীসটি দুর্বলও হবে। যেখনে 'আমালের কোন নির্দিষ্ট সাওয়াবের উল্লেখ থাকবে, যা উক্ত আমলকারী লাভ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের এরূপ অর্থই বুঝেছেন কতিপয় 'আলিম। যেমন 'আলী আল-ক্বারী (রহ) তিনি "মিরক্বাত" গ্রন্থে ৯২/৩৮০) বলেছেন :

"ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস মোতাবেক আমল করা যাবে যদি হাদীসটি বেশি দুর্বল না হয়। যেমন এ ব্যাপারে ইজমা' হওয়া কথা বলেছেন ইমাম নাবাবী। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ফাযায়িল যা কিতাব অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত।"

এমনটি হলে তদানুযায়ী 'আমল করা যাবে যদি দলিলযোগ্য অন্য কোন সহীহ বর্ণনা দ্বারা আমলটি শারী'আত সম্মত বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ

মতের জমহুর প্রবক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে এরূপ উদ্দেশ্য করেননি। কেননা আমরা দেখেছি, তাঁরা এমন কতগুলো দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করেছেন যা অন্য কোন প্রমানযোগ্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ইক্বামাতের জবাবে 'আক্বামাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বাক্য বলাকে মুস্তাহাব মনে করা। অথচ এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। আর এই হাদীস ছাড়া দলিলযোগ্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়নি। এ সত্ত্বেও তারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অথচ মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচটি আহকামের অন্যতম একটি। যা অবশ্যই প্রমাণযোগ্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হয়।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের ওপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের ওপর ফাযায়িলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীল ও তাদের কোন 'আলিমের পক্ষে দেয়া সম্বব হয়নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন "দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।"

অতঃপর তিনি মুহাক্কিক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নকল করেন যে, তিনি বলেছেন : "আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরী'আতের পাঁচটি আহকাম (তথা ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না।"

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন : দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন আমল করা হতে শারী'আতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন। যারা দুর্বল হাদীসের ওপর ফযীলাতের ক্ষেত্রে আমল করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারণার বশবর্তী হয়েই তার ওপর শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) 'আল-ক্বায়িদাতুল জালীলাহ ফিত্ তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওয়াসীলাহ' (৮২ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন :

"শারী'আতের মধ্যে যঈফ হাদীসগুলোর ওপর নির্ভর করা জায়িয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ ও আরো কতিপয় 'আলিম ফযীলাতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়িয বলেছেন যদি মূল আমলটি শারঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া আমলটির ফাযীলাতে বর্ণিত হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা না যায়। আর এরূপ হলে হয়তো সাওয়াবটি সত্য বলা জায়িয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, যঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়িয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) আরো বলেন: "ইমাম আহমাদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শারী'আতের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের ওপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়) তিনি ভুল করেছেন।

(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ, সহীহ মাজিউস সগীর, মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড ৫০-৫২, ও অন্যান্য)

হাফিয ইবনু হাজার (রহ)-এর নিকট দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করার শর্তাবলী

হাফিয শাখাবী (রহ) বলেন, আমি আমার শায়খকে বার বার বলতে শুনেছি, দুর্বল হাদীসের ওপর তিনটি শর্তে আমল করা যাবে।

১। হাদীসটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোসে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না।

২। যে 'আমালের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে সেই আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে 'আমলে কোন ভিত্তিই নেই সেই 'আমালের ক্ষেত্রে ফযিলত বর্ণিত হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শারী'আত হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রাসূল ﷺ-এর রেফারেন্সে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রাসূল ﷺ তার ওপর আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে : ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে। এ ফযীলাত অর্জনের বিষয়টি কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী দুর্বল তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির ওপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, কোনটি কম দুর্বল এবং কোনটি বেশী দুর্বল তা পার্থক্য করার দায়িত্ব কার? সন্দেহ নেই ;নিশ্চয় এ বিষয়ে যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাঁদেরকেই তা করতে হবে দু'টি কারণে:

১। পৃথক না করলে যঈফকে সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার ওপর আমল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফযীলাতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলিমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে : যে কর্মটির ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ তা সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন 'আমালের জন্য ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের ওপরও আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীস দ্বারা 'আলিমদের ঐকমত্যে কোন আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আমল এবং ফযিলত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীস দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফযিলত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীসটি কর্ম দুর্বল হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে : কম দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে

পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেননি। ফলে তাঁর ওপর আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক! যখন নাবী ﷺ-এর হাদীস ভেবে কম দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না, তখন তার ওপর কোন স্বার্থে আমল করবেন? এটি কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ্ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একচর্তুথাংশ হাদীসের ওপর কি আমরা আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি। (আকমাল হুসাইন অনুদিত- যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারন মানুষ তো দূরের কথা বহু 'আলিমকে আমরা এ শর্তগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখছি। তারা কোন হাদীস সহীহ্ না যঈফ তা না জেনেই তার ওপর আমল করছেন। আর যখন হাদীসটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমাণ তারা জানতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীস মোতাবেক 'আমালের পক্ষে এমনভাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীসটি সহীহ্ হলে! সেজন্যই মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক ইবাদাত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই সহীহ্ নয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা এমন বহু সহীহ্ ইবাদাত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমাণযোগ্য সানাদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। (মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)

ঙ. কতিপয় পরিভাষা

১। **মুতাওয়াতির :** মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার ওপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। **খবরু ওয়াহিদ :** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এ খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার।

(ক) মাশহূর : আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তা (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) 'আযীয : সেই হাদীসকে বলা হয় যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু' জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

ﷺ **গরীব :** যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

৩। মারফূ : নাবী ﷺ-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। মাওকূফ : সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় মাওকূফ।

৫। মাক্বতূ : তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৬। মুত্তাসিল : যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

৭। মাহ্ফূয : যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফূয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৮। মাজহূল : যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। জাহালাত : যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

১০। তাবে' : তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

১১। শাহিদ : শাহিদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১২। মুতাবা'আত : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত। এটি দুই প্রকার

(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ : যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

(খ) মুতাবা'আতু কাসিরাহ : যদি সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যার তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা' বলা হয়।

১৩। মুসাহ্হাফ : আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজি হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এর পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালীন (রহ)-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদের ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে। তবে এদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। বিশেষ করে সাহাবীগণের সাহচার্য লাভকারী তাবিয়ীগণ সুদৃঢ়ভাবে সাহাবীগণের পথ অনুসরণ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতকে তারা সত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য করতেন। সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেন নি তা বলা বা করা তাঁরা অন্যায় মনে করতেন। তাঁরা এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদেরকে 'আহলুল বিদ'আত' বা 'বিদ'আত পন্থী' বলে অভিহিত করতেন।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (মৃত্যু ১১০ হি) বলেন :

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْئَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوْ سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُخُذْ حَدِيْثَهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدَيْثُهُمْ۔

"তাঁরা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৫-৪০ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল

তখন তাঁরা বললেন : তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"৫২

ইবনু সিরীন প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক সাহাবীর সাহচার্য লাভ করেন। এখানে আমরা দেখছি যে, এ সময় থেকেই সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ধারা দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথম ধারা 'আহলূস সুন্নাত' ও দ্বিতীয় ধারা 'আহলুল বিদ্'আত'। মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি বুঝতে হলে এ পরিভাষাগুলি আমাদের বুঝতে হবে। আমরা এখানে বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. আহল

আহ্ল (أَهْلٌ) অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি। এভাবে আমরা দেখছি যে আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা বিদ'আতের অনুসারী।

২. সুন্নাত

১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

আভিধানিকভাবে 'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ : মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম ﷺ -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

২. ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব

ইফতিরাক বিষয়ক হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, নাজাত, মুক্তি, জান্নাত ও সত্যের মাপকাঠি ও একমাত্র পথ 'সুন্নাতের অনুসরণ'। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও হাওয়ারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : (১) নবীর ﷺ সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও (২) তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা এ হাদীসে তিনি বিভ্রান্তদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : (১) মুখের দাবির সাথে কর্মের অমিল এবং (২) অনির্দেশিত কর্ম। অন্য হাদীসে তিনি তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণেল মত ও পথের ওপর থাকাকেই নাজাতের মানদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. সুন্নাতুস সাহাবা

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার সাথে অণুসরণ করাকে জান্নাত ও সফলতার পথ বলে উল্লেখ করেছেন। সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের ওপর থাকাকে হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভক্তি ও মতভেদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে আরো অনেক নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে। এক হাদীসে উতবা ইবনু গাযওয়ান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرُ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ، قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ مِنْكُمْ۔

"তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের ওপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি তোমাদের এ পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীহগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, " না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।"[১৩৯]

---

[১৩৯] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৪; তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর ১০/১৮২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৮২; আলবানী, সাহীহাহ ১/৮৯২-৮৯৩।

৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত

'আহলুস সুন্নাত'-এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নব্বীতে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সুন্নাত' বলতে কী বুঝানো হয় তা জানতে হবে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকুই বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নি তা না করাই সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন : "…. রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন : তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন : কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। … এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এ তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনো 'কর্ম' অনুসরণ পরিত্যাগ করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)- ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সিয়াম পালন করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তাঁর অনুসরণে নফল সিয়াম পালন করতেন। কেবলমাত্র পদ্ধতিগত সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো, তিনি এ দুটি নেক কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেয়ে বেশি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় বর্জন করতেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ তা করতেন। মূল কর্ম সুন্নাত-সম্মত নেককর্ম হওয়া সত্ত্বেও কর্মের পাশাপাশি বর্জনের ক্ষেত্রে বা পালনে ও বর্জনে হুবহু অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ﷺ-এর কর্মে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিন জন সাহাবী ইবাদতের আবেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন : "তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝে মাঝে নফল

রোযা রাখি, আবার মাঝে মাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

এ হাদীসেও এ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেন।

তাবিয়ী আবূ ওয়ায়িল বলেন, আমি পবিত্র কাবাগৃহের খিদমত ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী শাইবা ইবনু উসমান (রা)-এর নিকট বসেছিলাম। তিনি বলেন,

جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَ لاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لَمْ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.

"তুমি যেখানে বসেছ, উমার (রা) তথায় বসে বললেন :'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কাবাঘরের মধ্যে যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত যত স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে তা কোনো কিছুই আমি রাখব না, বরং তা সবই আমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেব।' আমি বললাম, 'আপনি তা করতে পারেন না।' তিনি বললেন : 'কেন?' আমি বললাম, 'কারণ আপনার সঙ্গীদ্বয় (রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাকর ﷺ তা করেন নি।' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, তাঁরাই সে দুই মানুষ যাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।"[১৪০]

এখানে উমার (রা) অনুসরণ-অনুকরণ করা বলতে 'না-করা'- বা 'বর্জন করা'-এর অনুসরণ অনুকরণ করা বুঝাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গীদ্বয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্র (রা) কিছুই করেন নি। কাবাঘরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মানুষেল দান, মানত ইত্যাদির স্বর্ণ-রৌপ্য সংরক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলির বিষয়ে কিছুই করেন নি। যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছেন। তিনি এগুলি বণ্টন কনের নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। এ বিষয়ে তিনি কোনো কিছু করা থেকে বিরত থেকেছেন। আবূ বাকর (রা) ও একইভাবে চলে গিয়েছেন। উমার (রা)-এর অধিকার ছিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। তিনি এ বিষয়ে কিছু করার

[১৪০] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৪৫৬।

চেয়ে কোনো কিছু করা বর্জন করে তাঁদের 'অনুসরণ' বা ইত্তিবা ও ইকতিদা করা উত্তম বলে মনে করেছেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কর্ম এবং বর্জন উভয়ই সুন্নাত। কর্মের ক্ষেত্রে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুবহু অনুকরণ করা সুন্নাত, তেমনি বর্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুকরণ করাই সুন্নাত। এমনকি যে বিষয়ে তিনি কোনো আপত্তি বা নিষেধ করেন নি, শুধু বর্জন করেছেন সে বিষয়েও অনুকরণ বলতে বর্জন করাই বুঝায়। তিনি যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা করা অবৈধ নাও হতে পারে, তবে তা করলে অনুকরণ করা হয় না।

তাবিয়ী নাফি' (রহ) বলেন :

إِنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا (إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا) أَنْ نَقُوْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

"এক ব্যক্তি ইবনু উমরের (রা) পাশে বসে হাঁচি দেয় এবং বলে : 'আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর সালাম)।' তখন ইবনু উমর (রা) বলেন, আমিও বলি : 'আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ', তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (হাঁচি দিলে) এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা হাঁচি দিলে বলব; "আলহামদু লিল্লাহ আলা কুলি হাল (সকল অবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)।"[১৪১]

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো সালাত ও সালাম পড়তেন। সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাহাবী ইবনু উমর কেন হাঁচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না? তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ? তাহলে কি হাঁচির পরে

---

[১৪১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৮১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ৪/২৬৫-২৬৬। হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

দরুদ বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ? তা কখনোই নয়। এখানে ইবনু উমার (রা) সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ বা কর্ম ও বর্জনে হুবহু অনুসরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আল্লাহর হামদ পাঠ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর সালাম পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিন সর্বদা তা পালন করবেন। তবে হাঁচির দু'আ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম পাঠ শেখান নি। তিনি এ সময়ে সালাম পাঠ বর্জন করেছেন। কাজেই এ দু'আর মধ্যে তা বর্জন করাই সুন্নাত।

তাবিয়ী মুজাহিদ (রা) বলেন : আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি যোহর বা আসরের সালাতের জন্য ডাকাডাকি করল। তখন তিনি বললেন :

اَخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.

"এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ'আত।" [১৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সালাতের জন্য শুধু আযান প্রদান করা হতো। এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন। পরবর্তী কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা সালাতে আসতে অবহেলা করছে। তখন অনেক আগ্রহী মুয়াজ্জিন আযানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন। আযানের পরে ডাকাডাকি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন নি। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। হয়ত অনেক যুক্তি দিয়ে বলা যেত, তিনি অমুক কারণে তা বর্জন করেছেন, বর্তমানে অমুক কারণে তা করা প্রয়োজন। কিন্তু সাহাবীগণ এ সকল যুক্তির ভিতরে না যেয়ে কর্ম ও বর্জনে তাঁর হুবহু অনুকরণ পছন্দ করতেন এবং অতিরিক্ত কর্মকে বিদ'আত বলে ঘৃণা করতেন। সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাসূলে আকরাম ﷺ -এর রীতি। তাঁর বাইরে তাঁরা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْأُمُوْرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْبِدَعَ. وَإِنَّ مِنَ الْبِدَاعِ الْاِعْتِكَافَ فِيْ الْمَسَاجِدِ الَّتِيْ فِي الدُّوْرِ.

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত। আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে সালাতের স্থান বা ঘরোয়া মসজিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা।[১৪৩]

---

[১৪২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৪৮।

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ী বা মহল্লার ঘরোয়া মসজিদে ইতিকাফ নিষেধ করেন নি। এর স্বপক্ষে অনেক কথা বলা যায়। তবে তিনি তা বর্জন করেছেন। এজন্য সাহাবী তা বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন।

৫. হুবহু অনুকরণ

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাও সুন্নাত। আর 'কর্ম' ও 'বর্জন' হুবহু ও অবিকল হলেই তা সুন্নাত হবে, সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করে পালন বা বর্জন করলে তা ইত্তিবায়ে সুন্নাত বলে গণ্য হবে না। এভাবে আল্লামা ইবনু সীরীনেরই একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ ১৮১হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন :

دَخَلَ الصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ عَلىٰ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَإِزَارُ صُوْفٍ وَعِمَامَةُ صُوْفٍ (فَنَظَرَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ نَظْرَةَ كَرَاهَةٍ) فَاشْمَأَزَّ عَنْهُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَقُوْلُوْنَ قَدْ لَبِسَهُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَقَدْ حَدَّثَنِيْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ لَبِسَ الْكَتَّانَ وَالصُّوْفَ وَالْقُطْنَ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

"সাল্‌ত ইবনু রাশিদ নামক একজন্য তাবি-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুব্বা, পশমী ইযার ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের নিকট প্রবেশ করেন। ইবনু সিরীন তাঁর পোশাক দেখে বিরক্ত হন। তিনি বিরক্তির সাথে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন: কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা বলেন যে, ঈসা (আ) পশমি পোশাক পরিধান করতেন। অথচ যাদের বর্ণনা আমি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করি সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতান, পশমি ও সুতি কাপড় পরিধান করেছেন। আর আমাদের নবীর সুন্নাত অনুকরণ করাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় ও বেশি উচিত।"[১৪৪]

---

[১৪৩] সূযূতী, আল-আমরু বিল ইত্তিবা, ১৭ পৃঃ।

[১৪৪] ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ ৬৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল, মা'আদ ১/১৩৭; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/১১০। বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

ইমাম ইবনু সিরীন দরবেশগণের 'সূফী' বা 'পশমি' পোশাক পরিধানের বিষয়ে আপত্তি করে বলছেন যে, ঈসা নবীর সুন্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। আবার তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমি পোশাক পরিধান করতেন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, এ সকল দরবেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই অনুসরণ করছেন। তাহলে তাঁর আপত্তিটা কি?

আপত্তি অনুকরণের 'হুবহুত্বে'। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামাগ্রিক কর্ম ও বর্জনের সমষ্টিই তাঁর সুন্নাত। তিনি যে কাজ যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন সে কাজ ততটুকুই করা ও বর্জন করাই সুন্নাত। কর্মে, বর্জনে বা গুরুত্বে তাঁর কাজের বিপরীত করার অর্থ তাঁর সুন্নাত বর্জন করা ও সুন্নাতের বিরোধিতা করা। ইবনু সিরীন এ কথাই বলেছেন।

তাঁর কথার অর্থ, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতি পোশাক পরিধান বর্জন করে পশমি পরিধান উত্তম। এজন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় সুতি পরিধান থেকে বিরত থাকেন এবং এ বর্জনকে তাকওয়া, দরবেশি বা বুজুর্গির পথ বলে মনে করেন। অথচ আমাদের নবীর সুন্নাত ছিল সুবিধা ও সুযোগমত সুতি বা পশমি পোশাক ব্যবহার করা। সুযোগ থাকলেও সুতি পোশাক বর্জন করে পশমি ব্যবহারের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত বর্জন করা এবং তাঁর সুন্নাতকে দরবেশির জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করা। এজন্যই ইবনু সিরীন বলছেন যে, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম ও উচিত। আর তাঁর সুন্নাত সর্বদা পশমি পোশাক না পরা।

প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোযা (৮৩ হি) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে বলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। তখন তাবিয়ী-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ ফকীহ আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি), যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেন :

قَاتَلَهُ اللّٰهُ! بِالْبِدَعِ.

"আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"[১৪৫]

সালাতের সালাম ফেরানো পরে এরূপ যিক্‌র, তাসবীহ ইত্যাদি সুন্নাত সম্মত ইবাদত। এ ব্যক্তি সুন্নাত সম্মত যিকরের বাক্য সুন্নাত সম্মত সময়ে পাঠ করে একটি সুন্নাত সম্মত ইবাদত পালন করেছেন। শুধু উচ্চস্বরে তা পালন করে

ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/২৭০।

যিকটি পালনের পদ্ধতিতে সামান্য ব্যতিক্রম করেছে। এরূপ ব্যতিক্রমও তাঁরা গ্রহণ করতেন না। বরং একে বিদ'আত বলে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন।

সাহাবীগণই মূল জামা'আত

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে কখনোই ইফতিরাক-এর পর্যায়ে যায় নি। তাঁদের ইখতিলাফ বা মতভেদ ছিল মূলত ব্যবহারিক। ও ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ নিষ্পত্তি হয়েছে। আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা 'ইফতিরাক' পর্যায়ে যায় নি। এক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত: অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও তাঁর বিরোধিতায় আয়েশা (রা), মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীর রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্দে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা আলী (রা) -এর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতেন। তবে মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশ নেন নি। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শাবী (১০৪ হি) বলেন, জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪ জন ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেন নি: আলী, আম্মার, তালহা এবং যুবাইর #।"[১৪৬]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, "যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশগ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।"[১৪৭]

দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যারা এরূপ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা সর্বদা একে রাষ্ট্রীয় ও ইজাতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে পৃথক 'দল' বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেন নি। এ বিষয়ে আলী (রা), আম্মার (রা) প্রমুখ সাহাবীর সুস্পষ্ট মতামত বিভিন্ন গ্রন্তে সংকলিত রয়েছে। সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্মার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দ্বীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।"[১৪৮]

---

[১৪৬] আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাত ২/৪৬৬।

[১৪৭] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।

[১৪৮] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস সালাত ২/৫৪৪-৫৪৬।

এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আলী (রা) ও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ # এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি। ১৪৯

এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তি বা ইফতিরাকের পর্যায়ে যায় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ # হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাবিয়ীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর 'জামা'আত' বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থ 'সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসারীগণ'। সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ # এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদ্বীন ও সুন্নাতু সাহাবাহ এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'আল-জামা'আত' বলতে মূলত সাহাবাগণের মত ও পথ বুঝানো হয় এবং পরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবিয়ীগণের মতামত বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের ওপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি

ক. ইফাতিরাক ও বিভক্তির বিষয়াদি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূলনীতি বুঝতে হলে আমাদেরকে আহলূল বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাকের আকীদার মূলনীতি জানা দরকার। কারণ বিদ'আতীদের বিদ'আতের বিপরীতেরই তাঁরা সুন্নাত-সম্মত আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। উপরের বক্তব্য ও পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি হয় নি বা বিভক্তি মেনে নেওয়া হয়নি এবং কিছু বিষয়ে বিভক্তি হয়েছে।

---

[১৪৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান/৩৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ,. ৪৭-৫৬।

(১) আকীদার উৎস: এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তি, দর্শন, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে আকীদার উৎসর ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নিকট দর্শন, যুক্তি ইত্যাদিই আকীদার মুল ভিত্তিতে পরিণত হয়। শায়ী সম্প্রদায়ের নিকট ইমামগণ বা ইমামগণের প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যায় আকীদার মূল উৎসরূপে স্বীকৃত। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও কাশফ, ইলহাম, ইলকা বা 'সরাসরি বিশেষ জ্ঞানকে তারা আকীদার উৎসরূপে গ্রহণ করে। এ সকল ফিরকার অনুসারীদের নিকট মূলত এ সকল অতিরিক্ত বিষয়ই আকীদার মূল উৎস হিসেবে পরিণত হয়। এগুলির ভিত্তিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য গ্রহণ করে বা ব্যাখ্যা করে বর্জন করে।

(২) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ : এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মতভেদ নেই। কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে বা রুবুবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার বা অবিশ্বাস করলে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাত। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ হয় নি। কেউ আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদ অস্বীকার করলে বা এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে কাফির বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়েছে। তাকে আর বিভ্রান্ত মুসলিম ফিরকা বলে গণ্য করা হয়নি, বরং অমুসলিম কাফির ফিরকা বলে গণ্য করা হয়েছে।

(৪) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। মূলত মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভক্তি ও ফিরকাবাজি এ বিষয়টি নিয়েই। আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেযামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শাস্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কাদরিয়া, জাবরিয়া, খারিজী, মু'তাযিলি, জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি সকল ফিরকার উদ্ভব। তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ বিষয় কেন্দ্রিক।

(৫) রিসালাতে বিশ্বাস। এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে। কোনো কোনো সীমালঙ্ঘনকারী শিয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নুবুওয়াতের সর্বজনীনতা, তাঁর আদর্শের অলঙ্ঘনীয়তা, তাঁর খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে শিয়া মতবাদের মধ্যে রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ভালবাসার দাবি যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে যাদের বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে এবং যারা আনুগত্যে-অনুকরণে অগ্রগামী তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। শিয়াগণ এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়। সাধারণভাবে ওলীগণের

বিষয়ে এবং বিশেষত আলী-বংশের ইমামগণের বিষয়ে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করে তারা তাদেরকে রিসালাতের কিছু মর্যাদা দিয়েছে এবং এভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করেছে। শীয়া মতবাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে 'ইমাম' হিসেবে অথবা ইমামগণের 'খলীফা' হিসেবে অনেক মানুষের ইসমাত বা নিষ্পাপত্ব ও অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকার কল্পনা করা হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রদত্ত কুরআন ও সুন্নাতের গুরুত্ব মূলত বিনষ্ট হয়েছে। এ বিশ্বাস অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর অবস্থা মূলত তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য গ্রন্থের মত হয়ে যায়। অর্থাৎ কাশফ, ইলহাম বা 'ইলমু লাদুন্নী'-র ভিত্তিতে দেওয়া ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে সব কিছু বাতিল বলে গণ্য হবে। মু'তাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু মুজিযা অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করেছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ ও নবীবংশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। আমরা দেখছি যে, শীয়াগণের এ বিভ্রান্তি মূলত আকীদার উৎস কেন্দ্রিক।

(৬) মালাইকা ও গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয় নি। তবে গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি দিক আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে বলে আমরা দেখেছি ও দেখব।

(৭) আখিরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফা'আত ও জান্নাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়। এগুলির মধ্যে শাফা'আত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক মতভেদ।

(৮) তাকদীরের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফা'আত ও জান্নাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়। এগুলির মধ্যে শাফা'আত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক মতভেদ।

(৯) পাপী মুমিনের বিধান বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহর ক্ষমা, ক্ষমতা, দয়া,

প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নেয়।

(১০) রাষ্ট্র ও মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ে বিভক্তি ঘটেছে। পাপী মুমিনের বিধান বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত এ বিষয়ক বিভক্তি জন্ম নেয়।

খ. আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি

আহলুস সুন্নাতের নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের মূলনীতি, তা হলো সুন্নাত ও জামা'আত। আকীদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা, আল-জামা'আত বা সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের অনুসরণ করা ও উম্মাতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা। এ বিষয় দুটি আমরা ওপরে তার কিছু ব্যাখ্যা করেছি। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে মতভেদীয় বিষয়গুলিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি

উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের উৎস। বিদ'আতী ফিরকাগুলি কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে নি। তারা কুরআন সুন্নাহ আকীদার উৎস বলে স্বীকার করে। তবে আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মূল ভিত্তি। কেউ আকল, যুক্তি বা দর্শনের নামে এবং কেউ নবী-বংশের ইমামগণ, ওলীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণের কাশফ, ইলকা, ইলহাম, ইলম লাদুন্নী, মতামত বা ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনাকে নিজেদের মর্জিমত গ্রহণ করেছে বা ব্যাখ্যা করে পরিত্যাগ করেছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সকল নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কুরান-সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা,

বিশ্লেষণ, গুঢ়অর্থ নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অন্তর্ভূক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী লিখেছেন :

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَكْرَهُ الْجَدَلَ عَلىٰ سَبِيْلِ الْحَقِّ، حَتّٰى رُوِىَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فِىْ أَيْدِيْهِمْ رَجُلَانِ، فَقَالُوْا : إِنَّ أَحَدَ هٰذَيْنِ يَقُوْلُ : اَلْقُرْاٰنُ مَخْلُوْقٌ، وَهٰذَا يُنَازِعُهُ وَيَقُوْلُ : هُوَ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ ـ قَالَ : لَا تُصَلُّوْا خَلْفَهُمَا، فَقُلْتُ : أَمَا اَلْاَوَّلُ فَنَعَمْ، فَأَنَّهُ لَا يَقُوْلُ بِقِدَمِ الْقُرْاٰنِ ـ وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَمَا بَالُهُ لَا يُصَلّٰى خَلْفَهُ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمَا يَتَنَازَعَانِ فِى الدِّيْنِ، وَالْمُنَازَعَةُ فِى الدِّيْنِ بِدْعَةٌ ـ

"আবূ হানীফা (রহ) সত্যের পথেও বিবাদ-বিতর্ক অপছন্দ করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবূ হানীফার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ দুব্যক্তিকে নিয়ে তথায় আগমন করে বলেন : এ দুজনের একজন বলছে, কুরআন সৃষ্ট এবং অন্য ব্যক্তি তার সাথে বিতর্ক করছে ও বলছে, কুরআন সৃষ্ট নয়। তিনি বলেন: এদের উভয়ের কারো পিছনে সালাত আদায় করবেন না। আমি বললাম, প্রথম ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করব না একথা ঠিক, কারণ সে কুরআনের অনাদিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা হবে না কেন? তিনি বলেন, কারণ তারা দ্বীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক করছে আর দ্বীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক বিদ'আত।"[১৫০]

ইমাম তাহাবী বলেন :

وَلَا نَخُوْضُ فِى اللّٰهِ ـ وَلَا نُمَارِىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَلَا نُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ ـ

[১৫০] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৭।

"আমরা আল্লাহর বিষয়ে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইনা। আমরা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হইনা।" [১৫১]

ইমাম তাহাবী বলেন,

وَجَمِيْعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

"শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য।[১৫২]

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন: "প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকার মূলনীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদ'আতের মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা 'আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল' ও 'যুক্তি' বলে কল্পনা করে তার মানদণ্ডে বিচার করে। যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'র সাথে মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে 'মুহকাম' বা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আর কুরআন- হাদীসের যে বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'-র সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রত্যাখ্যানকে তারা 'তাফবীয' বা অর্থ-বিচার আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া বলে আখ্যায়িত করে। অথবা তারা এরূপ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা 'ব্যাখ্যা' বলে আখ্যায়িত করে। এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কঠিনভাবে তাদের এসকল কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। আহলুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনোভাবেই তারা সহীহ 'নাস্স' অর্থাৎ কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না। কুরআন বা সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় কোনো 'আকলী দলীল' বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তারা পেশ করেন না। ইমাম তাহাবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।"[১৫৩]

আকীদার উৎস বিষয়ক মূলনীতি আহলুস সুন্নাতের সকল আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে।

---

[১৫১] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৩।

[১৫২] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ পৃ. ১৪।

[১৫৩] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

২. আল্লাহ্র নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা। আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা করা পরিহার করা এবং সাথেসাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করা বর্জন করা। যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। আবার পাশাপাশি মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কথোপকথন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের ওপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুজাস্সিমা বা মুশাব্বিহা ফিরকা আল্লাহর এ সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। পক্ষান্তরে মু'তাজিলা, জাহমী, কাদারী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকা মহান আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে মহান আল্লাহর অন্যান্য সকল বিশেষণ ও কর্ম অস্বীকার করেছে। তারা বলে, মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল আরশে সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষণ বা কর্মে বিশেষিত করার অর্থই হলো তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কারণ সৃষ্টি শ্রবণ করে, কথা বলে, সমাসীন হয়, সৃষ্টির হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে...। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহ এ সকল বিশেষণের অধিকারী। বরং তিনি এ সকল বিশেষণ থেকে পবিত্র। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত এ সকল বিশেষণকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন তাঁর হস্ত তাঁর ক্ষমতা বা করুণা, আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার অর্থ আধিপত্য লাভ করা। ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করা, ইত্যাদি।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে ওহীর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। তারা সকল সিফাত বা বিশেষণ তার প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করেন এবং বিশেষণের ধরণ ও প্রকৃতির বিষয় মহান আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন। সাথে সাথে তাঁরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, তাঁর এ সকল সিফাত বা বিশেষণ কোনোভাবেই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয়। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

لَا يَشْبَهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ، لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ. أَمَّ الذَّاتِيَةُ فَالْحَيَاةُ الذَّاتِيَةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ الْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ، وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ. لَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَزَالْ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ صِفَةٌ وَلَا اِسْمٌ ...... وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ. يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا، وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا، وَيَرٰى لَا كَرُؤْيَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا، وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا ...... وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ مَنْ ذَكَرَ الْوَجْهَ وَالْيَدَ وَالنَّفْسَ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ : إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ: لِأَنَّ فِيهِ اِبْطَالُ الصِّفَةِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ، وَلٰكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالٰى بِلَا كَيْفٍ.

"তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নয়। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্ত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফি'লী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ-সহ। তাঁর যাতী বা সত্ত্বাগত সিফাতসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা) সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফি'লী বা কর্মবাচক সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিয্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ তিনি অনাদি-অনন্তরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। ... তাঁর সকল বিশেষণই মাখলূকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিপরীত বা ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি

ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথা বলার মত নয়। তিনি শুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। ... তাঁর ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তার বিশেষণ কোনোরূপ 'স্বরূপ', কিরূপ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মানুষদের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ (সিফাত), কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ (সিফাত), আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই কোনোরূপ কিরূপ, কিভাবে বা কেমন করে প্রশ্ন করা ছাড়াই।[১৫৪]

মোল্লা আলী কারী বলেন :

وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ الْوَصِيَّةِ : نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ لَمَا قَدَرَ عَلَى إِيْجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوْقِ، وَلَوْ صَارَ مُحْتَاجًا إِلَى الْجُلُوْسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ إِيْنَ كَانَ اللهُ تَعَالَى؟ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. اِنْتَهٰى.

وَنِعْمَ مَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ الْاِسْتِوَاءِ، فَقَالَ : اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ.

---

[১৫৪] ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (মুহাম্মদ খামীসের শারহ সহ), পৃ. ২১-৩৭।

"ইমাম আ'যম (রহ) তাঁর 'ওসীয়াত' নামক পুস্তকে বলেছেন : "আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের ওপর সমাসীন, আরশের প্রতি তাঁর কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে। তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, বরং তিনি মাখলূকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন। আর যদি তার আরশের উপরে উপবেশন করার বা স্থির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।"

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন। তাঁকে আল্লাহর আরশের উপরে সমাসীন হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "সমাসীন হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী।"[১৫৫]

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন,

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ، الأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ الأَدَوَاتِ، لاَ تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ .. وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ . وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُوْنَهُ . مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلْقَهُ.

"আল্লাহ্ সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য। প্রতিটি বস্তু তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর উর্ধে। সৃষ্টিজগত তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না।"[১৫৬]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইফতিরাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতভেদীয় বিষয়ই মহান আল্লাহর তাওহীদুল আসমা ও সিফাত বিষয়ক। আর এ জাতীয় সকল বিষয়েই তাঁরা এ মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

---

[১৫৫] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৭০।

১১. আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১০,১৩।

৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে কোনো ব্যক্তির নিষ্পাপত্ব, অভ্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তারা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য 'কারামত' বা মর্যাদা ও নিয়ামত বলে গণ্য করেন। কিন্তু এগুলিকে আকীদার উৎস হিসেবে বা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। আলিম বা বুজুর্গ ব্যক্তি যতই বড় হোন, তিনি কখনোই ইসমাত বা অভ্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রহ) বলেন :

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মত গ্রহণ করা হয় এবং কিছু মত বাদ দেওয়া হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম এ কবরে যিনি শায়িত আছেন তিনিই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ।[১৫৭]

এভাবে আহলূস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করেই সকল কথা গ্রহণ করতে হবে। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাত বিচার করা যায় না, বরং কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে প্রত্যেকের কথা যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। অমুক বলেছেন কাজেই তা দ্বীনের প্রমাণ বা আকীদার দলীল এরূপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী ইমাম আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসঊদ ইবনু উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ"-তে লিখেছেন :

اَلْإِلْهَامُ الْمُفَسَّرُ بِإِلْقَاءِ مَعْنًى فِي الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ.

---

১৫৭ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালাহ ৮/৯৩।

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[১৫৮]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং নেককার মানুষদের ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নেককার মানুষদেরকে ভালোবাসেন কিন্তু ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না। তাঁরা সকল মুমিনকে আল্লাহর ওলী বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য যত বেশি সে তত বেশি কামিল ওলী বলে বিশ্বাস করেন। তবে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কাউকে সুনিশ্চিত 'ওলী' বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না। বরং তাদের বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের জান্নাতের আশা করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُو النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ الْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى أَجْمَعِيْنَ، عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ. نَتَوَلاَّهُمْ جَمِيْعًا وَلاَ نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বাকর সিদ্দীক, তাঁর পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তাঁর পরে যুন্নুরাইন উসমান ইবনু আফ্ফান, তাঁর পরে আলী ইবনু আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁরা আজীবন আল্লাহর ইবাদতে থেকেছেন এবং সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। আমরা সকলকেই ভালোবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।"[১৫৯]

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রহ) বলেন:

---

[১৫৮] সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী, শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ, পৃ: ২২।

[১৫৯] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ, ১০৯-১১৬।

نُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ وَلاَ نُفْرِطُ فِيْ حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ. وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. وَلاَ نَذْكُرُهُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ .... وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ .... وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَاتِهِ الْمُقَدَّسِيْنَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِيْنَ. وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ. أَهْلِ الْخَيْرِ الْأَثَرِ. وَاَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظْرِ. لاَ يَذْكُرُوْنَ إِلاَّ بِالْجَمِيْلِ. وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُوَ عَلَى السَّبِيْلِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে ভালোবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। ... রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ায় সুসংবাদ দান করেছেন আমরা তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। ... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পুত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নেফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের সালফে সালেহীন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবর্তীকালের আলেমগণ যারা হলেন কল্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্ম জ্ঞানে পারদর্শী চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।"[১৬০]

---

[১৬০] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৮-১৯।

কারামাতুল আউলিয়া প্রসঙ্গে উম্মাতের ওলীগণের পরিচয়ে ইমাম তাহাবী বলেছেন: "সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত।" আমরা আরো দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও মা'রিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান, কাজেই বেলায়াতের কমবেশি তাকওয়া ও আনুগত্য অনুসরণের ভিত্তিতেই হয়, কোনো ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক, বংশ, ইত্যাদির কারণে নয়।

মুমিনদের বিষয়ে ও ওলীগণের বিষয়ে এ হলো আহলুস সুন্নাতের সাধারণ আকীদা। শীয়া বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মত তাঁরা ওলীগণের মর্যাদা বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে পুঁজি করে নির্দিষ্ট কাউকে ওলী বলে নিশ্চিত করেন না বা তাকে অভ্রান্ত বলে দাবি করে তার মতামতকে কুরআন বা হাদীসের একমাত্র ব্যাখ্যা বা আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র কুরআন বা হাদীসে যাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাঁদেরকেই জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেন। আর তাঁদের জান্নাত ও বিলায়াতের সাক্ষ্যকে তাঁরা অভ্রান্ততার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেন না। বরং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কাউকে মা'সূম বা নিষ্পাপ, নির্ভুল বা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন না। ইমাম তাহাবী বলেন:

وَنَرْجُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيْئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ. وَلَا نُقَنِّطُهُمْ.

"নেককার বা ইহসান অর্জনকারী মুমিনদের বিষয়ে আমরা আশা পোষণ করি যে, মহান আল্লাহ দয়া করে তাদের ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত প্রদান করবেন, তবে আমরা তাদের বিষয়ে নিশ্চিত নিরাপত্তা অনুভব করি না এবং তাদের জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি না। আর আমরা পাপী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতি অনুভব করি। তবে তাদেরকে নিরাশ করি না।"[১৬১]

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "বিষয়টি যেহেতু এরূপ সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া

---

[১৬১] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৪।

উম্মাতের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে তাকে জান্নাতী বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, বরং আমরা নেককার বা ইহ্সানের পর্যায়ে পৌঁছানো মুমিনদের জন্য আশাবোধ করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতিও বোধ করি।"[১৬২]

ইমাম তাহাবী অন্যত্র বলেন:

وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا.

"আমরা মুমিনদের কাউকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ করাই না।"[১৬৩]

এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "ইমাম তাহাবী বলছেন যে, আমরা আহলূ কিবলার মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ যার বিষয়ে জান্নাতী বলে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকেই আমরা জান্নাতী বলি, যেমন আশারায়ে মুবাশ্শারা। আমরা যদিও বলি যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিনদের যাকে চান আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এবং এরপর শাফা'আতকারীদের শাফা'আতে তাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন, তবে আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিষয়ে নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি। ওহীর জ্ঞান ছাড়া আমরা তার জান্নাতের সাক্ষ্য দেই না, জাহান্নামের সাক্ষ্যও দেই না। কারণ প্রকৃত বিষয় তো গুপ্ত রয়েছে। কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তার কি অবস্থা ছিল তা আমরা কেউ জানি না। তবে আমরা নেককার বা ইহ্সান অর্জনকারীদের সম্পর্কে ভাল আশা করি এবং পাপীদের বিষয়ে ভয় পোষণ করি।"[১৬৪]

৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি

পাপী মুসলিমের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদেরকে সুনিশ্চিত জাহান্নামী বা জান্নাতী বলেন নি। বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তি পূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন।

৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মূলনীতি

ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা: শীয়া ও খারিজী ফিরকার উদ্ভব ও উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের

---

[১৬২] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩২৫-৩৩০।

[১৬৩] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৫-১৬।

[১৬৪] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৮।

বিভক্তি ঘটে। বিশেষত খারিজীগণ এ বিষয়ে দুটি আকীদার উদ্ভাবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির ইমামতের অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা। তাদের দাবি ছিল যে, পাপী ব্যক্তি কাফির, আর কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না। বরং মুমিনের জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অংশ হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে একে অপসারণ করবে।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে নিপতিত হয়। পাপী শাসক-প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমনি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নষ্ট বা বিদ্রোহ করা যাবে না। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (وَفِيْ لَفْظٍ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ) شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের) বাইরে, দ্বিতীয় বর্ণনায়: রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল।"[১৬৫]

উম্মু সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا.

---

[১৬৫] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬১২; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১৪৭৭।

"অচিরেই তোমাদের ওপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১৬৬]

আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

"তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হয় এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[১৬৭]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন :

وَالصَّلاَةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ.

"এবং সকর নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ।"[১৬৮]

وَنَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ .... وَلاَ نَرَى الْخُرُوْجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاَةِ أُمُوْرِنَا وَإِنْ جَارُوْا. وَلاَ نَدْعُوْ عَلَيْهِمْ وَلاَ نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيْضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوْا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُوْ لَهُمْ بِالصَّلاَحِ وَالْمُعَافَاةِ .... وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ. وَنَبْغَضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ .... وَالْحَجّ

---

[১৬৬] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮০, ১৪৮১।
[১৬৭] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮২।
[১৬৮] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১২৩।

وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَلاَ يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلاَ يَنْقُضُهَا.

"আমরা কিবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত কায়েম করা ... বৈধ মনে করি। ... আমাদের ইমাম বা শাসকবর্গ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি। আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্বান- আমানত আদায়কারী শাসকদের ভালবাসি এবং জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি। মুসলিম শাসকের অধীনে-সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না।"[১৬৯]

৬. ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূলনীতি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি 'ঐক্য ও সংহতি'। বিভ্রান্ত দলগুলির সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, আকীদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণের আভ্যন্তরীণ মতভেদ সীমিত এবং ব্যাখ্যা বা পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলির আকীদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুবই বেশি। মানবীয় বুদ্ধি, আকল, যুক্তি ইত্যাদির মতপার্থক্যই স্বাভাবিক। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে কাউকে 'মা'সূম' "অভ্রান্ত' বা কারো মতকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করলেও এরূপ অভ্রান্তদের একজনের মতের সাথে অন্যজনের মতের মিল হয় না। আর এ সকল বিষয় যেহেতু তাদের মতে আকীদার মূল সেহেতু তারা একে অপরকে কাফির বা বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ সকল মুমিনকে যথাসম্ভব মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। এমনকি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত

---

[১৬৯]আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৫-১৬।

ফিরকাগুলিকেও তাঁরা কাফির বলে গণ্য না করে বিভ্রান্ত মুমিন বলেন গণ্য করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলি একমাত্র নিজেদেরকে ছাড়া অন্য সকলকেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি কুরআন বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলেছে বা বিশ্বাস পোষণ করেছে তার কথার ওযর খোঁজার চেষ্টা করা। আর আহলুল বিদ'আতের মূলনীতি হলো তাদের মতের বিরোধী ব্যক্তি যা বলেছে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী না হলেও তার মধ্যে বিরোধিতা সন্ধান করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বক্তব্যকে আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা এবং এরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকে কাফির বা বিভ্রান্ত বলা।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন, তবে এ দেখার অর্থ কোনো মাখলুকের দেখার মত নয়, সৃষ্টির সাথে সকল তুলনার উর্দ্ধে এ দর্শনের প্রকৃতি মহান আল্লাহই ভাল জানেন। এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো বক্তব্যেরই সরাসরি বিপরীত নয়। তবে মুতাযিলা ও সমমনা ফিরকাগুলি আহলুস সুন্নাতের এ আকীদাকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন 'কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়'। আহলুস সুন্নাতের আকীদা এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ আল্লাহকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। কাজেই কুরআন অস্বীকার করার কারণে 'আহলুস সুন্নাত' কাফির!!

পক্ষান্তরে মুতাযিলীদের আকীদা সুস্পষ্টভাবেই কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ মু'তাযিলীদের এ আকীদার কঠিন প্রতিবাদ করলেও এজন্য তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি; কারণ তারা সরাসরি আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করে না, বরং ব্যাখ্যা করে।

শীয়াগণ নবী-বংশের ভালবাসার নামে সাহাবীগণকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে গণ্য করে। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের অনেক আয়াত ও অগণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তা সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ তাদের এ বিশ্বাসের যথাসাধ্য ওজর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ সাহাবীগণকে ও নবীবংশকে সমানভাবে ভালবাসেন। তাদের এ আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তা

সত্ত্বেও শীয়াগণ প্রায়শ তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন এ যুক্তিতে যে তাঁরা নবী-বংশকে ভালবাসেন না।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী বলেন :

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفِرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا۔

"আমরা দলাদলিমুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে বিভ্রান্তি ও শাস্তি মনে করি।" [১৭০]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: "মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলু কিতাব বা ইহূদী-নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে, শুধু তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে ছাড়া।[১৭১] তাহলে আহলু কিবলার সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে? আহলু কিবলা তো অন্তত আহলু কিতাবের চেয়ে উত্তম। কাজেই তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তারা ছাড়া কারো সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করা যাবে না। এরূপ কেউ ভুল করলে বলা যাবে না যে, সে কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে বিধান প্রদান করেছেন তা সে পরিত্যাগ করেছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার পরে তার কুফরীর বিধান দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন।"[১৭২]

আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ

উপরে আমরা মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা দলাদলি ও ফিরকাবিভক্তির কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি জানতে পেরেছি। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলিম ও ইমামগণ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে এবং সঠিক আকীদা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট থাকেন। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার প্রসিদ্ধ ৪ মুজতাহিদ ইমাম বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

প্রথমত, আকীদার মূলনীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবূ হানীফার (রহ) তাঁর ফিকহুল আকবারে যে আকীদা লিখেছেন এবং ইমাম আবুহানীফা (রহ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) ও ইমাম

---

[১৭০] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৫১২।

[১৭১] সূরা (২৯) আনকাবূতের ৪৬ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

[১৭২] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩১৫।

মুহাম্মাদ (রহ)-এর আকীদা বর্ণনা করে ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (রহ) যা লিখেছেন তাই ৪ ইমামের আকীদ। আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু-একটি বিষয়ে খুটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া তাদের আকীদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, আহলূস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে তারা ছিলেন খড়গহস্ত। বিশেষত আকীদাগত বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকীদার বিষয় আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, ৪ ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ) আকীদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিক্হ-এর বিষয়ে নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তাঁর ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পারি। কিন্তু তিনি আকীদার বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

চতুর্থত, ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও ব্যাপক খিদমাত ও প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত' পুস্তিকাটি আহলূস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত ও পঠিত বই। এ পুস্তকের প্রথমে তিনি বলেন :

هٰذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلٰى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانَ بْنَ ثَابِتِ الْكُوْفِي. وَأَبِيْ يُوْسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيْ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ. وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَيَدِيْنُوْنَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

"এ হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার বর্ণনা, যা মিল্লাতের ফকীহগণ; ইমাম আবু হানীফা নু'মান আব্দুল্লাহ বিন সাবিত কূফী (১৫০ হি), আবু ইউসুফ ইয়াকুব আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহীম আল-আনসারী (১৮২ হি) ও আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি)-এর মাযহাবের ভিত্তিতে রচিত। তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন। তাঁরা দ্বীনের উসূল বা মূলনীতির বিষয়ে যে আকীদা পোষণ করতেন এবং যে নীতিতে তাঁরা রাব্বুল আ'লামীনের আনুগত্য করে গেলেন তারই অনুসরণে রচিত।"[১৭৩]

হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) রচিত 'শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ' পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।

পঞ্চমত, আকীদার বিষয়ে ৪ মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ আকীদার উৎসের বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য। আমরা দেখেছি যে, আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকীদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা আকীদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়্যগণের ইজমা বা জামা'আতকে মানদণ্ড হিসেবে হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শাব্দিক বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ছাড়া কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল উৎস এক এবং বহুমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যারা ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মতভেদ ব্যাপক এবং মতভেদের সমাধান অসম্ভব। কারণ উৎস বহুমুখি এবং সেগুলির একমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মানবীয় ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্যজনের অমিল হবেই। যুগ, দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তির কারণে এগুলি ভিন্নতা দেখ দেবেই। কাজেই আকীদার ক্ষেত্রেও বিভাজন, বিভক্তি ও দলাদলি অবশ্যম্ভাবী।

---

[১৭৩] আবূ জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ.৭।

ইজতিহাদ, বুদ্ধি, আকল বা কিয়াস-এর প্রয়োজন হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কারণ যুগের পরিবর্তনে কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ অনেক নতুন বিষয় মুসলিমের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সে বিষয়ে বিধান দিতে হয় ফিকহের ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয় তা নয়। কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ কোনো বিষয় মুসলিমের আকীদার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আকীদার সম্পর্ক গাইবী জগতের সাথে এবং আল্লাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদির সাথে। এসকল বিষয়ে কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল না। কিন্তু পরে মুমিনের আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে সংযোজিত না হলে তার আকীদার ত্রুটি হতে পারে এরূপ বাতুল চিন্তা কোনো মুসলিম করেন না। এ বিষয়ে ৫ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩হি) বলেন:

لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ فِيْ نَفْيِ الْقِيَاسِ فِي التَّوْحِيْدِ وَإِثْبَاتِهِ فِي الْأَحْكَامِ.

"সকল দেশের ফকীহগণ এবং আহলুস সুন্নাতের সকল ইমাম, যারা হাদীস ও ফিকহের ইমাম তাঁরা সকলেই একমত যে, ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস নিষিদ্ধ এবং ফিকহী আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য।"[১৭৪]

এভাবে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার মুসলিম উম্মাহ বা আহলূস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত যে, বিশ্বাসের একমাত্র উৎস ওহীর জ্ঞান এবং ওহীর জ্ঞান অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্য অর্থাৎ তাঁদের ইজমা বা জামা'আতের ওপর নির্ভর করতে হবে।

এজন্য ৪ ইমাম একমত যে, আকীদার উৎস মূলত দুটি : (১) কুরআন কারীম এবং (২) সহীহ হাদীস। আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ইজমা বা জামা'আত হলো তাঁদের মানদণ্ড। তাঁরা একমত যে, কুরআন-হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকীদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। এবং সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সকল বক্তব্য সঠিক

---

[১৭৪] ইবনু আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, পৃ. ৭৪।

অর্থে ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণ করার জন্য সমন্বয় মূলক কিছু কথা বলা যেতে পারে। এরূপ কথাও ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য এবং আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেওয়া হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপারে এবং বিশেষত গাইবী বিষয়ে ইজতিহাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং ওহীর কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ), ইমাম তাহাবী (রা) প্রমুখের বক্তব্য দেখেছি।

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নসীহত

আহলুস সুন্নাত ও আহলুল বিদ'আত বিষয়ে শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী রাহ (৪৭১-৫৬১ হি) তাঁর গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থে নিম্নরূপ নসীহত করেছেন: "সতর্ক ও জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর বাণী আর রাসূল ﷺ এর হাদীসসমূহের সাধারণ ও বাহ্যিক অর্থ অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমল অর্থাৎ কাজ করা ও অনুগত থাকা। এ ব্যাপারে নতুন কথা প্রচার করা, মনগড়া কোন কিছু বলা, কথা কমবেশী করা ও নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ব্যাখ্যা দেয়া নিতান্তই অনুচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, শরীআতে বিদ'আতের প্রচলন ও পথভ্রষ্টতার কোন অবকাশ না থাকে; কারণ এ পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে।....

সুন্নাত ও জামা'আত : মূলত প্রত্যেক মু'মিন লোকের ওপরে সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ ওয়াজিব। সুন্নাত বলতে সেই পথ বুঝায়, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ যে পথে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। আর জামা'আত বলতে চার খলিফা (র)-এর প্রদর্শিত পথ; তাদের খেলাফত কালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তবলী। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই ছিলেন সরল সঠিক পথের সন্ধানদাতা, এ কাজে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত; কারণ তাঁদের পথের সন্ধান দেয়া হয়েছিল, (আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন)।

আহলে বিদ'আত : ভাল হয় বিদ'আতী লোকজনের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া; তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া; তাদের সালাম না করা। আমাদের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, বিদ'আতকারীকে সালাম করলে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। কেননা রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, 'তোমরা

পরস্পর সালাম দেয়ার প্রথা চালু কর, যাতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় তোমাদের মধ্যে।'....

বিদ'আতীদের চিহ্ন ও পরিচয় : কতিপয় চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দ্বারা আহলে বিদ'আতী মানুষকে চেনা সহজ বিদ'আতী মানুষ হাদিসকে অবজ্ঞা করে। বিদ'আতী জেন্দিক গোত্র আহলূস সুন্নাহ অথাৎ হাদীস অনুসারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়। ক্বাদরিয়া ফেরকা আখ্যা দেয় মুজাব্বিরাহ। হাদিস অনুসারীদের মুশাব্বিহাহ বলে জাহমিয়্যাহ গোত্র আর রাফেজিরা বলে নাসেবাহ। এ ধনের অবজ্ঞা-সূচক নামকরণের কারণ হল, ঐ সকল বিদ'আতী দল হাদীস অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে থাকে। মূলত আহলে সুন্নাত তথা হাদিস অনুগামী ব্যক্তিদের পরিচয় একটা মাত্র নামেই, তা হল, আহলুস সুন্নাহ। এ ছাড়া অন্য নামে তারা আখ্যায়িত নন। বস্তুত বিদ'আতী মানুষ নিজেদের জন্য যে উপাধী (আহলে সুন্নাত) গ্রহণ করে থাকে তা ভিত্তিহীন, কেননা তাদের জীবন এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।...

মুক্তিপ্রাপ্ত দল : উল্লেখিত তেহাত্তর শ্রেণীর কথা রাসূলে মাকবুল ﷺ বলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র একটা শ্রেণী নাজাত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করবে। এবং সেই দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। এ দলকে ক্বাদরিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোক মুজাব্বিরা নামে অভিহিত করে থাকে। কারণ হিসেবে বলে, এ দল মনে করে সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারাই উদ্ভুত। মুরজিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে শাককিয়া নাম দেয়; কারণ তারা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলে, ইনশা'আল্লাহ আমি একজন মু'মিন। রাফেজী শ্রেণী বলে, এ দল নাছাবিয়া, কেননা এ দলের নিয়ম দলের সমস্ত লোকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তারা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মনোনীত করে থাকে।

... বাতেনিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে বলে হাশাবিয়া। কারণ উক্ত দলের লোকজন রাসূলে করিম ﷺ -এর হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবন অনুসরণ করে থাকে। এভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী দলকে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা যেমন খুশী তেমন নাম দিয়েছে, অথচ তাদের প্রদত্ত কোন নামই এ দলের উপযুক্ত নয়, প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ দলের

যথার্থ ও সঠিক নাম আহলে সুন্নাত এবং আসহাবে হাদীস। তারা হাদীসের অনুসারী, রাসূলের অনুসারী হিসেবেই এ নাম পাওয়ার যোগ্য।[১৭৫]

বিভ্রান্ত দল -উপদলসমূহ

আমরা উপরে দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলুল বিদ'আত উল্লেখ করছেন। আর জামা'আতের বিপরীতে রয়েছে 'ইফতিরাক বা 'তাফার্‌রুক' যার অর্থ বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি। এজন্য আহলুল বিদ'আতকে আহলুল বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয়। এ ছাড়া সাহাবী-তাবিয়ীগণ এদেরকে আহলূল আহওয়া (أهل الأهواء) বা প্রবৃত্তির অনুসারীগণ বলে আখ্যায়িত করতেন। বিদ'আত (البدعة) ও হাওয়া (الهوى) শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। এখানে আমরা এ সকল ফিরকার পরিচয়, ইতিহাস ও মতাদর্শ আলোচনা করব।

ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা

উপরের কোনো কোনো হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই অনেক আলিম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফিরকার নাম নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আলিম ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (১৮০ হি) "মুসলিম উম্মাহর ফিরকাগুলির মূল ৪টি ফিরকা : শীয়া, হারূরীয়্যাহ (খারিজী), কাদারিয়্যাহ ও মুরজিয়্যাহ। শিয়াগণ ২২ ফিরকায় বিভক্ত হয়, খারিজগিণ ২১ ফিরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়্যাহ ফিরকা ১৬ ফিরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়াগণ ১৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়।"[১৭৬]

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ হাতিম রাযী (২৭৭ হি) বলেন : "আলিমগণ বলেছেন যে, এ উম্মাতের ইফতিরাক বা বিভক্তির শুরু হয়েছি যিনদীকগণ, কাদারিয়্যাহ, মুরজিয়্যাহ, রাফিযী (শীয়া) ও হারূরিয়্যাহ (খারিজী) এ দলগুলির মাধ্যমে। এরাই হলো সকল ফিরকার মূল। এরপর প্রত্যেক ফিরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তারা একে অপরকে কাফির বলেছে এবং একে

---

[১৭৫] শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালেবীন, বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক; নূরুল আলম রইসী, পৃ. ১৯৭-১৯৯, ২১১। অনুবাদের বানানে সামান্য পরিবতন ও সাধু রীতির স্থলে চলতি রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

[১৭৬] ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাহ ১/২৯৭।

অপরকে জাহিল বলেছে। যিনদীকগণ ১১ ফিরকা, খারিজীগণ ১৮ ফিরকা, রাফিযীগণ (শীয়াগণ) ১৩ ফিরকা, কাদারিয়্যাহগণ ১৬ ফিরকা, মুরজিয়্যাহগণ ১৪ ফিরকায় বিভক্ত। মোট ৭২ ফিরকা।"[১৭৭]

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ) (৫৬১হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩ ফিরকা মূলত ১০ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। এ দশ দল হল আহলু সুন্নাত, খারিজী, শিয়া, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, মোশাব্বিয়া, জাহ্মিয়া, জাবারিয়া, নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফিরকা এ দশ ফিরকার মধ্যে শামিল।[১৭৮]

অনেক আলিম মনে করেন যে, ৭৩ ফিরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতের বিষয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কাজেই কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফিরকার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন, এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করেন বলে দাবি না করেন, ইসলামের সর্বজন-পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন না অথচ তাদের নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা কুরআন-হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফিরকা বলে গণ্য করতে হবে।

আর যারা তাদের বিশ্বাস-আকীদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন তাঁরা যা বলেছেন তা বলেন এবং তাঁরা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে গণ্য করতে হবে।

---

[১৭৭] ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাহ ১/২৯৭।

[১৭৮] শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ২১০।

প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ

আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মূল প্রসিদ্ধ ফিরকা ছিল ৪টি; (১) শীয়া (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ ও (৪) মুরজিয়্যাহ। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ফিরকা ৯টিতে পরিণত হয়: (১) খারিজী (২) মুতাযিলা (৩) মুরজিয়া (৪) শিয়া (৫) জাহ্মিয়্যাহ (৬) নাজারিয়া (৭) জাবারিয়া (৮) কালাবিয়া (৯) মুশাব্বিহা।

এদের অধিকাংশ ফিরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক নতুন ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে। এ সকল প্রাচীন ফিরকার মধ্যে শিয়া ও খারিজী সম্প্রদায় এখনো বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফিরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকীদা বর্তমান যুগে পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে মূল ফিরকাগুলির বর্ণনা প্রদান করছি।

শিয়া ফিরকা[১৭৯]

১. উৎপত্তি ও মূলনীতি

শিয়া ও খারিজী : মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এ দুটি ফিরকার উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। শীয়া (الشيعة) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী (شيعة علي) বা আলী রা. দল, আলরি অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা) তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনের সময় আরবে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। যদিও গ্রীসে এক সময় 'ডেমোক্রাসী' বা 'গণতন্ত্র' বলে কিছু চালু হয়েছিল তবে তা টিকে থাকে নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনের সময়ে বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক বা রক্তসম্পর্ক

---

[১৭৯] শিয়া ফিরকা বিষয়ক তথ্যাবলির জন্য দেখুন : বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২২-২৪, ২৯-৭২; শাহরাস্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৪৬-১৯৮; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ১৫১-৩৫৬; আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়্যাস্সারাহ, পৃ. ৪৩-৫২, ২২১-২২৮, ২৫৫-২৬২, ২৯৭-৩০৬, ৩৯৩-৩৯৮, ৫০৯-৫১৮; মুহাম্মাদ আল-বুনদারী, আত-তাশাইউ; মুহিবুদ্দীন আল-খাতীব, আল-খুতুতুল আরীয়াহ; মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার আত-তোনসাবী, বুতলানু আকায়িদিশ শীয়াহ; ড. মূসা আল-মুসাবী, আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ; আহমদ আল-ফওযান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরযিয়্যাহ।

ভিত্তিক। রাষ্ট্রের মালিক রাজা। তার অন্যান্য সম্পদের মতই রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে তার সন্তানগণ বা বংশের মানুষেরা। রাজ্যের সকল সম্পদের মত জনগণও রাজার মালিকানাধীন। রাজা নির্বাচন বা রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে তাদের কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার নেই। রাজা তার রাজ্যের সম্পদ ও জনগণকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।

এ ছাড়া অধিকাংশ ধর্মও ছিল বংশতান্ত্রিক। ইহূদী ধর্ম, পারস্যের মাজূস ধর্ম, মিসরের প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য অনেক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই রক্তসম্পর্কের বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও অলৌকিকত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এ সময়ে আরবে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি সাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে নিজের মতের বাইরে অন্যের মত গ্রহণ করতে বাধা দিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক জনগণতান্ত্রিক পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ দিক ছিল : (১) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয়, বরং মালিক ও ম্যানেজারের। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি বা ম্যানেজার হিসেবে তা পরিচালনা করবেন । জনগণই তাকে মনোনিত করবেন এবং জনগণ তাকে সংশোধন বা অপসারণ করবেন। (২) রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। পরামর্শের ধরন নির্ধারিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতি অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি রক্তসম্পর্ক নয়, বরং তাকওয়া। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে এভাবেই বুঝেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন, তবে বিভক্ত হন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পরে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, হয়ত আলীকেই (রা) নির্বাচন করা হবে। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষ পর্যন্ত আবূ বাকর (রা)-

কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং আলী (রা)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যেন্ত্রর আগ্রহে উসমান (রা)-এর সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে; ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয়, বরং বংশতান্ত্রিক। ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের পাওনা। তাঁদের বাদে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিম ও ওহী অমান্যকারী। সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলী-বংশের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রুকন হলো আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়া।

এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যেমন আলী (রা) তাঁর বংশধরদের নিষ্পাপত্ব, নির্ভুলত্ব, উলূহিয়্যাত, গাইবী জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আলী (রা) -এর পুনারাগমন, সাহাবীগণের বিচ্যুতি ইত্যাদি। ইতোপূর্বে আরমা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি।

ইমামতের এ 'আকীদা' কুরআন কারীমে কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রা) ও তা কখনো দাবি করেন নি। কোনো হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে:

প্রথম, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিজের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করত। পরবর্তী শিয়াগণ এরূপ অগণিত মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তারা পেশ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বিষয়ের সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যুক্তির পথ। আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আ) স্থলাভিষিক্ত রেখে গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মাদ ﷺ স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অনেক যুক্তি পেশ করেন। এসকল উদ্ভট যুক্তির মাধ্যমে ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে তারা আকীদার অংশ বানিয়ে নেন।

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবি। শিয়াগণ যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে কুরআন কারীমে কোথাও তা নেই। বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে। এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী (রা) তার বংশধরের ইমামতের বিষয়টি ছিল। তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ তা বিকৃত করেছেন। কুরআন মুখস্ত করা খতম করা, নিয়মিত তাহাজ্জুদে ও তারাবীহের সালাতে খতম করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তিনিও অনুভব করেন যে, একান্তই মুর্খ না হলে কেউ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না।

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবন সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণকে কুরআন কারীমে নাজাত ও সফলতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ সকল উদ্ভট আকীদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে। আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত, সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার। যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা তাঁদের মাধ্যমে বর্ণিত কোনো হাদীস সঠিক বলে বিশ্বাস করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের ইমামগণের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাদের সংকলিত এ সকল 'হাদীসের' সনদের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যা যাচাই তাদের মধ্যে খুবই নগণ্য।

ষষ্ঠত, 'তাকিয়্যা' বা 'আত্মরক্ষার' তত্ত্ব আবিষ্কার। শীয়াগণ যাদেরকে ইমাম বলে দাবি করেন তারা মুসলিম সমাজের মূলধারার সাথে বাস করেছেন। আলী (রা) তিন খলীফার খিলাফত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরগণ। এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়াগণ 'তাকিয়্যা' বা 'আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব

আবিষ্কার করেন। তারা দাবি করেন যে, আলী (রা) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন।

সপ্তমত, ব্যক্তির নির্ভুলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ। শীয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে অন্য অনেক মানুষের নির্ভুলত্ব এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে সবকিছু নেই। এছাড়া কুরআন-হাদীসে যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। আর এরূপ জ্ঞান রয়েছে শীয়া ইমামগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই ওহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া 'আকীদা'গুলি প্রমাণ করা শীয়াগণের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট্য।

২. দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীয়াগণ

শীয়া সম্প্রদায় অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে যান। বর্তমানে বিদ্যমান শীয়াগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল দ্বাদশ ইমামপন্থী বা ইমামী শীয়াগণ। ইরান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শীয়া এ দলের। এদের আকীদাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) ইমামতের বিশ্বাস। তাদের মতে আলী (রা) ও তাঁর বংশের বার জনের ইমামতে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে ইমামত নস্‌স বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, এখানে ইজতিহাদ, শূরা বা পরামর্শের কোনো সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ১২ ইমাম:

(১) আলী (২৩-৪০হি),

(২) হাসান ইবনু আলী (৩-৫০ হি),

(৩) হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি),

(৪) যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন (৩৮-৯৫),

(৫) মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু মুহাম্মাদ বাকির (৮৩-১৪৮ হি),

(৬) জা'ফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির (৮৩-১৪৮)

(৭) মুসা কাযিম ইবনু জাফর সাদিক (১২৮-১৮৩) হি

(৮) আলী রিয়া ইবনু মূসা কাযিম (১৪৮-২০৩টি)

(৯) মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিয়া (১৯৫-২২০)

(১০) আলী হাদী ইবনু মুহাম্মদ জাওয়াদ (২১২-২৫৪ হি)

(১১) হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী (২৩২-২৬০)

(১২) মুহাম্মাদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (২৫৬-???)

(২) ইসমাতের বিশ্বাসঃ তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম সকল পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিস্পাপ ও সংরক্ষিত।

(৩) ইলম-এর বিশ্বাসঃ তারা বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে 'ছিনায় ছিনায়' ইমাম-পরস্পরায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলম লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গাইবী জ্ঞান প্রাপ্ত।

(৪) ইমামগণের মুজিযায় বিশ্বাসঃ তার বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত। তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন এবং করেন। এগুলিকে তারা মুজিযা বলে।

(৫) গাইবাহ (الْغَيْبَةُ) বা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাসঃ তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

(৬) রাজ'আত (الرَّجْعَةُ) বা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসঃ তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যামানায় ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, শীয়াগণের ১১শ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে নিঃসন্তান ভাবে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইনতেকালের পরে তাঁর এক দাসী দাবী করেন যে, তিনি তাঁর সন্তান ধারণ করেছেন। হাসানের ভাই জাঁফর এ নিয়ে তৎকালীন সরকারের কাছে কেস করেন এবং প্রমাণিত করেন যে, তার ভাইয়ের কোন সন্তান নেই। কেসে জয়লাভ করে তিনি ভাইয়ের সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন।[১৮০]

---

[১৮০] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/১১৯-১২২।

কিন্তু শীয়াগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ দাবী করেন যে, হাসান আসকারীর একটি ছেলে ছিল যাকে তিনি গোপন রেখেছিলেন। তার নাম ছিল মুহাম্মাদ। তিনি ২৫৬ হিজরীতে, পিতার মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বয়সে তিনি বাড়ীর নিচের ছোট কুঠুরীতে প্রবেশ করেন। তাঁর আম্মা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি আর বের হননি। কত বৎসর বয়সে এ ঘটনা ঘটে তা নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ৯ বৎসর বয়সে ২৬৫ হিজরীতে। কেউ বলেন : ১৭ বৎসর বয়সে। কেউ বলেন ২৭৫ হিজরীতে ১৯ বৎসর বয়সে।

সর্বাবস্থায় শীয়াগণ গত প্রায় ১২০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বাস করে আসছেন যে, এই মুহাম্মাদই হলেন যামানার ইমাম। তিনিই মাহদী। তিনি গোপনে আছেন। গোপনে থেকেই জগত পরিচালনা করছেন। তিনি অচিরেই মাহদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যাবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। গত অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের অভ্যাস ছিল যে, তারা প্রতিদিন দলধরে বাগদাদের একটি কাল্পনিক ঘরের কাছে যেয়ে তাকে ডাকতেন এবং বেরিয়ে এসে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতেন। [১৮১]

(৭) তাকিয়্যাহ (اَلتَّقِيَّةُ)-র বিশ্বাস: অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাস। তাকিয়্যাহকে তারা দ্বীনের দশভাগের নয়ভাগ বলে মনে করেন। তাকিয়্যাহ পরিত্যাগ করা সালাত পরিত্যাগ করার মতই কঠিনতম পাপ। যে তাকিয়্যাহর নামে মিথ্যা না বলে সত্য বলে সে তাকিয়্যাহ ত্যাগ করার কারনে কঠিন পাপে পাপী বলে বিবেচিত।

(৮) কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাস: অধিকাংশ ইমামী শায়ী বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত কুরআন বিকৃত। অবিকৃত মূল কুরআন আলীর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের ইমামদের নিকট তা গোপন রয়েছে।

(৯) সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিশ্বাস: বার-ইমামপন্থী ইমামী শীয়াগণ অন্যান্য অধিকাংশ শীয়া ফিরকার ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, তিন খলীফাসহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ ও জালিম ছিলেন।

(১০) বারা'আতের (اَلْبَرَاءَةُ) বা সম্পর্ক ছিন্নতা ঘোষণায় বিশ্বাস: তারা সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক হীনতার ঘোষণা দেওয়াকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে।

---

[১৮১] ইবনুল কাইয়েম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃ: ১৫২

(১১) ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্বাস: ইমামী শিয়াগণ অন্য শীয়াদের মতই একমাত্র আলী (রা)-এর খিলাফত ও পরবর্তী যুগে শীয়াগণের রাজত্ব ছাড়া খিলাফতে রাশিদা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগূতি রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস করেন।

৩. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ্ শীয়াগণ : শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাঈলিয়্যাহ সম্প্রদায়। আমরা দেখেছি যে, ১২ ইমাম পন্থী ইমামী শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী-বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। কিন্তু ইসমাঈলিয়্যা শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, জাফর সাদিকের ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ (২৫৯-৩২২ হি) নামক এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে, তিনিই ৭ম ইমাম ইসমাবীলের বংশধর ও মাহদী। এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনূসের কাইরোয়ানে ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার সন্তানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।[১৮২] এরাই মূলত ইসামাঈলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা।

বাতিনীয়া শীয়াগণও অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত, গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশেষ বিশ্বাসের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে:

(১) ইমামগণ এবং ইমামগণের মনোনীত বলে দাবিদারদের উলূহিয়্যাত-এ বিশ্বাস। তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহর দেহধারী রূপ বা আল্লাহর বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। কুরআন, হাদীস ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন। ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি বলে দাবিকারীর বক্তব্যই একমাত্র দ্বীন।

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেওয়া।

---

[১৮২] বিস্তারিত দেখুন : মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০- ১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে ইসলামের নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন। আর এ গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুজে সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের 'ইলম লাদুন্নী', 'বাতিনী ইলম' ও হাকীকতের জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ 'কারামিতা', ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতামত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এসকল সন্ত্রাসীর অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৯৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায

ফিদায়ী তৈরি করেন। যারার তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যকায় 'আল-মাওত' নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়- রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শ্ববর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেটকে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মুল করে।[১৮৩]

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া ইত্যাদি দল বাতিনী শীয়াগণের উত্তরপুরুষ। এছাড়া বর্তমান সিরিয়ার শাসক নুসাইরী বা আলাবী শীয়াগণ এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দুরয্ সম্প্রদায়ও বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ পৃথক আকীদা রয়েছে। তবে বাতিনী সম্প্রদায়ের মূল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের 'উলূহিয়্যাত' ও ইসলামী আহকামের অকার্যকারিতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী।

৪. যাইদিয়্যাহ (الزيدية) শীয়াগণ

শীয়াগণের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বচেয়ে নিকটবর্তী ফিরকা যাইদী শীয়াগণ। বর্তমানে ইয়ামানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী।

---

[১৮৩] আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ.৯৮।

যাইদী শীয়াগণ নিজেদেরকে ইমাম যাইদের (৭৯-১২২হি.) অনুসারী বলে দাবি করেন। যাইদ ছিলেন ১২ইমামপন্থী শীয়াগণের তৃতীয় ইমাম যাইনুল আবদীনের পুত্র ও ৪র্থ ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের ভাই। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং বিশ্বাসে ও কর্মে আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আবূ হানিফা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী তাকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ১২২ হিজরীতে তিনি শহীদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। তবে তার অনুসারীগণ তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ইয়ামানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যাইদী শীয়াগণের আকীদার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. ইমামত বা রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার ফাতিমা (রা) -এর বংশধরদের।

২. ইমামত বা রাস্ত্রক্ষমতার জন্য ওহীর বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন নেই। বরং ফাতিমা রা. -এর বংশের যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং জনগণ তাকে নির্বাচন করে তবে তিনিই ইমাম।

৩. ফাতিমা রা. এর বংশের যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলে তা বৈধ হবে।

৪. প্রথম দু খলীফা আবূ বাকর রা. ও উসমান রা. এর মর্যাদায় বিশ্বাস।

৫. তৃতীয় খলীফা উসমান রা. এর খিলাফাতে বিশ্বাস।

(তবে তাদের অনেকে তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তির কথা বলে।)

(৬) সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা ও তাদের গালি না দেওয়া। বিশেষত আলী (রা) যাদের হাতে বাইয়াত হয়েছেন তাদেরকে ভালবাসা।

(৭) তারা তাকিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করেন না।

(৮) তাদের মতে ইমাম গুপ্ত বা লূক্কায়িত থাকতে পারেন না।

(৯) তারা ইমামগণের ইসমাত বিশ্বাস করেন না। তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা) এ চারজনের ইসমাতে বিশ্বাস করেন।

(১০) ফিকহী বিষয়ে যাইদী ফিকহ হানাফী ফিকহের সাথে মিল রাখে।

খারিজী ফিরকা [১৮৪]

১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদ্বীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্ণরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্রা' বা 'কুরআন পাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ হলো অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন :

---

[১৮৪] খারিজী ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন : বাগদাদী, আল- ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০, ৭২-১১৪; শঅহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১১৪-১৩৯; আবূ মুহাম্মাদ আল-ইয়ামনী, আকাইদুস সালঅসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ ১/১৮-৪২; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২১-১৪৯; আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল -ইসলামী, আল-মাউসূ'আতুল মুয়্যাস্সারাহ, পৃ. ১৩-২০; ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখ; মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা।

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَیْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِیْ تَبْغِیْ حَتّٰى تَفِیْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের ওপর অত্যাচারী বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[১৮৫]

এখানে সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

'কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই।"[১৮৬]

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে,

وَمَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয়না তারাই কাফির।"[১৮৭]

তারা দাবি করে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মু'আবিয়া ও তাঁদের অনুগামিগণ সকলেই কাফির। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা

---

[১৮৫] সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত।

[১৮৬] সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

[১৮৭] সূলা মায়িদা, ৪৪ আয়াত।

যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[১৮৮]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[১৮৯]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।[১৯০] এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সেজদায় পড়ে থাকতে থাককে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসত।[১৯১] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।[১৯২]

৩৭ হিজরি থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন

---

[১৮৮] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৪৭-৪৮।

[১৮৯] ইবনু কাসীর, আল-কিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৫৯।

[১৯০] বিস্তারিত দেখুন, মুবার্‌রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল।

[১৯১] ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলিস, পৃ. ৮৩-৮৪।

[১৯২] আল-আজুর্‌রী, আশ-শারী'আহ, পৃ. ৩৭।

করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১৯৩]

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউটান' ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় এবং এরূপ "কাফিরদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' করা এবং পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দ্বীনের সবচেয়ে বড় ফরয।[১৯৪]

এদের বিদ্রোহের পরে আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই

---

[১৯৩] ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আলি ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[১৯৪] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ,. দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

জাতি এ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদাতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![১৯৫]

আলীকে (রা) এভাবে হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি এমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪হি) বলেন: "কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁকে স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।[১৯৬]

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষটা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে (রা) প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[১৯৭]

---

[১৯৫] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১১২০।
[১৯৬] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।
[১৯৭] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯।
৫৩ মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু, পৃ. ৯-১১।

২. আকীদা ও মূলনীতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খারিজীগণের আকীদা বুঝতে পেরেছি। বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত। এতে কিছুদিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সকল উপদল মোটামুটিভাবে নিচের বিষয়গুলিতে একমত ছিল:

(১) কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির।

(২) উসমান, আলী, উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দুই সালিস আমর ইবনু আস, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং তাদের দুজনের বা একজনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করে তারা সকলেই কাফির।

(৩) জালিম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং জিহাদ করা ফরয, ওপরন্তু জিহাদ আরকানে ইসলামের মতই ফরযে আইন এবং সবচেয়ে বড় ফরয।

এ ছাড়া তাদের অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে।

৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ

(ক) ইয়াযী সম্প্রদায়

খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, মোরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবাযিয়্যাহ (الإباضية) নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের বিদ্যমান। এরা আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়ায (عبد الله بن اياض) নামক এক ব্যক্তির অনুসারী। মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। মূল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তারা মু'তাযিলাদের আকীদা পোষণ করে।

(খ) আধুনিক খারিজীগণ

উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষত মিসরে আধুনিক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংগঠন প্রাচীন খারিজী সম্প্রদায়ের

আকীদা গ্রহণ করেছে। গবেষকগণ এদেরকে নব্য-খারিজী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অনেকেই খারিজীগণের উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতি সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুসলিমীন' বা জামা'আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ।

শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ূতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসয়ূত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক "বৈপ্লবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দ্বীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এ বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ সকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি দল গঠন করেন। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এরূপ কাফির-মুরতাদদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে।

এদের কর্মকাণ্ডের অজুহাতে মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ধার্মিক যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলি এদের কর্মকাণ্ডকে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক মানুষ ও ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বাকি অনেককে দীর্ঘ মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এরপর এ দলের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড দাবি করে। এ ছাড়া তাদের চিন্তাচেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।[১৯৮]

তাদের মূলনীতিগুলির মধ্যে ছিল:

(১) কুরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ট বলে দাবি করা

এদের নেতা শুকরী দাবি করেন যে, কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কুফরী; কারণ এতে মানুষের কথাকে আল্লাহর কথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এ যুক্তিতে তারা কুরআনের আয়াতগুলি নিজেদের বুঝ ও আবেগ অনুসারে ব্যাখ্যা করত। সাহাবীগণ বা অন্য কারো মতের এক্ষেত্রে কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করত না।

(২) সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা

সাহাবীগনের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করত। কারণ তারা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতি রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করে চলেছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করত না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের ওপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল ও বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।[১৯৯]

(৩) অতীত-বর্তমান সকল আলিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

শুকরী ও তার অনুসারিগণ অতীত ও বর্তমান সকল যুগের সকল আলিমের প্রতি কঠিন অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মূর্খ, স্বার্থপর, আপোসকামি, 'তাগুত'-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।[২০০]

(৪) অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফির বলা

খারিজীদের মতই এরা দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকেই কাফির বলেন। তারা নিজেরাই ছোট ফরয ও বড় ফরয তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেক প্রকার পাপে লিপ্ত হন, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় চাকরী করা, রাষ্ট্রের

---

[১৯৯] মুহাম্মাদ সুরু, আল-হুকমু ১২৩।
[২০০] মুহাম্মাদ সুরূর, আল-হুকমু, পৃ.৫৬।

আনুগত্য করা, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, 'তাদের কথিত জিহাদ সমর্থন না করা', 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'গণতান্ত্রিক' কোনো দলকে সমর্থন করা ইত্যাদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির ঘোষণা করে তাদের হত্যা করেছে।

(৫) 'আনুগত্যের' কারণে সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফির বলা

খারিজীগণ যেমন মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার প্রদান ইত্যাদি 'মানব রচিত' আইন প্রচলনের কারণে আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী শাসকদেরকে কাফির বলেছে, তেমনিভাবে এরা উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলির এবং বিশেষত মিসরের শাসকদেরকে 'ইসলাম-বিরোধী' আইন প্রচলনের জন্য কাফির বলে ঘোষণা করে। তারা দাবি করে যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু 'ইসলামী' আইনে বিচার করেন না বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। আর এ সকল সরকাররে আনুগত্যের কারণে দেশের সাধারন নাগরিকদের কাফির বলা।

(৬) জামা'আত ও বাই'আতের তত্ত্ব প্রদান করা

তারা দাবি করে যে, শুধুমাত্র 'জামা'আত' ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। এ দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা'আত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এ দাবি মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা'আতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। সর্বোপরি তারা এ পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি।

(৭) বড় ফরয ও ছোট ফরযের তত্ত্ব প্রদান

খারিজীগণের মত তার পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরযে আইন বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের ওপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা। এ ফরয পালন করতে যেয়ে যদি অন্যান্য ফরয ইবাদত বাদ দিতে হয় তবে তা দিতে হবে। যেমন এজন্য প্রয়োজনে সালাত বাদ দেওয়া যাবে বা সালাতের মধ্যকার ফরয কর্ম বাদ দেওয়া যাবে।

এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল। কোনো ফরযকে বড় বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ফরয

ইবাদত বটে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরয বলা হয় নি। বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরয হওয়া তো দূরের কথা ফরযে আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরয কিফায়া। কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযর ছাড়াও যারা জিহাদ না করে বসে থাকেন তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না। হাদীস শরীফে পিতামাতার খেদমতের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে।

অন্যান্য ফিরকা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাচীন ফিরকাগুলির মধ্য থেকে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় বাহ্যত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে তাদের মতামতের কিছু দিক বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. মুরজিয়্যাহ[২০১]

মুরজিয়্যাহ (اَلْمُرْجِئَةُ) আরবী 'আরজাআ' (أَرْجَأَ) ফি'ল থেকে গৃহীত 'ইসমু ফাইল'। মূল শব্দ বা ধাতুমূল রা, জীম ও হামযা: 'রাজাআ (رَجَأَ)। আরজাআ (أَرْجَأَ) অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা (To postpone, adjourn, defer, put off) ইত্যাদি। মুরজিউন (مُرْجِئ) অর্থ বিলম্বিতকারী বা স্থগিতকারী। বহুবচন বা ফিরকা অর্থে মুরজিয়্যাহ বলা হয়, অর্থাৎ বিলম্বিতকারীগণ বা স্থগিতকারীগণ।

আমরা দেখেছি যে, খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্ত কাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মের ঘাটতি মানেই ঈমানের ঘাটতি। আর ঈমানের ঘাটতি অর্থই কুফ্‌র। এর বিপরীতে আরেক দলের উদ্ভব হয়। তারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান বা বিশ্বাস থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ

---

[২০১] মুরজিয়্যাহ ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৫, ২০২-২০৭; শাহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৩৯-১৪৬; আবূ মুহাম্মাদ আল-ইয়ামনী, আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ ১/২৭১-২৯৫; ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখ; মানাহিজু আহলির াহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা।

বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে। এদের মূলনীতি হলো,

لا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ_

"ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না, যেমন কুফ্‌র থাকলে কোনো পূন্যই কাজে লাগে না।"

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। এদেরকে মুরজিয়া কেন বলা হলো সে বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইবনুল আসরি বলেন, এরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন সেহেতু তাদেরকে মুরজিয়্যাহ বলা হয়। আর আব্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, এরা যেহেতু আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।[২০২]

খারিজীগণ যেরূপ কুরআন ও হাদীসে কিছু বক্তব্য নিজেদের মতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এর বিপরীতে অন্য বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করেছে, বা বাতিল করেছে, অনুরূপভাবে মুরজিয়াগণও তাদের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের ক্ষমা বিষয়ক ও তাওহীদের ফযীলাত বিষয়ক বক্তব্যগুলিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকি আয়াত ও হাদীসগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করেছে। সমন্বয় বা উভয় প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সচেষ্ট হয় নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, খারিজী, মুতযিলী এবং তাদের সংগে একমত বিভিন্ন ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকেও মুরজিয়াহ বলে আখ্যায়িত করে। কারণ এ সকল ফিরকা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করবে। আর আহলুস সুন্নাত কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন বলে

[২০২] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ১/৯৮; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০২।

বিশ্বাস করেন। এভাবে তাঁরা পাপী মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন।

২. কাদারিয়্যাহ[২০৩]

কাদারিয়্যহ (اَلْقَدَرِيَّةُ) শব্দটি 'কাদার' (اَلْقَدَرُ) শব্দ থেকে গৃহীত। 'কাদার' অর্থ নির্ধারণ। ইসলামের পরিভাষায় 'কাদার' অর্থ আল্লাহর নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর। 'কাদারী' অর্থ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত। দল বা ফিরকা অর্থে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দল বা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ। যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করেন তাদেরকে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে এ মতের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে।

আমরা দেখেছি যে, তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর অনাদি-অনন্ত সর্বব্যাপী ইলম বা জ্ঞানে বিশ্বাস। অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, অনাদি কাল থেকে মহান আল্লাহ বিশ্বের কে, কখন, কোথায়, কিভাবে কি করবে, কি ঘটবে সবই জানেন। তাকদীরে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞানে অবিশ্বাস করতে হয়। এজন্য কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ পূর্ব থেকে কিছু জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন।

উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাগণ কাদারিয়্যাহ ফিরকার সকল মূলনীতি গ্রহণ করে। এজন্য অনেকেই মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহ এক ফিরকা বলেই গণ্য করেছেন। পরে আমরা মু'তাযিলাদের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৩. জাবারিয়াহ[২০৪]

জাবার (اَلْجَبْرُ) শব্দের অর্থ 'জবরদস্তি', বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি। জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই। মানুষ যা করে তা করতে সে বাধ্য। মানুষ চাবি দেওয়া কলের পুতুলের মতই। কাদারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বলে কিছুই নেই, কর্মই সব। আর জাবারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, কর্মবলে কিছু নেই ভাগ্যই সব। আমরা দেখেছি

---

[২০৩] কাদারিয়্যাহ ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১১৪-২০২; শাহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১৩৯-১৪৬।

[২০৪] দেখুন, শাহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/৮৫-৯২।

যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ভাগ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্ম। আল্লাহ যেহেতু দুটি বিষয়ই উল্লেখ করেছেন সেহেতু দুটি বিষয়ই সত্য। এ দুটির সমন্বয়ে আশা ও ভয়ের মধ্যে ঈমান। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের গুরু জাহমই জাবারিয়্যা আকীদার প্রথম প্রবক্তা বলে গণ্য।

৪. জাহমিয়্যাহ[২০৫]

জাহমিয়্যাহ অর্থ 'জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহ্‌ম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮হি) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে একদিকে 'জাবারিয়া' মতে প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল। সে প্রচার করত যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মত চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল। সে বলত যে, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফ্‌র। সে আরো প্রচার করত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ ছাড়া সে আল্লাহর বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। সে বলত, যে বিশেষণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রাযি নই। কাজেই আল্লাহকে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি কিছুই বলা যাবে না। তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা.... ইত্যাদি। সে আল্লাহর কালাম বা কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করত। সে দাবি করত যে, আল্লাহর কালাম আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কখনোই বলা যাবে না। যে আল্লাহ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন। এরূপ সকল প্রকারের বিভ্রান্তি সে একত্রিত করে। সে এত বেশি সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, তেমন কোনো ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও অন্যান্য অনেক ইমাম জাহম ও তার অনুসারীদেরকে

---

[২০৫] দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১১-২১৫।

সুস্পষ্টরূপে কাফির বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা জাহমিয়াদেরকে 'মুসলিম ফিরকা' বলে গণ্য না করে 'অমুসলিম' বলে গণ্য করেছেন।[২০৬]

পরবর্তীকালে আল্লাহর বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে 'জাহমিয়্যা' মতবাদ বলে গণ্য করা হয়। [২০৭] উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী।

৫. মু'তা যিলা[২০৮]

মু'তাযিলা (اَلْمُعْتَزِلَةُ) শব্দটি 'ই'তাযালা' (اِعْتَزَلَ) ফি'ল থেকে গৃহীত। ই'তিযাল (اَلْاِعْتِزَالُ) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম হিজরীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয়।

এদেরকে মু'তাযিলা বলা হলো কেন সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত এই যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বাসরীর (১১০ হি) একজন ছাত্র ছিলেন ওয়াসিল ইবনু আতা (৮০-১৩১ হি)। তৎকালীন একটি বিশেষ বিতর্কিত বিষয় ছিল পাপী মুসলিমের বিষয়। আমরা দেখেছি খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করত। মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায় তাকে পরিপূর্ণ মুমিন এবং অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করত। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূল ধারার তাবিয়ীগণ এরূপ মুসলিমকে পাপী মুমিন ও আখিরাতে শাস্তি ভোগের পর নাজাত লাভ করবে বলে বিশ্বাস করতেন। ওয়াসিল ইবনু আতা দাবি করেন যে, এরূপ ব্যক্তিকে মুমিনও বলা যাবে না এবং কাফিরও বলা যাবে না। বরং সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানরত। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অনন্ত জাহান্নামী হবে, কারণ সে ঈমানহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। হাসান বসরী (রহ) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তার মাজলিসে আসতে নিষেধ করেন। ওয়াসিল হাসান

---

[২০৬] ড. মুহাম্মাদ আল-খুমাইস, উসূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ, পৃ. ১৮৬-১৯২।

[২০৭] বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১১-২১২।

[২০৮] মু'তাযিলা ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১১৪-২০২; শাহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/৪৩-৮৫; আবূ মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী, আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকা ১/৩২৫-৪২১।

বসরীর মাজলিস ত্যাগ করে বসরার মসজিদের অন্য কোণে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসতে শুরু করে। এজন্য তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে 'মু'তাযিলা' বলা হয়।

সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় হিজরী শতকে এ মতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। এ মতের অনুসারীগণ গ্রীক, মিসরীয়, পারসীয় ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখাপড়া করার ফলে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষদের আকর্ষিত করেন। কয়েকজন আব্বাসী খলীফা, বিশেষত খলীফ মামুন (খিলঅফাত: ১৯৮-২১৮ হি/ ৮১৪-৮৩৩ খৃ) ও খলীফা মু'তাসিম (২১৮-২২৭হি/৮৩৩-৮৪২খৃ) তাদের যুক্তি, তর্ক, দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের মত গ্রহণ করেন এবং এ মতটিকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ করে সকল আলিমকে এমত গ্রহণে বাধ্য করতে শুরু করেন। তবে মূলধারার আলিমগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রমান্বয়ে এ মতের অনুসারী কমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আহলুস সুন্নাতের সাথে মুতাযিলী সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল বিশ্বাসের বিষয়ে মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেক (sense, reason, rationality, intellect, inteligence) ও ওহী (Scripture) -পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান। মু'তাযিলী আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেককে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। আকল বা মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা গেলে বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে। কুরআনের বক্তব্যকে তারা 'রূফক', অস্পষ্ট ইত্যাদি যুক্তিতে বাতিল করত এবং হাদীসের বক্তব্যকে তারা 'খবরে ওয়াহিদ' বা মুতাওয়াতির নয়, কাজেই অর্থগত বর্ণনার সম্ভাবনা আছে যুক্তিতে বাতিল করত। এ বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণে মূলধারার তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণ বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের আকীদার মূলনীতি আমরা ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা করেছি।

মু'তাযিলাগণ তাদের মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক আকীদার উদ্ভাবন করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কাদারিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহ ফিরকাদ্বয়ের মূলনীতিসমূহ সবই মু'তাযিলাগণ গ্রহণ করে। তারা নিজেদেরকে আহলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ (أَهْلُ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ) অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও একত্বের অনুসারী বলতেন। তাদের দাবিমত তাদের মূলনীতি পাঁচটি (১) আদল (اَلْعَدْلُ) বা

ন্যায়বিচার, (২) তাওহীদ (اَلتَّوْحِيْدُ) বা একত্ব, (৩) ইনফাযুল ওঈদ (إِنْفَاذُ الْوَعِيْدِ) বা শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন, (৪) আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইনি (اَلْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ) বা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং (৫) আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহউ আনিল মুনকার (اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) বা সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ।[২০৯]

এগুলির ভিত্তিতে তাদের উদ্ভাবিত আকীদার মধ্যে রয়েছে:

(১) আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা। তাদের মতে, মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। এতে আল্লাহর একত্ব নষ্ট হয়। এ কারণে তারা নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে দাবি করত। এ ছাড়া সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে তারা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মগুলি-অস্বীকার করত এবং সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত।

(২) মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে না।

(৩) আল্লাহর কথা তাঁর অনাদি বিশেষণ নয় বরং তা তাঁর সৃষ্ট বস্তু মাত্র।

(৪) তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন, মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে। তাকদীরের অস্বীকারকেই তারা 'ন্যায়বিচারের বিশ্বাস' বলে আখ্যায়িত করত।

(৫) পাপী মুসলিম কাফিরও নয় মুমিনও নয়। আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নাম। এ বিশ্বাসকে তারা শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন' বলে আখ্যায়িত করত। কারণ আল্লাহ পাপীদের শাস্তির অঙ্গিকার করেছেন। এরপর যদি তিনি ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায়বিচার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয়। আল্লাহর ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা 'শাফা'আত' বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা অস্বীকার করত।

(৬) অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশে করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরী ও ফরযে আইন। রাষ্ট্র ও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। এমতের

---

[২০৯] ইবনু আলি ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৫২০-২৮।

ভিত্তিতে তারা নিজেদের এ সকল আকীদা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালান।

মু'তাযিলাগণের মধ্যে অনেক উপদলের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব আকীদা ও মতামত রয়েছে।

৬. মুশাব্বিহা[২১০]

মুশাব্বিহা (الْمُشَبِّهَةُ) শব্দটি 'তাশবীহ' (اَلتَّشْبِيْهُ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। তাশবীহ অর্থ তুলনা করা, উপমা দেওয়া, সমান বানানো ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে 'মুশাব্বিহা' বা তুলনাকারী হিসেবে ফিরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কোনো তুলনা দিও না এবং কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহকে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে, অথবা আল্লাহর সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মত তুলনীয় মনে করেছে।

আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের মহা নি'আমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার এবং বাতিল ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিরেট অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

[২১০] বাগদাদী, আল-ফারকু, পৃ. ২২৫ - ২৩০; ইবনু আলি ইয়য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৫২০-৫২২।

বিষেশ দ্রষ্টব্যঃ

এ গ্রন্থ রচনায় নিচে গ্রন্থসমূহ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে

১. ফাযায়েলে কোরআন – মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

২. কুরআন-সুন্নার আলোকে ইসলামী আকীদা – ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি – ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৪. ফাযায়িলে আ'মাল – আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

	আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০
আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০
মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৩০
সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০
সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩০০

গল্পে গল্পে আবু বকর

গল্পে গল্পে ওমর রা.

গল্পে গল্পে ওসমান র

গল্পে গল্পে আলী রা.

গল্পে গল্পে ওমর বিন অ

প্রথম মুসলমান হযরত